











পান্থ্য—~~পান্থ্য~~ অর্থাৎ  
সুবোধ বসু

গ্রন্থাগার

কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩৬০

প্রচ্ছদ-চিত্র

শ্রীরমেন্দ্রকুমার কুণ্ড

ব্লক ও প্রচ্ছদ মূদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

মুদ্রাকর

শ্রীবিভূতি ভূষণ সেন

উদয়ন প্রেস,

৬ কলেজ রো, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু

গ্রন্থাগার, পি ৫৮ ল্যান্সডাউন

রোড, কলিকাতা পক্ষে

এই উপস্থাপনাটি প্রথমে “বিচিত্রা” মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত  
হয়। বর্তমান সংস্করণে ভাষাগত কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে

অধ্যাপক ~~কিরমণীমোহন~~ ~~স্বায়~~  
ঐতিহ্যবাহিনী

# সুবোধ বসু-র অগ্রাগ্র বই

## উপন্যাস

রাজধানী  
মানবের শত্রু নারী  
পদধ্বনি  
ইঙ্গিত  
পাখির বাসা  
নব মেঘদূত  
চিমনি  
স্বর্ণ  
বন্দিনী  
নটা  
দ্রীমুদ্র  
সহচরী  
উর্দ্ধগামী

## গল্প-সংগ্রহ

জয়যাত্রা  
বিগত বসন্ত

## নাটক

অতিথি  
কলেবর  
তৃতীয় পক্ষ

## কিশোর-সাহিত্য

পদ্মা নদীর ডাক  
বুদ্ধিবৃত্ত

## এক

বিক্রমপুবেব মধ্য দিয়া ধমনীৰ মত যে সকল পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত হইয়া বাংলাৰ এই শস্ত-শ্রামল প্রান্তকে প্রাণবান কবিয়া রাখিয়াছে, তল্দিয়াৰ খাল তাহাদেৱ অগ্ৰতম। লৌহজ্জৰেব পূৰ্বপ্রান্তে পদ্মা হইতে বাহিব হইয়া এই জলপ্রণালী বিক্রমপুবেব মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ধলেশ্বৰী নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। বিক্রমপুবেৰ বাণিজ্যলক্ষ্মী এই পথে কত যে মালবাহী নৌকা পাঠাইয়াছে, কত যে বিদেশী বণিককে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাৰ ইয়ত্তা নাই।

এই খালেৰ পথে বাংলা ১৩২০ সালেৰ আশ্বিনেৰ মাঝামাঝি শেষ-বাত্ৰিতে একথানা স্তব্ধ বজ্ৰা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হইয়া পদ্মাৰ দিকে অগ্রসৰ হইতেছিল। বাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশেৰ এক প্রান্তে দিক্চক্ৰবালেৰ মাথাৰ উপৰ শুকতারাটা এমনি দপ্‌দপ্‌ কবিয়া জলিতেছিল যে, তাৰ আয়ু আৰ বেশি নাই তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। মহাবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রকৃতিৰ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অন্ধকাৰ সম্পূৰ্ণ বিলুপ্তি টানিয়া আনে না, বিশ্বপ্রকৃতিৰ এক রূপান্তৰ মাত্ৰ সৃষ্টি কৰে। প্রভাতেৰ সূচনায় এখন আবাব নতুন রূপান্তৰ সৃষ্টি হইতে চলিল। নিমজ্জিত ধানক্ষেত হইতে শস্তেৰ গন্ধ আসিয়া মিশিল নতুন-জাগা বাতাসে। খালেৰ জলবাশি যেন কল্ কল্ কবিয়া জাগিয়া উঠিল, তীব্বেৰ গাছপালা এমনি শব্দ কৰিয়া উঠিল যে, মনে হইল ডাল-পালা আডমোডা ভাঙিতেছে। একটা মহাপৰিবৰ্ত্তনেৰ জগৎ বিশ্বপ্রকৃতি স্পষ্টই উন্মুখ হইয়া আছে।

এই অস্পষ্টতাৰ মধ্যে বজ্ৰাৰ পাঁচ পাঁচজন মাঝি এই রহস্তময় আবেষ্টনেৰ স্বাতন্ত্ৰ্যাহীন অন্ধেৰ মত দাঁড নিক্ষেপ এবং হাল-নিয়ন্ত্ৰণ কৰিয়া

চলিয়াছে। ছপাছপ্, ছপাছপ্, জলের বুকে দাঁড়ের আঘাতের শব্দ হইতেছে, কঁয়াচোর-কোঁচোব শব্দ উঠিতেছে হাল-বাঁধা দড়ি হইতে। নৌকা পদ্মাব দিকে অলস গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

বজ্রাব ভিতব হইতে এক সময় মুহূ গম্ভীরকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ শুনিয়া মাঝিবা বুঝিল হজুর জাগিয়াছেন—চকিতে ধীব অলস গতিব মধ্যে কর্মতৎপবতাব পবিচয় পাওয়া গেল, বজ্রাব গতি দ্বিগুণ বদ্ধিত হইল।

ভিতব হইতে শ্লোকোচ্চাৰিত হইতে লাগিল :

অনেকবাহুদববক্ত্রনেত্রং পশ্চামি ত্বাং সৰ্ব্বতোহনন্তকপম্।

নাহন্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্চামি বিশ্বেশ্বব বিশ্বকপম্ ॥

জগতেব রূপও পরিবর্তিত হইয়া চলিল। পূর্বাধিগন্তে আকাশেব প্রান্তে তুলির টানের মতন কয়েকটা সোনার আঁচড় দেখা দিল। থালের জল রূপাব মত টলটল কবিয়া উঠিল। উন্মুক্ত শশাস্ত্রত প্রান্তবেব সবুজ ঘাস ও তীক্ষ্ণধাব ধানগাছ মবকতমণিব মত ঝলসিয়া উঠিল।

দক্ষিণ দিকে অনতিদূবে দেখা যাইতেছে কোটালভিটার বহুবিস্তৃত আমবাগান। উহাব পাশ দিয়া খাল বাকিয়া গিয়াছে।

বস্তুত, কোটালভিটা আমবাগান বৈ আব কিছুই নহে। কিসদন্তী আছে, এই কোটালভিটা চাঁদ বায়, কেদাব বায়েব আমলে অতি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল, এই গ্রামেব জমিদাববংশ মহাবিক্রম ভূইঞা চাঁদ বায়েব নিকট হইতে জায়গীব পাইয়াই কোটালভিটার প্রতিষ্ঠা কবে এবং কেদাব রায়েব অগ্রতম সৈন্যধ্যক্ষরূপে মানসিংহেব সহিত শেষ-সংগ্রামে লড়িয়া বংশের তদানীন্তন জমিদাব মৃত্যুবরণ করে। কোটালভিটা নামেব হয়তো ইহাই তাৎপর্য। নানা উত্থান-পতনেব বন্ধুব পথে এই প্রাচীন বংশ অবশেষে ভাগ্যবিপর্যয়ের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিণতিতে আসিয়া পৌছিল—গৃহ-কলহ, বংশবৃদ্ধি এবং স্ত্রী, এই তিন শত্রুতে মিলিয়া

ভূইঞাদেব আমলেব এই বিখ্যাত বংশেব পতন সাধন করিল। কোটালভিটার জমিস্বত্ব অদৃশ্য পথে লৌহজঙ্গমেব এক ধনাঢ্য গুঁড়ির সিন্ধুকু আসিয়া বাঁধা পড়িল।

কোটালভিটায় এখন আব মনুষ্যেব বসতি নাই। ঘনসন্নিবিষ্ট আমগাছে পৰিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আমবাগান স্বা-বসিক জমিদাবেব কথা নিবস্তুর স্বৰণ কবিত্তেছে। এমন বৃহৎ ও গভীর আমবাগান এ-অঞ্চলে আব নাই। স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে এই আমবাগানেব ফলেব মতো ফল সাবা বিক্রমপুবে বিবল।

শীঘ্রই বজ্রাব ভিতব হইতে এক সৌম্য-দর্শন পুরুষ বাহিব হইয়া আসিলেন।

‘কত দূব এলি তোবা?’ মাঝিদেব জিজ্ঞাসা কবিলেন।

চকিতে মাঝিবা দাঁড থামাইয়া দণ্ডবৎ হইল। যে বৃদ্ধ পিছনে হাল ধবিয়াছিল সে বিনীত কণ্ঠে কহিল—‘আইজা, আইলাম কোটাল-ভিটায়—ঐ তো আমবাগান দেখা যায়।’

জমিদাব দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি তাবাইয়া দেখিলেন। কহিলেন, ‘এখান থেকে পদ্মা ক’ক্ৰোশ?’

‘আইজা, ক্ৰোশ তিনেক হইব, ছজুর।’

‘বলিস কবে, এখনও এত দূব। তবে বাড়ি পৌছতে যে বেলা বাবোটা হবে। একটু জোব ধব, বাবাবা। বাড়িব খবব অনেকদিন পাই নি—অসুখ-বিসুখ শুনেছিলাম, মনটা বড ভাল নেই।’

‘লাগা, লাগা, জোব লাগা। ছজুবেব কাছে ইনাম পাবি।’

ইনামেব লোভেই হোক বা দুর্গাপ্রসন্ন বাহিবেব পাটাতনে দাঁড়াইয়া থাকিবাব দরুণই হোক দাঁড়ীবা সত্যসত্যই জোব ধবিল। বজ্রাব গতি হইল দ্রুততব, কোটালভিটার স্বগভীর আমবাগান ক্রমশই নিকট-বর্তী হইল।

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরিবা বংশানুক্রমিক জমিদার। মেঘনার প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এই জমিদারী যেমন বিরাট, তেমনি বর্ধিস্থ। তাহাব উপব লগ্নি এবং কলিকাতায় স্থাবি-রপ্তানীবা ব্যবসায়ে বছকাল যাবৎ তাহা-দেব বংশ লিপ্ত আছে। ব্যবসা এবং ভূমিস্বত্ব হইতে দুর্গাপ্রসন্নেব বৎসরে লক্ষাধিক টাকা আয়।

ভাদ্রের প্রথম ভাগেই মহালে গিয়াছিলেন। জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আদায়পত্রের সুবিধা হয়। এবং শুধু জমিদারেবই নয়, প্রজাদেবও যে তাহাতে সুবিধা হয়, তাহা দুর্গাপ্রসন্ন জানেন। প্রজাদেব উপব তিনি জুলুম করেন না, কোনও অত্যাচার হইতে দেন না, নায়েব-গমস্তা যাহাতে উৎকোচ না নিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখেন, প্রজাদেব অভাব-অভিযোগ শ্রবণ কবেন এবং যথাসাধ্য তাহাব প্রতিকাবে যত্ববান হন। তাহাব মনেব এক অস্পষ্ট প্রান্তে কে যেন আশৈশব এক প্রশ্ন তুলিয়াছে—প্রজাদেব নিকট হইতে এই যে তুই কব আদায় কবিস্, এতে কোন সূত্রে তোব অধিকাৰ? তাহাদেব কোন উপকাৰে আসিয়া তাহাদেব আপ্রাণ পবিশ্রমেব শস্ত্রে তুই অংশ দাবি কবিস্? প্রজাদেব জন্ত পুকুৰ খনন কবাইয়া, পাঠশালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া এবং তাহাদেব সঙ্গে বৎসবেব দু-একটা মাস কাটাইয়া বিবেকেব সেই অক্ষুট অথচ নিবস্তব অস্বাচ্ছন্দ্যকব প্রশ্নটাকে তিনি চাপা দিতে চেষ্টা কবেন।

আগ্নিনেব মধ্যভাগে আজ তিনি মহাল হইতে বাড়ি ফিবিতেছেন। স্বচ্ছল অবস্থার জমিদার হইলেও তিনি সহবেব বাসিন্দা হন নাই। পদ্মাব উপরেই বীবগঞ্জেব চৌধুরিবা বংশানুক্রমিক বাস কবিয়া আসিয়াছেন—দুর্গাপ্রসন্নও তাহাকে ত্যাগ কবেন নাই। তবে পদ্মা যেমন মাবমুর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ভরসা করিবাব কিছুই নাই। নির্দম পদ্মা ফুলিয়া ফুসিয়া অজ্ঞাত ক্রোধে নিরস্তব বীরগঞ্জেব তটপ্রান্তে আঘাতে



পর আঘাত করিতেছে। গৃহের পর গৃহ কুক্ষিগত করিয়া, শত শত নরনাবীকে গৃহহীন নিরাশ্রয় কবিয়া, বিন্দু বিন্দু করিয়া শ্রামল মাটি গ্রাস করিয়া কীৰ্ত্তিনাশ। আজ জমিদার-বাড়ির হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দোদীর্ঘপ্রতাপ ভূম্যধিকারীকে সে সম্মান কবে না, শস্ত্রপাণি পাইক-পেয়াদার বক্তচক্ষুকে সে জ্রকুটি কবে, গুমরিয়া গর্জ্জিয়া ফেনাব বৃদ্ধ উড়াইয়া প্রমত্তা নদী স্তূট মাটিকে চর্ণবিচূর্ণ কবিয়া আপনাব বোপ্য-স্তম্ভ অঙ্গে লেপিয়া দেয়।

নিরুপায় তুর্গাপ্রসন্ন অগত্যা বীবগঞ্জ ত্যাগেব সঙ্কল্প করিতেছেন। কিন্তু এগানকাব মাটির মধ্যে মন বড় গভীর কবিয়া শিকড় গাডিয়াছে। পিতৃপিতামহেব কীৰ্ত্তিপূত এই গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে মন চাহে না, অথচ উপায়ান্তর নাই। বড় জোব মাস ছয়—পদ্মা যদি পুনর্বার মাঝমুর্তি ধাবণ না কবে, তবে বড় জোব আব মাস ছয়। সঙ্কল্প কবিলে পদ্মা এক সপ্তাহেব মধ্যে তাহাকে গৃহহীন কবিতো পাবে। অথচ এই সংহাবিণী নদীব জন্ম এক অপূর্ণ আশ্রীতাবোধ মনেব মধ্যে গডিয়া উঠিয়াছে—একে ছাড়িয়া যাইতে যেন ইচ্ছাই হয় না।

তুর্গাপ্রসন্নেব মন ভাল ছিল না। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে চব-কুন্ডীবাব কাছালিতে বাড়িব চিঠি পাইয়াছিলেন। তাহাতে সদব-গমস্তা লিখিয়াছিল, ‘কত্ৰীমাব শবীব ভাল নয়, আপনাব কার্য শেষ হইলে বিলম্ব কবিবেন না।’ তাবপর নিজ কার্যে এমনি ব্যাপৃত ছিলেন যে, বাড়িব কথা বিশেষ একটা মনেই আসে নাই। বাড়িব দিকে বওনা হইয়াই কিন্তু নানা উদ্বেগে তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। গৃহিণীব শবীব অনেকদিন ধিয়াই খাবাপ যাইতেছে—যা ভয় কবেন পদ্মাকে, নদীব ভয়েই সাবাক্ষণ তটস্থ থাকেন। বলেন, এই পদ্মাই আমাদেব সর্বনাশ কববে। হা হা! পদ্মা কবিবে কি। পদ্মা বাড়ি ভেঙে দিলে অগ্নত্র কি বাড়ি গড়া যায় না? তবে কিসেব ভয় পদ্মাকে! ওকে একবাব হাওঁয়া-বদলাটে

পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া দবকাব ! পূজাটা যাক, তার পর এ-সম্বন্ধে ভাবা যাবে !

রোদ্দ আসিয়া দুর্গাপ্রসন্নের উন্মুক্ত গৌবর্ণ স্পৃষ্ট দেহে পড়িল। পাটাতনের উপর তেমনি তিনি দাঁড়াইয়া বহিলেন। মাঝিবা দাঁড় বাহিয়া চড়িল, এবং মনে মনে কামনা কবিত্তে লাগিল—হুজুব ভিতরে গেলে হয়, তামাকটা তবে ধবান যায়।

দুর্গাপ্রসন্নেব দুইটি সন্তান। বড়টি মেয়ে, তাব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামী এলাহাবাদে ব্যারিস্টার—এবং তাবা পশ্চিমবই স্বায়ী বাসিন্দা। ক্ৰটিং হৈমন্তী বাপেব বাড়ি আসিতে পাবে। গত সুদীর্ঘ সাত বৎসবেব মধ্যে বাব দুই মাত্র বীবগঞ্জে আসিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতায়ও দু'চাববাব দেখা হইয়াছে। গ্রামেব প্রতি জামাইয়েব গভীব অবজ্ঞা দুর্গাপ্রসন্নেব অজানা নয়, অথচ নিজেবও তাব গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়াব উপায় নাই। স্তবঃ কন্যাব সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বিরল হইয়া উঠিযাছে। দুর্গাপ্রসন্ন ইহাব জ্ঞাত এখন আব আক্ষেপ কবেন না, বিঃয় হইলে মেয়ে তো পবেব হইয়া যাইবেই। কন্যা সংপাত্রে সম্প্রদান কবিয়াছেন—তাবা স্থখে থাকিলেই যথেষ্ট।

দুর্গাপ্রসন্নের সমস্ত পিতৃশ্লেহ আসিধা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাব বালক-পুত্র বাজার উপর। বাজা ছাড়াও যে তাব অগ্র একটি সন্ধান আছে, মাঝে মাঝে তিনি সে কথাই ভুলিয়া যান। তাব সমস্ত পিতৃহৃদয় জুড়িয়া এই বালক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, বাজাব ভবিষ্যতেব কত স্তম্ভস্বপ্ন যে তিনি ইহাবই মধ্যে দেখিতে আবিস্ত করিয়াছেন, তাহাব সীমা-সংখ্যা নাই।

হুর্গাপ্রসন্ন বাড়িব কথা ভাবিতে লাগিলেন। বাজা এতদিনে নূতন  
কি কি সব কীষ্টি কবিল, কে জানে। যা হুবস্থ হইয়াছে ছেলে। পদ্মাব  
কোলেই যে মানুষ, শান্তশিষ্ট সে আর হইবে কেমন করিয়া, তব

দৌবাগ্ৰ্য্যব একটা মাত্রা থাকা উচিত । এই ক্ষুদ্র বাজা একদিন বড় হইবে, চৌধুরি-বংশের ভাব গ্রহণ করিবে ।—বাবো বংশের মাত্র বয়স, আরও কত দেবি । এতদিন কি আমিই বেঁচে থাকব ? এই বাজার জগ্গই তো নতুন করিয়া বাড়ি-পত্তন করিতে হইবে—ওব যেন এতটুকুও অহুবিধা না হয়, ও যেন স্থগে থাকিতে পাবে ।

‘এইবার একটু আস্তে চল তো, বাবাব’, কোটালভিটাটা একটু ভাল ক’বে দেখে নিই ।’

কোটালভিটার আমবাগানের প্রান্তে বজ্জ্বা উপস্থিত হইয়াছে । মাঝিবা দুর্গাপ্রসন্নের আদেশে গতি মন্দীভূত করিল । দুর্গাপ্রসন্ন অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে কোটালভিটার আম্র-কানন এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অবশেষে কহিলেন, ‘সুন্দর জায়গা । একেবারে খালের বুকেব উপরে, অথচ বেশ উঁচু জমি । চাবদিক বড় সুন্দর । এখানে লোক-জনের কোন বসতি নেই ?’

‘আইজ্ঞা, মোটে না ।’ হাল ধরিয়া বৃদ্ধা মাঝি জবাব দিল

‘কেন, জমি তো বেশ শস্তশালীই মনে হয় । তা’ছাড়া পায়ের তলাতেই জল । বসতি একটা গড়ে’ ওঠে না কেন ?’

‘পতিত জমি কিনা, হুজুব—কেউ আইতে চায় না, ডবায় । কত বৎ নামী বংশ কোটালভিটার মালিক আছিল হুজুবের তো তা আজানা না । সেই বংশই পড়ল এইখানে—হাতীশালা ঘোড়াশালা, পাঠক-পেয়াদা, হক্কল ডুবচে না এই ডাঙায় । তাই তো এইটাবে বাই-ক্ষসী জমি কয়—ইযাব মুখে আইব কে ? লক্ষ্মীছাড়া জমি লোক গিলে ।’

‘লক্ষ্মীছাড়া জমিতে কি এমন আমগাছ হয় ? এমন রসে ভরা জমি আব কোথায় আছে ?’

‘কিন্তু, হুজুব অমুন বংশটা তো এই জমিই গিলা খাইল, নাইলে এত লোকজন, মণিমাণিক্য চক্ষু নিমিষে তলায় ক্যামতে ?’

‘ওসব জমির দোষে তলায় না, ইসমাইল, জমির মালিকের দোষে তলায়। লৌহজঙ্ঘের পদ সা’রই তো জমিটা, তাই না হে?’

‘আইজা, হজুর।’

‘বেশ জমি, সুন্দর জমি! এখানে চমৎকার একটা গ্রাম হ’তে পারে।’

‘হজুর।’

‘তোমরা এখানে আম চালান নিতে আস না?’

‘আগেব সন আইছিলাম হজুর, এই সন আব আসি নাই। হাঁপানির লাইগা ফকিবের মাদুলি নিছি কিনা, ফকিবের বাবণ আছিল।’

‘কেন?’ বিস্মিত হইয়া দুর্গাপ্রসন্ন প্রশ্ন কবিলেন।

‘সত্য মিথ্যা জানি না হজুর, লোকে কয় এইখানে দানাপ্রেত আছে। ফকিব বাবণ কইবা দিছিল—কোটালভিটার বাগানে বাত্রি বাস কববি না, ইসমাইল, খববদাব। তাইলে মাদুলি গুণ নষ্ট অইব—’

শুনিয়া দুর্গাপ্রসন্ন মুহু মুহু হাস্য কবিতে লাগিলেন। যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানেই ভূত থাকে, এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মানুষের কবেকাবে তাহাব হিসাব নাই, কিন্তু মহাকাশে এত স্থান থাকিতে অশব্দী জীবেরা কেন যে বস্তু-জগতে আসিয়া ডেবা বাঁধিবে, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি প্রমাণচিহ্নহীন।

কোটালভিটার আমবাগান পাব হইলে তবে দুর্গাপ্রসন্ন বজ্রাব ভিতবে পুনঃপ্রবেশ কবিলেন। পূর্বেই প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইয়াছিল, পাচক আসিয়া জানালা পার্শ্ববর্তী তেপায়ায় প্রাতবাণ বাখিয়া গেল। অন্তর্যমেনে আহাব কবিতে কবিতে দুর্গাপ্রসন্ন জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া বহিলেন। পিছনেব ঝাঁকটার ঠিক উপরেই কোটালভিটার আমবাগান উচ্চভূমি হইতে হাত-ইসারা করিয়া ডাকিতেছে। জমি

অতি-উৎসবতা, পদপ্রাস্তলীন খাল, ঐতিহাসিক আভিজাত্য, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া দুর্গাপ্রসঙ্গের মনেব মধ্যে একটা কেমন আকর্ষণ বিস্তার কবিল। অতীতেব এক অশ্বশালা হইতে হুঁষা ও হস্তিশালা হইতে বৃংহিত, নহবৎখানা হইতে শানাইয়েব আলাপ এবং বাজপথ হইতে উল্লসিত জনমণ্ডলীব কলকোলাহল কানে আসিয়া প্রবেশ কবিতে লাগিল— এক সম্পদশালী জনপদেব দীপ্ত গোববনয় চিত্র চোখেব সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দুর্গাপ্রসঙ্গ যখন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন কোটাল-ভিটা বহু পশ্চাতে পড়িয়া বহিয়াছে—দূর হইতে আমবাগানটাকে বহু দূরেব আকাশে একটা অস্পষ্ট মেঘখণ্ডেব মত প্রতীয়মান হইতেছে। কোটালভিটাব বর্তমানকে দুর্গাপ্রসঙ্গেব বড়ই করণ মনে হইতে লাগিল।

জানালাতে কলুই ভব দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বাড়ি তো আমাকে নতুন ক'বে কবতেই হবে, বোটার্ভিটায় কবলে কেমন হয়? মনেব মত কবে' এখানে একটা গ্রাম গ'ড়ে তোলা যাব না? বাজা বড় হবে তাব বাপেব নিজেব হাতে গড়া এই গ্রামে স্থখে বাস কববে। সহবেব চাইতে সুন্দর, অথচ খাঁটি গ্রাম,—শস্ত্রশ্রামল, বৌদ্ধভবা, আকাশ-ভবা গ্রাম কবে যে বাজা বড় হবে, মানুষ হবে একটা টুকটুকে বউ এসে অন্তঃপুরে নেচে নেচে বেড়াবে।

দূর দেখা গেল পদ্মাব বহুবিস্তৃত জলাশ্রাত। খবর পাইয়া দুর্গাপ্রসঙ্গ বাহিবে আসিলেন। বৌদ্দালোক পদ্মাব বৌপ্যবর্ণ জলবাশি বালসিয়া উঠিল।

পদ্মা। পদ্মা! বহুশ্রমযী পদ্মা! ইহাব স্নেহস্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি কেমনে যে এক মুহূর্তে অবলীলাক্রমে জিঘাংসা-ভীষণ কবাল-দংষ্ট্রা বাক্ষসীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়, সে এক বহুশ্র। কিন্তু এই বহুশ্রমযী অপূর্ণ মায়াবলে মানুষকে মুগ্ধ করে—দুর্গাপ্রসঙ্গে মুগ্ধ কবিয়াছে। -বাঙ্গা-প্রমত্তা প্রলয়ঙ্করী

পদ্মার ভৈরবী মূর্তি দেখিয়া দুর্গাপ্রসন্ন যখন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছেন, তখনও মনে মনে তিনি প্রশ্ন কবিয়াছেন—মাগো, এত স্নেহ যদি তোর মনে, এত শাস্ত্র, এত প্রাণ যদি মা সন্তান-স্নেহে বিলাইয়া দিস, তবে মা, এমন সংহারিণী মূর্তি ধবিস্ কেন ?

পদ্মা নিকটবর্তী হইল। খাল ক্রমেই চওড়া হইয়া উঠিল, জলে নদীর রঙ লাগিল। মাঝিবা দাঁড় তুলিয়া বাখিষা বৈঠা বাধিতে লাগিল। গভীর জলের জল পূর্য্ণাঙ্কেই প্রস্তুত হইতেছে।

বুদ্ধ ইসমাইল মাঝি হাওয়াব গতি এবং দিক লক্ষ্য কবিয়া সহর্ষে কহিল, ‘পালে বাতাসটা লাগব মনে হইতেছে। বসিকষিব জোগাড় দেখ, গাঙে পইড়া যেন আব দেবি না হয়। তডাতডি পৌছাইলে কর্তাব কাছে ইনাম পাবি।—হুসিযাব ভাই, যাব যাব ডাইনে।—কোন হানে যাইব তোমাগো নাও ?

## দুই

যখন দুর্গাপ্রসন্নের বজ্র বা ব্লিগগঞ্জের জমিদার বাড়ির হাতাব মধ্যে যাইয়া প্রবেশ কবিল, তখন পদ্মার আকাশে অতি ভয়ঙ্কর মেঘ সাজিয়া উঠিয়াছে। আব দেবি হইলে পদ্মা হয়তো কবাল মুগ-ব্যাধান কবিয়া উঠিত, নির্দম বাক্ষসী মত উন্নতনৃত্যের প্রলয়ঙ্কর অভিনয় শুরু কবিয়া দিত—অকিঞ্চিৎকর একটা বজ্র বা বাঁচিত কিনা কে জানে।

পশ্চাত্তেব ঘনঘটাব দিকে চাহিয়া দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন—‘যাক্, খুব বাঁচা গেছে, ইসমাইল, নইলে অকালের ঝড়ে পদ্মা কেমন ক্ষেপে উঠত, কিছু বলা যায় না।’

‘হুজুব।’

প্রভুর বজ্রবা দেখিয়া সাবা কাছাবি-বাড়িব লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছিল। তাহাদের পূর্বোভাগে সদব-গমস্তা অশ্বিকাচরণ লক্ষ্যবাস্প কবিয়া বজ্রবা নোঙব কবিবার উপযুক্ত স্থান সম্বন্ধে মাঝিদের অনর্গল উপদেশ দিতে লাগিল—হাঁকডাক কবিয়া উপস্থিত ভূইয়ালী ও ভৃত্যদেরই ডাকিয়া একশেষ হইল, এবং অতঃপব নিজে যাইয়া বজ্রবাব গলুই টানিয়া ধবিয়া কৰ্ম্মনৈপুণ্যেব পবিচয় দিয়া ছাড়িল।

দুর্গাপ্রসন্ন অবতরণ কবা মাত্র পদধূলি গ্রহণেব একটা সমাবোহ পড়িয়া গেল, এবং নিরুপায় অবস্থায় এই সম্মান গ্রহণ ও উপযুক্ত আশীর্বাদ বর্ষণেব পব তবে মাত্র তিনি বাড়িব কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে পাবিলেন। এক নিমেষে তাঁব উৎসুক চোখ দেখিয়া লইয়াছিল, বাজা নদীব পাড়ে উপস্থিত নাই। অথচ 'ওব চঞ্চল ঔৎসুক্যেব চবি তিনি মনে মনে এই দীর্ঘ পাঁচ দিন জলপথেব যাত্রায় কতবাব যে আঁকিয়া লইয়াছেন, তাঁব ঠিক নাই।

‘বাড়িব থবব সব ভাল তো, অশ্বিকা?’—সামান্য আশঙ্কিত স্ববে দুর্গাপ্রসন্ন প্রশ্ন কবিলেন।

‘তেমন না।’ অশ্বিকা কহিল।

এক মুহূর্তে দুর্গাপ্রসন্ন উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

‘বাজাব অসুখ-বিসুখ নয তো?’—বাজাব কথাই তিনি ভাবিতে ছিলেন।

‘আজ্ঞে, না। কর্ত্তীমাবই।’

‘খুবই বেড়েছে কি?’

‘একই বকম আছেন।—তবে কিনা, কর্ত্তী, ওনার কেবলই ভয়, পদ্মা নদী এই বুঝি পাগলা হয়ে উঠলো—এই বুঝি বাড়ি-ঘব সব চুবমাব ক’বে দিল।—অসুখ তো আদপে ঐ। বোজই প্রতুল ডাক্তার—’

দুর্গাপ্রসন্ন কথা-পত্রিসমাপ্তিব জগ্ৰু অপেক্ষা কবিলেন না—কাছাবি-  
বাডি দক্ষিণে রাখিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে অন্তঃপুবেব দিকে রওনা হইলেন।

আকাশে আকাশে বিদ্যাহং চিড়িক খাইয়া গেল—দিগন্ত হইতে  
দিগন্তে খাঁড়াব বঙ্কনা বাজিয়া উঠিল, পদ্মাব জলবাশি আবর্ত রচনা  
কবিয়া, ফেনাব বৃদ্ধ উডাইয়া, মস্তনেব দাপটে ঘনগন্তীব গজ্জন কবিতে  
করিতে সংহাবিনী মূর্ত্তি ধাবণ কবিল। অদৃশ্য হইতে লক্ষ লক্ষ  
কাডা-নাকাডা বাজিয়া উঠিল।

দ্বিতলে জীব শয়নক্ষে দুর্গাপ্রসন্ন সভয়ে আসিয়া প্রবেশ কবিলেন।  
দেখিলেন, খাট শূণ্য—কেহই শুইয়া নাই। খাটের পাশে আবাম-  
কেদাবাটাও শূণ্য পড়িয়া বহিয়াছে। দুর্গাপ্রসন্ন ঈষৎ শঙ্কিত এবং সম্পূর্ণ  
বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি সম্প্রসাৰণ কবিলেন। দেখিলেন, জানালাব গবাদ  
ধবিয়া হেমাজিনী দাঁড়াইয়া আছেন—মাথা হইতে ঘোমটা পড়িয়া গেছে,  
আলুখালু একবাণ আজ্ঞাত্বন্দ্বিত গোলা চুল মেঘজালের মত উড়িতেছে,  
ঝোড়ো বাতাসে শিথিল অঞ্চলপ্রাপ্ত অসম্ভৃত।

দুর্গাপ্রসন্ন কাঁশিলেন, জুতাব গোড়ালি দিয়া মেঝোত শব্দ কবিলেন।  
হেমাজিনীব কর্ণে তাহা প্রবেশই কবিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া  
তিনি ডাকিয়া কহিলেন—‘আমি এসেছি—শুনচ।’

এইবাব চকিতে হেমাজিনী ফিবিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চোখে  
তাঁব অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি—নীর্ণ মুখেব তুলনায় তাহা অত্যন্ত অপ্রভাবিক  
উজ্জল মনে হইল। রক্ষ অবিচলিত চুল কত যে মুখমণ্ডলের উপর  
আসিয়া পড়িয়াছে, তাব ঠিক নাই। ক্লান্ত ওষ্ঠ এবং গণ্ডের শিথিল  
মাংসপেশী দেখিয়া সন্দেহেব অবকাশ থাকে না যে, নিজেব  
মধ্যকার এক গভীর সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছেন। হেমাজিনীর  
ক্রীমবর্ণিত হৃন্দব মুখমণ্ডল বিবিধ বিকৃতির তলায় লুকাইবার উপক্রম



কবিয়াছে। একই সময়ে তাকে অপ্রকৃতিস্থ, উদাস, অদ্ভুত এবং কল্পণ মনে হইতেছে।

অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেমাজিনী নিকটে আসিলেন। স্বামীকে চোখেব দিকে শঙ্কাতুব দৃষ্টিতে চাহিয়া অকস্মাৎ কহিয়া উঠিলেন, ‘আমাব ভয় কবচে, পদ্মাকে ভয় কবচে।’

‘ভয় কিসেব?’ দুর্গাপ্রসন্ন দুই সবল হস্তে স্বামীকে ধরিয়া দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে কহিলেন।

‘পদ্মা নদী কেমন ডাক ছেড়ে এগিয়ে আসচে, দেখতে পাও না?—ও গিলতে আসচে, ঠিক গিলতে—’

‘কোথায় এগিয়ে আসচে? মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, হেম। যতটা আমি দেখে গিয়েছিলাম, তাব চেয়ে আব এক চুলও এগোয়নি। এ বছর আব ভাঙবে না।’

হেমাজিনী যেন আশ্বাস পাইলেন। একটা নির্ভবতাব স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ এক মুহূর্তেব জন্ম তাব মুখে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু পবক্ষণেই আবাব তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন—‘তবে সাবাক্ষণ কেন এমন শাসায়—পাড়ে এস সাপেব মতন কেন ছোবল্ মাবতে থাকে?’

‘বিজ্ঞানাতে এসে বস, জবে তোমাকে ভাবি দুর্বল কবচে, দেখতে পাচ্ছি।’ বলিয়া দুর্গাপ্রসন্ন স্বীকে ধরিয়া ধীরে ধীরে খাটে আনিয়া বসাইলেন। স্পষ্টই বুঝিতে পাবিলেন, পদ্মাব জন্ম হেমাজিনীকে ভয়টা অকস্মাৎ অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিয়া আজ তাব মস্তিষ্ক অধিবিকৃত কবিয়া তুলিয়াছে। দুর্গাপ্রসন্ন বুঝিলেন, এতদিন মহালে থাকা তাব উচিত হয় নাই, তিনি উপস্থিত থাকিলে হেমাজিনীর স্নায়ুমণ্ডলী হয়তো এতটা বিকৃত হইয়া উঠিতে পাবিত না। দুর্গাপ্রসন্ন নিজেকে অত্যন্ত অপবাদী বোধ কবিতে লাগিলেন। পদ্মার জন্ম কাহারও ভয়-যে

এতটা আন্তরিক ও ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা দুর্গাপ্রসন্ন কল্পনা করিতে পারেন না। পদ্মা যতই ভয়ঙ্করী হউক, তিনি যে মনে মনে তাকে চিবকাল ভালবাসিয়াছেন। এখন অকস্মাৎ তাঁহাব মনে হইল—সত্যি তো, হেমাঙ্গিনী তো পদ্মাপারের মেয়ে নয়, পদ্মাব কোলে তো সে লালিত হয় নাই, সভ্যতাব মধ্যে, নগরীর নির্ভরশীল আবেষ্টনে তাহাব কিশোরী-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। পদ্মাকে সে ভালবাসিবে কেমন কবিয়া, পদ্মাকে ভয় কবাই তো তাহাব পক্ষে স্বাভাবিক।

‘কেন মিছিমিছি পদ্মাকে ডবাও, হেম’, দুর্গাপ্রসন্ন স্ত্রীর হাত দুইটা নিজের হাতের মুঠাব মধ্যে লইয়া কহিলেন। ‘কি কবতে পারে পদ্মা তোমাব ? সামান্য একটা নদী, কি ওব সাধ্য ?’

দুর্গাপ্রসন্নের উপস্থিতিতে হেমাঙ্গিনী যেন আশ্বাস খুঁজিয়া পাইলেন। তাব ভয়-চকিত দৃষ্টি এবং শঙ্কা-অসংলগ্ন কণ্ঠস্বর বহু পরিমাণে স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিবিয়া পাইল। অনেকটা স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন—‘পদ্মাকে আমার বড় ভয়। কেবলই মনে হয়, বাবুসী নদী আমার সর্দশ কবে ছাডবে, আমার সর্দশ না গিলে ওব ক্ষুধাটা কিছুতেই মিটেবে না।—সাবাক্ষণ কেমন ডাকতে থাকে, দেখ না ?’

‘এ তোমাব অনর্থক ভয়।—পদ্মা তোমাব কি কবিতে পার, ভেবে দেখ। বড় জোব বীরগণ্ণেব এই বাড়ি ভেঙে দিতে পারে, তাব বেশি আব কিছু পারে না। বেশ তো, ভেঙে যদি দেয়ই, নতুন বাড়ি কি আব আমি বানাতে পারবো না ? যতই প্রতাপ হোক পদ্মাব, ও কি আমার সর্দশ লুণ্ঠ কবতে পারে ? সম্পূর্ণ একটা নতুন গ্রাম আমি তৈরি কবতে পারি—নতুন একটা বাড়ি তৈরি কবান আমার পক্ষে কিছুই নয়।’

‘তবে চল পদ্মার কাছ থেকে আমার পালিয়ে যাই। ওব ভয়ে যে সার্বক্ষণ আমি কাঁপতে থাকি, বুকাটা হুরুহুরু কবে।’

‘বেশ, তাই হবে,’ দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন। ‘পূজোর পরই আমি বাড়ি উঠিয়ে নেবাব ব্যবস্থা করব। কিন্তু তাই বলে, সামান্য একটা নদীকে তুমি এমন ভয় করবে যাবে কেন?’

‘সাবাক্ষণ আমার ভয় হয়— পদ্মা বুঝি ভেঙে দিল, সর্বস্ব ভেঙে দিল। ঘুমালে আমি স্বপ্ন দেখি, একটা ঝড়ের মতন পদ্মা ছুটে আসচে, আমার এত স্ত্রের সংসার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিবে গেল বলে। সাবাবাত আমি আব চোখ বুজতে পারি না।’ উদ্বেজনায ও একটা অবর্ণনীয় আতঙ্কে হেমাদ্বিনী ইঁপাইতে লাগিলেন।

ভাবনাগ্রস্ত দুর্গাপ্রসন্ন সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। তাবপব কহিলেন—‘ওষুধ খাচ্ছ? প্রতুল ডাক্তার শুনলাম বোজাই আসচে—’

‘না, ওষুধ আমি খাইনা।’

‘কেন?’

‘আমাব জ্ব নেই, আমার কোনও অসুখ নেই, ওষুধ আমি খাব না।’

‘তোমাব শরীর বড় দুর্বল—কোনও বলকায়ক ওষুধ খাওয়া দবকাব।’

‘ওষুধ আমার দবকাব নেই, সত্যিই কোন দবকাব নেই,’ হেমাদ্বিনী সহসা উচ্ছ্বাসেব সঙ্গে কহিতে লাগিলেন। ‘তোমাব পায়ে পড়ি, পদ্মাব পাব থেকে আমবা পালিয়ে যাই চল। ওষুধে আমার কাজ নেই। শুনচো, প্যাড-ভাঙাব শব্দ? ও কি, বাতাস না পদ্মা?...’

বাহিবেব মত্ত গর্জ্জন এইবাব তাহাদেব কর্ণে প্রবেশ কবিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশেব এক প্রান্ত হইতে অগ্নি প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া লক্ষ কোটি কামানেব মিলিত গর্জ্জন ধবণীব বন্ধে, রন্ধে, ঝাঁকুনি দিয়া গেল। হেমাদ্বিনী মৃত্যুভীত চিংকাব কবিয়া বক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর বুকে গুঁজিয়া ফেলিলেন। খোলা জানালার পথে বহ্নিশ্রোতেব মত বৃষ্টি ও বাতাস প্রবেশ কবিতে লাগিল।

দুর্গাপ্রসন্ন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'ভয় কি, এটা বাজ পড়ল।  
দাঁড়াও, আমি জানুলাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

যতদূর দেখা যায়, বিশ্বপ্রকৃতি প্রলয়ঙ্কর মূর্তি ধবিয়াছে। আকাশেব  
এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মেঘেব ঐবাবত বৃহিত কবিতে  
কবিতে, শুঁড় দাপটিয়া অন্ধ বেগে অদৃশ্যকে আক্রমণ কবিতে ছুটিয়া  
চলিয়াছে। উদ্ধত বোম্বে বিদ্যুৎ আক্ষালন কবিতেছে, আবহিত  
বাতাসে বাতাসে মথিত ধবিত্রীব ক্ষুদ্র আর্তনাদ জাগিয়া উঠিয়াছে,  
পদ্মার পরপাব এবং মেঘাঙ্ককাব একাকাব হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।  
যেন ঝঞ্জেব পদক্ষেপে ধবণী টলমল কবিতেছে। দুর্গাপ্রসন্ন  
হতবাক হইয়া এই দুয়োগেব দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বহিলেন—  
সংহাবিণী পদ্মা চোখেব তলায় উন্নত নৃত্য কবিতে লাগিল।

সহসা নদীব পাড়ে তাব দৃষ্টি পড়িল। দুর্গাপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন।  
দেখিলেন, বাহিবেব অসহায় উন্মুক্তিব মধ্যে ক্ষুদ্র ছায়াব মতো একটি  
বালক পদ্মাব কিনাবে দাঁড়াইয়া অতি নির্লিপ্তভাবে দুয়োগ উপভোগ  
কবিতেছে। গঞ্জমান বহিঃপ্রকৃতি, সংহাবিণী পদ্মাব ভ্রুকুটি-ভঙ্গি, বিদ্যুৎ-  
বিদীর্ণ আকাশ—এ সকল যেন তাব নিকট নেহাংই অবিক্ষিতকব ব্যাপাব।  
পবন আনন্দ সহকাবে মাথাটা পদ্মাব দিকে ত্রুৎসুক্য ভবে বাড়াইয়া  
দিয়া অন্ধকাবের মধ্যে সে কি যেন লক্ষ্য কবিতেছে। গায়ে গেঞ্জি, কাপড  
বেড দিয়া পরা, ঝড়েব বাতাসে কাপড এবং মাথার চুল সমানে  
উড়িতেছে, তাব ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। অথচ এই বাতাস অনায়াসে  
তাকে শূণ্ণে তুলিয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ কবিতে পাবে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, আশঙ্কায় স্থলিতবাক্ দুর্গাপ্রসন্ন চিৎকাব করিয়া  
দুঃখিলেন। এক মুহূর্তে সমস্ত বুদ্ধি এবং সমস্ত শক্তি যেন তাঁহাকে ত্যাগ

করিয়া গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন, এবং প্রাযাঙ্ককাব সিঁড়ি দিয়া নিচের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

হেমাজিনী স্থলিত-পদে জানালার পাশে ছুটিয়া আসিলেন। ভীত আর্ন্ত চিংকাব কবিয়া কহিলেন—‘পদ্মা আমার সর্বনাশ করবে—রাক্ষসী আমাব সর্বনাশ করবে।’

উদ্ধ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে দুর্গাপ্রসন্ন নিচে নামিয়া আসিলেন। উত্তেজনায এবং দীর্ঘ জলপথ যাত্রাব অবদাদে তাঁর পা কাঁপিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল পড়িয়া যাইবেন। কিন্তু একটুও বিলম্ব কবা চলে না। মুহূর্ত্তেব বিলম্বে হয়তো সর্বনাশ হইয়া যাইতে পারে। মনে হইতে লাগিল, পাডেব মাটিতে ফাটল ধরিয়াছে, এইবাব কঠিন মাটি স্রোতের আঘাতে কাচের বাসনের মত চুবমার হইয়া যাইবে। শোনা যাইবে নদীতে একটু বর্ধিত জলোচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র এক মানব-শিশুর করুণ আর্ন্তনাদ এই বিস্কন্ধ বায়ু এবং নদী-গর্জনে শোনাই যাইবে না।

দুর্গাপ্রসন্ন ঝড়েব মধ্য দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। চোখে প্রায় কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না, তবু সমস্ত দৃষ্টিশক্তি সংহত কবিয়া তিনি ছুটিয়া গেলেন এবং দৃঢ়-মুষ্টিতে পুত্রের ক্ষুদ্র বাহটা ধবিয়া ফেলিলেন। পলকে তাহাকে শূণ্যে তুলিয়া লইয়া তিনি বন্ধ চোখেই গৃহেব উদ্দেশে ছুটিলেন।

বাজাব কিন্তু কিছুই হয় নাই। পিতাব বৃকেব সঙ্গে লাগিয়া সহর্ষে সে কহিল—‘বাবা! তুমি! হিহি—’

টলিতে টলিতে দুর্গাপ্রসন্ন দালানে পৌছিলেন। সক্রোধে রাজাকে এক দিকে ঠেলিয়া দিয়া সমুখের চেয়ারটায়ই এলাইয়া পড়িলেন। এবাব বাজা বুঝিল কিছু একটা ব্যাপার ঘটয়াছে। পিতার অবসন্ন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সামান্য অপ্রতিভ এবং আশঙ্কিতও হইল এবং যখন দেখিল কতক্ষণ হইল তিনি চোখও মেলিতেছেন না, বরঞ্চ একটা

ব্যথা চাপিবাব চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি কর্তব্য বুঝিতে না পারিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা বাবাব পায়ের উপর টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম কবিয়া বসিল।

দুর্গাপ্রসন্ন চোখ মেলিয়া চাহিলেন।

বাজা এইবাব সাহস পাইল। কহিল, ‘বাবা, আমাব হবিণ কোথায় ? হরিণ আনো নাই কেন ? আমি না তোমাকে কত কবে বলে দিলাম। তুমি তো বললে আনবে। তবে আনলে না কেন ? পাওয়া গেল না ? একটাও না ? তবে তুমি বলেছিলে কেন যে—’

‘রাজা, তুই একটা আস্ত বাদর হয়েছিস,’ দুর্গাপ্রসন্ন সঙ্ঘিৎ ফিরিয়া পাইয়া গম্ভীৰস্বৰে তিবন্ধার কবিয়া কহিলেন। অথচ সমগ্র জলপথ তিনি কল্পনা কবিয়া আসিয়াছিলেন, দেখা হইলেই বাজাকে কেমন স্নেহ-সন্তোষণ করিবেন, কত আদর কবিবেন।

রাজা অবস্থাসেব সঙ্গে চাহিয়া কহিল,—‘ধোং, হবিণ চাইলে বুঝি বাদব হয়। মাবও তো ছোটবেলায় হবিণ ছিল। তবে মা বুঝি—’

অল্পসময় হইলে দুর্গাপ্রসন্ন হাসিয়া ফেলিতেন। এখন গম্ভীৰ দৃষ্টে কহিলেন, ‘কি কবছিলি নদীৰ পাড়ে দাঁড়িষে, হুমান ? চোখে ঝড় দেখতে পাস না ?’

‘বেশ তো।’ বাজা প্রতিবাদেব স্বৰে কহিল, ‘আমি তো নৌকাডুবি দেখতেই দাঁড়িয়েছিলাম। ঝড় ছাড়া নৌকা ডুবতে বয়ে গেল।’

‘নৌকাডুবি। কোথায় নৌকাডুবি ?’

‘আমাদেব ঘাটের সামনেই তো কাল একটা ডুবে গেল। বা মজা নৌকাডুবি দেখতে। নৌকা কেবল পাক খায়, কেবলই পাক খায়। আব মাঝিরা, বুঝলে বাবা, বৈঠা মাথার ওপরে উঠিয়ে কেবলই ‘আজ্ঞা আজ্ঞা’ বলে চেষ্টিয়ে একশেষ।—আর গলুইটা না, একবার জলেব মধ্যে ডোবে, আবার ভেসে ওঠে। যা তামসা, হি হি—’

দুর্গাপ্রসন্ন সাতকে কহিলেন, ‘কালও দাঁড়িয়েছিলি ?’

‘বাঃ বে, কাল তো আমি আব একলা ছিলাম না—সরকার মশায় ছিল, গোবর্দ্ধন পেয়াদা ছিল, বাম চৌবে ছিল, হরি ভূঁইয়ালি ছিল, আরও কত সব। সওয়াবিগুনের যা কান্না—হেসে আব বাঁচি না। এমন সময় না, একথানা দম্কা বাতাস—আব নৌকাটা না, একেবাবে কাৎ। ছিটকে জলে পড়ে যা তাদেব হাত-পা ছোঁড়া—হাসতে হাসতে আমার পেট ফাটে আব কি—হি হি হি—ব্যাঙের মতন—হি হি—আজ আবেকটা ডোবে তো বেশ হয়—’

দুর্গাপ্রসন্ন স্তম্ভিত হইয়া বাজার মুখেব দিকে চাহিয়া বহিলেন। স্কুমার সুন্দর একটা মুখ—প্রায় মেয়েব মত কমণীয়। হরিণেব মত দুইটা চঞ্চল চোখ, তাব উপর বাঁকা বাঁকা জিজ্ঞাসু ভুরু, চওড়া কপালে এবং তীক্ষ্ণ নাসিকায় ঔদায্যেব ছাপ মাথান। অথচ এই ক্ষুদ্র সুন্দর শিশু নিষ্ঠুরেব মতন পবেব বিপদেব মধ্যে এমন অন্তত আনন্দ পাইল কেমন কবিয়া? পরেব মৃত্যু তাব কাছে হাসিবাব জিনিষ, তামাসা দেগিবাব মত বঙ্গ। সহসা দুর্গাপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন। ইহা কি তবে পদ্মাব সর্বনাশা দান?—পদ্মাব কোলে বড় হইবাব অনভিপ্রেত ফল? পদ্মাব হিংস্রতা তাব ক্রোড-লালিত সম্বন্ধেব মধ্যে সংক্রমিত, হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইলে চলিবে কেন? দুর্গাপ্রসন্ন শিহবিষা উঠিলেন। আপনাব অজ্ঞাতে এই শিশু কী বীভৎস শিক্ষা পাইতেছে। যদি বড় হইয়া বাজা এমনি পবেব দুঃখে আনন্দিত হয়—দয়া, সহানুভূতি, পবদুঃখকাতবতা তাব কাছে অর্থহীন মূল্যহীন বৃত্তিমাাত্র মনে হয়, তবে তাব দায়িত্ব বাজাব নহে, দুর্গাপ্রসন্নেব। কেন তিনি শৈশবে পদ্মার কাছ হইতে তাকে দূরে বাঞ্ছন নাই—কেন এই শিশু বরজ্জেব মধ্যে পদ্মাব সঙ্গীত মিশিতে দিযাছেন।

‘জলে পড়ে লোকগুলি মরে গেল?’ দুর্গাপ্রসন্ন সোচ্চেনে প্রশ্ন করিলেন।

‘বাঃ রে, আমরা তাড়াতাড়ি গেলাম যে—নইলে মরেই তো যেত।’ বাজা নির্লিপ্তস্ববে জবাব দিল।

‘তুইও গেলি?’

‘বাঃ, গেলাম না বুঝি! বউটাব খুকিটাকে আমিই তুললাম না! সরকার-মশায়বা কি ওকে দেখতে পেয়েছিল?’ সগর্বে রাজা কহিল।

‘ঝড়েব মধ্যে তুই গেলি?’

‘না গেলে খুকিটা যেন বাঁচত।’ বাজা নাক কুঁচকাইয়া ঠোঁট বাঁকা কবিতা কহিল। ‘আমিই তো ডুব-সঁতাব দিয়ে ওকে গুঁঠালাম—জিজ্ঞেস করো না সবাইকে।’

দুর্গাপ্রসন্ন বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঝড়েব ক্ষিপ্ত পদ্মায় এই বালক ডিঙিতে শুধু যদি অন্ত্রাণ্ডেব সঙ্গী হিসাবে যাইত, তবেই তাহা দুঃসাহসিকতাব চরম হইত। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, পদ্মাব মথিত জলরাশিব মধ্যে তাঁব বাজা লাফাইয়া পড়িয়াছিল, হিংস্র শ্রোত এবং ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম কবিতা আসিয়াছে, ভাবিতেই দুর্গাপ্রসন্ন বাবদ্বার শিহবিতা উঠিলেন। স্থলিত কণ্ঠে কহিলেন, ‘ঝড়েব মধ্যে তুই গাঙে নামলি?’

রাজা এইবার ঈষৎ উষ্ণ হইয়া কহিল, ‘বাঃ বে, আমবা তো পাডেব কাছেই নেমেছি। না নামলে খুকুটা যে ডুবে যেত তাব কি? ও ডুবলে বুঝি আব কারুর গায়ে লাগে না, না?’

বস্ত্ত, বাজাব এই কৌত্তিতে আমলা এবং পাইকেবা ভয়ে তটস্থ ছিল—পাছে ইহা কর্তাব কানে যায়। ঝড়ের কিছু উপশম হইলে জলমগ্নেব উদ্ধারার্থ ডিঙি লইয়া ইহারা যখন অগ্রসব হইয়াছিল, তখন রাজা কোন অদৃশ্য হইতে যে তাহাদের সঙ্গী হয়, কখনই বা অন্ত্রাণ্ডের সঙ্গে তীব্র



কাছাকাছি পদ্মাব জলে লাফাইয়া পড়িয়া বিপন্নদেব উদ্ধাবে ব্রতী হয়, পাইকেবা প্রথমে তাহা টেবই পায় নাই ; একটা ছোট্ট শিশুকে বুকে চাপিয়া শ্রান্ত অবসন্ন রাজা যখন পাড়ে আসিয়া উঠিল, তখন তাহাকে দেখিয়া কাচাবিব আপামব সাধাবণ প্রমাদ গণিয়াছিল ।

দুর্গাপ্রসন্ন কহিতে লাগিলেন, ‘অম্বিকাব কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই— অনায়াসে পাগ্লা-নদীব মধ্যে তোকে যেতে দিলে । কী যে আমি করবো এই মুখের দল নিয়ে । ওবে বাদব, তুই নিজেই যে ডুবতিস্ ।’

বাজা কহিল, ‘ঈস, আমি কিনা সঁাতাব জানি না—ডুববো । পদ্মাব ভাবি শাধা কি না । খুকিটাকে আমি না বাঁচালাম, ভগমান খুসি হয়ে আমাকে কি দেয় দেগে ।’

পদ্মার উপব দুর্গাপ্রসন্নেব আব অভিযোগ বহিল না । পদ্মা যেমন মাস্তুষকে হিংস্র-নির্দয় করে, তেমনি তাব অন্তবেব পরিধি বাড়াইয়া দেয়, শৌয্যে বুক ভবিয়া তোলে । পদ্মা এক হাতে গ্রাম ভাঙে, অন্ন হাতে নতুন মাটি শস্তে ভবিয়া উপহাব দেয়—সংহাবিণী মৃতি মাতৃ-মৃতিতে কপাস্তবিত হইয়া ওঠে ।

এতক্ষণ পবে দুর্গাপ্রসন্ন স্মিত হাসিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, ‘কি দেবেন ভগবান তোকে ?’

‘একটা হবিণ দিলেই ভাল হয়,’ বাজা চোখ মিটিমিটি কবিয়া ছুট্ট হাসিয়া কহিল ।

‘বেশ, দেবেন, তাই দেবেন । তোব জন্ম ছুইটা হবিণ এনেছি, রাজা । চক্রবর্তীব নৌকোয় আসচে, তু’ তিন দিনেব মধ্যেই এসে পড়বে দেখিস ।’

বাজা পবম পুলকেব সঙ্গে দন্তগুলি সমস্তই বিকশিত কৰিয়া ফেলিল । কহিল, ‘কেমন, দেখলে তো ভগমান আছেন কি না ।’

দুর্গাপ্রসন্ন হাসিয়া কহিলেন, ‘হ্যাঁ, দেখলাম ।’

## তিন

পূজা আসিয়া পড়িল। জমিদার-বাড়ির পূজার জগু সারাটা গ্রাম উৎসুক হইয়া থাকে, এবং আয়োজন তাব অল্পপাতেই কবিতো হয়। অষ্টমী পূজার দিন সমস্ত গ্রামেব নিমন্ত্রণ হয় জমিদার-বাড়িতে, তাছাড়া বাকি কয়দিন গ্রামেব অর্ধেক লোক নানা অজুহাতে এইখানেই দক্ষিণ হস্তেব ব্যাপাবগুলি সমাধা কবে। প্রায় প্রতি বাত্রেই কবিব লড়াই, কীর্ত্তন এবং বাউল সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে। বাউল এবং বৈষ্ণবেব জগু দুর্গাপ্রসঙ্গেব এক অদ্ভুত মমতা। তাঁব মনেব মধ্যে শাক্তেব সঙ্গে বৈষ্ণবেব এক আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছে।

কিন্তু পূজাব ঢাক বাজিয়া উঠিতেই পদ্মা সহসা মাৰ্ম্মভি ধাবণ করিল। গত মাসাধিককাল হইতে পদ্মাব ভাঙন বন্ধ ছিল, কে জানে দেবার্চনাব আয়োজন দেখিয়া পুলকিত হইয়া কি না, পদ্মা মাটি ভাঙিয়া অগ্রসর হইবাব বাসনায তর্জ্জন আবন্ত কবিল। ক্ষুব্ধাব জনাশ্রাত পাডেব মাটিতে অবিশ্রাম আঘাত কবিতো লাগিল, যেন এক অদৃশ্য তববাবিব আঘাতে স্কন্ধটিন মাটি শস্তেব মত গড়াইয়া পড়িল—পঙ্কিল নদীশ্রাত এবং শ্রামল ধবিত্রীতে সংগ্রাম বাধিয়া গেল। সারাদিন নুপ্পানুপ্প কবিয়া চড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। কীর্ত্তিনাশাব প্রচণ্ড ক্ষুব্ধাব যেন তৃপ্তি নাই, একখণ্ড মাটি গ্রাস কবিয়া ক্ষণকাল সে তৃষ্ণাভাব ধাবণ কবে, তাবপব পুনবায় বদ্ধিত বৃক্ষক্ষয় দাঁত বাহিব কবিয়া মাটি গিলিতে আসে। মাটিব উপব আব নির্ভবতাবোধ থাকে না, সে যে কত ভঙ্গুব, পদ্মাব এই বিক্রমেব নিকট তাহা স্বপ্পষ্ট হইয়া ওঠে।

হেমাস্কিনী গত কয়দিন ভালই ছিলেন। স্বামীব সান্নিধ্যে মনে জোব পাইয়া তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। পদ্মাব এই ভাঙন শুক হওয়া মাত্র এক মুহূর্ত্তে তাঁহাব সমস্ত আতঙ্ক ফিবিয়া আসিল। চোখেব দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বব দেখিতে দেখিতে পূর্বেব মতো অস্বাভাবিক হইয়া

উঠিল, দুর্বল স্নায়ুগুণী ভাঙিয়া পড়িল। হেমান্নিনী প্রায় বিকাবগ্রস্তা হইয়া উঠিলেন।

কল্যা হৈমন্তী পূজায় আসিতে পূর্বে, এমন একটা আশা তিনি পোষণ করিতেছিলেন। গত কল্যা হৈমন্তীও চিঠি আসিয়া পৌঁছে। সে লিখিয়াছে, তাহাদেব এইবার আসা হইবে না, মুসৌবী পাহাড়ে চাওয়া বদলাইতে যাওয়া ঠিক হইয়াছে। বিশেষ পদ্মা যখন এমন ভাঙিতেছে, তখন উনি কিছুতেই ঘাইতে দিতে চান না—ইত্যাদি। দুপূর্বে এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীও কিছু আলোচনা হইয়াছিল, এবং বৈকাল হইতে হেমান্নিনী সহসা প্রলাপ বকা আবস্ত করিলেন।

‘শুনচো, ওগো শুনচো? একবার নিচে তাকিয়া দেখ তো, পদ্মা কতটা এগিয়ে এসেছে? মস্ত বড় একটা পাড় ভেঙে পড়ল না? অ্যা, জানালায় তলায় এসে পড়েছে নাকি?—স্রোতের শব্দ আমি যে কানের কাছে শুনতে পাচ্ছি—কী সর্বনাশ!—ওগো, আমাদের কি হবে।’

‘পদ্মা এখনও ঢেব দূবে—শুধু শুধু কেন ভয় পাচ্ছ।’ শিয়নের কাছ হইতে দুর্গাপ্রসন্ন আশ্বাস দিয়া কহিলেন।

‘না, না, আব দূব কোথায়? বোজ, বাহ্নিদিন, প্রতিক্ষণ বাফুসী যে হাঁ কবে ছুটে আসছে।—ঐ তো, ঐ তো, শোন।’

‘এগিয়ে আসা কি সোজা কথা।—দুমাসের আগে পদ্মা কাছই এগুতে পাবে না।—একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর, হেম। পদ্মাকে মিচিমিচি ভয় কবে তুমি শবীর নষ্ট করচো—ছি।’

হেমান্নিনী সহসা বিছানাতে সোজা হইয়া বসিলেন; অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিয়া কহিয়া উঠিলেন, ‘আমি দেখব—পদ্মাকে দেখব। দেখি বাফুসী কতটা এগিয়ে এসেছে, কত বড় জিব বেব কবে’ আসছে—ওব ভয়ে হৈম যে আসতে পাবে না, দেখচো না?’

দুর্গাপ্রসন্ন তাহাকে তাড়াতাড়ি ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। বুঝিলেন;

আর দেরি করা চলিবে না, অবিলম্বে এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এখানে হেমাদ্রিনী আর একটুও নিরাপদ নয়, পদ্মাব জন্ত এক অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয় তাহার মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, কোনও আশ্বাসই তাহাব কাছে ফলপ্রদ হইবে না। পদ্মার নিকট হইতে তাকে বহুদূরে গবান দরকার।

কিন্তু পূজাব চারদিন না কাটাইয়া কোনও প্রকাবেই যাওয়া সম্ভবপব নয়। আজ অধিবাস; ইহার পব তিনদিন পূজা হইয়া চতুর্থ দিনে বিসর্জন হইবে। পূজার বিবাট এবং দায়িত্ব-বহুল আয়োজনের মধ্যে অকস্মাৎ দুর্গাপ্রসন্নের চলিয়া যাওয়া কিছুতেই চলে না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, দশমীর পরের দিন সপরিবাবে কলিকাতা যাত্রা করিবেন,—এবং সেখানে যাইয়া জীব যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। স্নায়ু-বিকৃতি ছাড়া রোগ আব কিছু নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কিন্তু এই স্নায়ু-বিকৃতি যে কত গুরুতর হইতে পারে তাহা দুর্গাপ্রসন্নের পক্ষে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সহজ নয়।

এই কয়দিন শ্রীমান বজ্রতপ্তসন্ন ওবফে বাজার একটুমাত্র ফুরসৎ নাই। দুর্গামণ্ডপ ছাড়িয়া একদণ্ডও সে কোথাও নড়ে না। দুর্গাপ্রতিমা তাহার কাছে প্রতীক-মাত্র নয়—ইহা প্রকৃতই ভগবতীব জন্ম-পরিগ্রহ। তাই অবাক্ বিষয়ে এবং স্মরণীয় সঙ্ঘের সহিত অনন্তমনা হইয়া সে দেখিতে থাকে কেমন কবিয়া বিশ্বের জননী আদিশক্তি দশভুজা মৃৎ-শিল্পীর হস্তে একটু একটু কবিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মূর্ত্তি সৃষ্টি বাজাব নিকট জগত-সৃষ্টিব মতই বিষ্ময়কর।

মূর্ত্তিতে মাটি দিবাৰ সময় যদিই বা তার নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান ছিল, এখন আব তাও নাই। রং দেওয়া সমাপ্ত হইয়া আজ বাংতা সাজান হইতেছে, দুর্গামার এই সব অপরিমিত বৈভব দেখিয়া রাজা গভীরভাবে

আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়াছে। মুগ্ধ হইয়া প্রতিমার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দুই চোখ তাব জলে ভবিয়া উঠে।

কিন্তু এখনও সবার চেয়ে বড় বিষয় বাকি ছিল। প্রতিমাব চোখ আঁকিবাব পব পুৰোহিত মন্ত্র দ্বাবা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কবিলে তবেই নাকি মাটির মূর্তিতে দেবীশক্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়। কি কবিয়া এমন বিশ্বাসকর পবিস্বৰ্জন ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ কবিবাব জগৎ বাজাব ঔৎসুক্যেব আব সীমা নাই। কুমোবেবা ইচ্ছা কবিযাই যে চক্ষু আঁকিতে এমন বিলম্ব কবিতেছে, তাহাতে বাজাব আব সন্দেহমাত্র বহিল না। আশঙ্কা হইতে লাগিল—‘আজ্ঞা, এখন যদি কুমোবেবা রাগ কবে চোখ না এঁকেই চলে যায়, তবে উপায়?’ এক জায়গায় জডো হইয়া ওবা ফিস্ফাস্ কবিয়া কি কহিতেছে? ঘোঁট পাকাইতেছে না তো? পুৰোহিত অনন্ত চক্রবর্তী ব ব্যবহাবটাও তাব কাছে বম নিম্ননীয় মনে হইল না। কুমোবদের তাডা দিয়া চক্ষু বসাইয়া লওয়া দূরেব কথা, চণ্ডীমণ্ডপের কাঠেব খুঁটার ঠেস্ দিয়া সে এমনি নির্লিপ্ত আনন্দেব সহিত ছঁকা টানিতেছে যে, স্পষ্ট বুঝিতে পাব। গেল, পূজা পাব হইয়া গেলও সে কাহাকেও তাডা দিবে না।

বাজা অধৈর্য্য হইয়া আগাইয়া দিয়া কহিল—‘কখন পূজো আবস্ত হবে, সাকুবমশায়?’

অনন্ত চক্রবর্তী ধূম উদ্গীৰণ কবিতে কবিতে তাকাইয়া বাজাকে দেখিতে পাইয়া দাডিব মধ্য হইতে হাসিটাকে বাহিবে আনিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। কিন্তু স্নেহস্ববে কহিলেন, ‘হইব, বাবা, হইব, অক্ষণি হইব—ভিতব থেইক। কিছু পান আনাইয়া দিতে পার? ও মোক্ষদা, ভিতবে যাও নাকি?—গোটা কয়েক পান বানাইয়া দিয়া যাইও। পুণ্য হইব, বুঝলা?’

মোক্ষদা ঝি অন্তঃপুবেব দিকে যাইতেছিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ‘দুই

নে, ঠাকুবমশায়, হাতটা অবসব হইলেই দিয়া যামুনে।—যা কাম পডছে, চউখে মুখে পথ দেখি না। সময় পাইলেই দিয়া যামুনে—’

‘বেশ, বেশ, একটু তডাতডি কইবো, আবাব পূজায় বসতে হইব কিনা। ওবেও হীক, যাতো বাবা একবাব বাড়িতে, আফিমেব কোটোটা চাইয়া নিয়া আয় তো—অমাব শিষবেব পাশেই আছে। মোতাত চড়াইয়া বসি—কি বলস্ নাপ্তেব পো? একবাব পূজোয় বইলে বাত কত হয়, কে জানে।’

নাপ্তেব-পো বসিক প্রামাণিক চক্রবর্তী মশায়েব কলিকাব প্রত্যাশায় বসিয়াছিল, সায দিয়া কহিল, ‘আইজ্ঞা, ঠিকই কইছেন, ওয়ুধ-বিষুধে নি অবইজ্ঞা দেখায়। তাইলে ছাহেব তাগদ থাকব ক্যামতে?’

‘শুনলি হীক—যা বল্লাম, কানে গেল তো?’ বলি গল্পটা তো ফুবাইয়া যাইব না, এইদিকে কত বাত হইল তাব থ্যাল আছে?—যত অবাধ্য হয় আইজ্ঞকাইলকাব পোলাপান।—তা বাজাবাব, ভয় কি, পূজো শীগগিবই আবন্ত কইবা দিমু। পাববা, জাগতে পাববা—চটপইটা ছেইলা আছ—ও কুমাবেবা, তামুক-টামুক যা খাওনেব এই বেলা সাইবা লও, চক্ষুদানেব বং গুলতে লাগব। প্যাটট! আবাব মোচড দিয়া উঠল য্যান—এই সঙ্ক্যাবেলায় আবাব স্নান কবাইব নাকি?’

রাজাব ইচ্ছা হইতেছিল অনন্ত চক্রবর্তীৰ সুদীর্ঘ শিখাটাব ডগা ধবিয়া হিড্ হিড্ কবিয়া ভূগামগুপে টানিয়া লইয়া গিয়া বর্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত কবে, কিন্তু সে কল্পনাটা বেশিক্ষণ থাকিল না। দূবে দেখা গেল, জগবন্ধু ঢুলি তাব বিবাট ঢাকটা কাঁধে ফেলিয়া কুঁজো হইয়া আঙ্গিনার একপ্রান্তে আবিভূত হইয়াছে। বাজাও আব বিলম্ব হইল না, ছুটিতে ছুটিতে সে জগবন্ধুর নিকটে উপস্থিত হইল।

জগবন্ধুব ঐক্যাতন বাদনেব একমাত্র সঙ্গীস্বরূপ সঙ্গ অনিয়াছে তাব একমাত্র পুত্র কেবলবামকে। রুগ্ন দুর্বল ছেলেটা, এক এক কবিয়া

পাজবাগুলি গোণা যায়, এমনি বোণা। তাহাব উপব তাব চোখে-মুখে এমনিই হতভম্ব বিষয় এবং নিবিড় আশঙ্কাব ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ওকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিব, ন' সহানুভূতি কবিব, স্থিব কবিতে একটু সময় লাগে। কাঁসিটা হাতে কবিয়া বাপেব পিছনে পিছনে সে এমনি শঙ্কিতভাবে অগ্রসব হইতে লাগিল যে মনে হইল ভয়ে হৃৎপিণ্ডেব কার্য্য বন্ধ হইয়া যে কোন মূহুর্ত্তে সে পবলোকে প্রস্থান কবিতে পাবে— জমিদাব-বাড়িতে সঙ্গ কবিতে আসা তাব পক্ষে এমনি দুঃসাহসিক ব্যাপাব।

লাল সালুতে আচ্ছাদিত ঢাকটা জগবন্ধু অপূর্ব্ব মমতাব সঙ্গে দুর্গা-মণ্ডপেব নিচে একপ্রান্তে নামাইয়া বাখিল। জগবন্ধু জমিদাব-বাড়ি বাদা ঢাকি। একটামাত্র ঢাকেব ঞ্কে সে এক-বাড়ি লোকের কানে তাল। লাগাইয়া দিতে পাবে। কোবা ধুতির উপব শাদা কতুয়াটা সগর্বে গায়ে দিয়া লাল গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়াছে। সাবা বৎসব ধবিয়া এই দিনগুলিব সে স্বপ্ন দেখে, এবং অল্প কয়টি দিনে সগৌববে নিজেব সমস্ত কৃতিত্বেব পবিচয় দিয়া ছাড়ে। পূর্বে কাঁসি পিটাইবাব জন্ম লোক ভাড়া কবিয়া আনিতে হইত, এ-বৎসব পুত্র কেবলবামকে বহুপ্রযত্নে শিক্ষা দিয়া সেই তুচ্ছ কাব্য সম্পাদনেব জন্ম সঙ্গে আনিয়াছে।

‘ও কে, জগবন্ধু?’ বাজা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল।

জগবন্ধু গর্বেব সঙ্গে কহিল, ‘ও আমাব কোকা, ক্যাবলবাম। ঢাকেব সঙ্গে ওই এইবাব কাঁসি বাজাইব, দেইখেন নে, কঠা।’

‘ও পাববে?’

‘তা আব পাবব না, ছোটবাবু, অবে আমি নিজ হাতে শিখাইছি না।’ জগবন্ধু মণ্ডল চউখ বুজলে অবই তে। কঠাবাড়িব বামকন্ম দেখতে লাগব—সময় থাকতে না শিখলে চলবো ক্যামতে—’

বাজা একজন আশঙ্কিত সমজদাবের মত গম্ভীর হইয়া কহিল, 'ও পারলে হয়।—এই শুনচিস, বাজাতো দেখি, কি বকম বাজাতে পারিস।'

এক মিনিটও বিলম্ব হইল না—চকিতে কঁাসিটা বা-হাত দিয়া উদ্বে তুলিয়া ডান হাতেব কাঠিসহযোগে কেবলবাম ঢং ঢং ঢং করিয়া বাজনা শুরু করিয়া দিল। ছুই চোখ কপালে উঠিয়াছে, ঠোট কাঁপিতেছে, ঢোক গিলিতে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু হাত থামিতেছে না। অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সে কঁাসিটা পিটাইয়াই চলিল।

সহসা কঁাসিতে ঢং শব্দ কবিবাব পবিবর্ত্তে কেবলবাম নিজেই 'ভ্যা' করিয়া উঠিল। তখন দেখা গেল, পিছন হইতে সবকাব-মশায় আসিয়া কখন তার একটি কান সজোবে চাপিয়া ধরিয়াছেন।

'লক্ষ্মীছাড়া, ঢং ঢং কবে থালা থাবড়িয়ে বাড়ি মাথায তুলেছ। কত্ৰীমাব দারুণ ব্যামো, ছটফট কবে মবছেন, মাথাটি বালিশ থেকে ঠাাতে পাবছেন না—তাব কি একটু হুঁস আছে। এ-বান্দর এসেছে কোথা থেকে? থাল পিটুচ্ছেন। পিটুবি আব?' কানে আর একটা জোর মোচড দিয়া ছাডিয়া দিয়া সরকাব-মশায় দাঁত কিডমিড করিতে লাগিলেন।

কেবলরাম ভয়ে মুচ্ছা যায় আব কি। ভ্যা-শব্দটুকু আব গলা হইতে বাহিব হইল না, শুধু বলিব পাঠাব মত সে ঠক ঠক কবিয়া কাঁপিতে লাগিল।

জগবন্ধু বিনীতকণ্ঠে কহিল, 'পেন্নাম হই, সবকাব মশয়। আইজ্ঞা, কত্ৰীমাব ব্যামোব কথাটা একটুনি জানি, জান্'ল অবেনি আমি বাজাইতে দেই। ঈস, বড় অগ্রায় হইয়া গেছে—ছি ছি। পোলাপান মাল্লয়, এই বাবটা মাফ কবেন।'

'হ্যাঃ, মাফ কববে।' অধিকা আশ্ফালন কবিয়া ভেংচাইয়া কহিল,



‘মাফেব তো আর মা-বাপ নেই, মাফ করলেই হোল। দেখতো—একটু কি মগজে বুদ্ধি আছে—ঢং ঢং কবে এমনটা থালা পিটোলে ভালমানুষেবই মাথাব বগ ছিঁড়ে আসে—বলি, তোবা পেয়েচিস কি, বল দেখি ? ওরে ছোটলোক ব্যাটাবা, অস্থখ যদি এখন বেড়ে ওঠে ? আমি তো মাফ কবলুম, কিন্তু তখন ? বুড়োখাভী, বলি তোবই আক্কেলটা কি শুনি ? এই ঝাঁদবটাকে—ঈস্, একবার কাণ্ডখানা দেখতো—ওবে হতভাগা—’

বাজা আগাইয়া আসিয়া অধিকাচরণেব নিকটবর্তী হইল। মুখটা উর্দ্ধে উঠাইয়া কহিল—‘ওব দোষ কি সবকাব-মশায়, আমিই তো বলেছিলাম ওকে বাজাতে, তাইতো ও বাজিয়েছে—ও কি নিজে বাজিয়েছে ? তবে ওকে মাববেন কেন ?’

জগবন্ধু কহিল, ‘তবে ঝাঞ্জন তো ছোটবাবু, ও কি আব নিজে বাজাইছে—আপনে কওনে তো—’

অধিকাচরণ গলাব পর্দা শেষ মাত্রায় উঠাইয়া চিংকাব কবিয়া কহিলেন, ‘ছোটবাবুব কথায় তবে তুমি ঘবেব চালে আগুন লাগিয়ে দাও—বামুনের হুকোতে গিয়ে টান লাগাও। ব্যাটা গণ্ড-মুখু, বলতে একটু লজ্জা হলো না।—নইলে আব বলে ছোটলোক।—দেখ, এই আমি সাবধান কবে দিলাম, —একটা ঢোলেব চাটি আমি শুনেচি, কি আব বক্ষা নেই, ঘাড় ধবে আমি বাড়িব বাইবে বেব কবে না দিই তো আমাব নাম—। কর্তাব হুকুম, ঢোল কবতাল, বাড়িব ত্রিসীমানায় ঢুকতে পাববে না—বাস্।’

অধিকা কর্তীর বাপেব বাড়ি পশ্চিমবঙ্গেব লোক। তাব দাপট প্রচণ্ড।

বাজা ঠোট ঝাঁকাইয়া অবজ্ঞাব সঙ্গে এই বীবোক্তি-সকল শুনিতেছিল। কহিল—‘পূজোব সময় বাজাবে না বুঝি ? বাজাবে, বেশ করবে ! তুমি খুব বাজিও, জগবন্ধু—বাবাকে আমি বলব’খন, বুঝলে।—কাদিস্

না বে, কেবলরাম, তোকে আমি একটা লাটু দেব, দেখিস্। বুড়োধাড়ী এসে ছোটছেলেকে মাবে, লজ্জা কবে না। নিজেকে মারলে তখন কেমন লাগে। বাবা যদি শোনে তখন দেখিস।’

শেষেব সম্ভাবনাটায় অশ্বিকাচরণ সহসা দমিয়া গেল। কহিল—  
‘মাবলাম। কই, মাবলাম আবাব কখন? বাড়িতে কত্ৰীমার সাজ্যাতিক ব্যামো, শাসন কবে দিয়ে গেলাম, তাতেই মাবা হলো!—শুনচো, ছোট-বাবু, বাইরে এমনটা দাঁড়িয়ে থেকো না, চালের তলায় যাও—কথাব অবাদ্য হয়ো না। এই কার্তিক মাসেব বাতে হিম লাগিয়ে একটা অস্থখ-বিস্থ কবে বস, আর আমাদের ছুটাছুটি কবতে কবতে জান্ বেবিযে আশুক—’

বাজা অশ্বিকাচরণেব উপব আশুবিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। একে তো সে তার এত লোভেব ঢাকেব বাগ্ধ বন্ধ কবিবাব উপক্রম কবিয়াছে, তাব উপব এমন কবিয়া আসিয়া কেবলবামেব কান মলিয়া দিল। অপ্রতিভ ভীতু ছেলেটাব চেহাবা দেখিয়া যেমন বাজাব হাসি আসিতে চায়, তেমনি দুঃখও হয়, তাব কথাতেই তো বোকা ছেলেটা এমন করিয়া একঘেয়ে কঁাসি পিটাইয়া নিজেব কৃতিত্বেব পবিচয় দিতে গিয়াছিল।

অশ্বিকাচরণেব উপদোশ সে বাগিয়া কহিল, ‘বেশ কববো, একশো বাব বাইবে দাঁড়িয়ে থাকব—আমাব যা ইচ্ছা কবব। আমি বড় হলে না, কেবলবাম, তুই কেবলই আমাব কাছে কঁাসি বাজাবি, আব আমি কেবলই কঁাসিব বাজনা শুনব, ভাল ক’বে কঁাসি-পেটানোটা শিখে বাখিস।’—বলিয়া বাজা বাবেব ভঙ্গিতে হাত দুইটা বুকেব উপব দিয়া আডাআডি ভাবে গইয়া বগলে চাপিল। ভাবটা এই যে, সবকাব-মশায় তো দুবেব কথা, জগতেব কাউকেই সে ভ্রক্ষেপ কবে না।

যাইবাব পথে অশ্বিকা পুৰোহিত অনন্ত চক্রবর্তীব নিকট জানাইল—  
‘বড় দুবস্ত ছেলে, কথাবার্তা যদি একটু শোনে!’

চক্রবর্তী কহিলেন—‘পোলাপানেব কথা গায়ে মাথ ক্যান। তাব উপুৰ বাঘেব বাচ্চা—শুনচ, মোক্ষদা, পানগুলি তো অখনও পাইলাম না। ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়া কি সগুণে যাওন যায়—হ্যাঁ, কি কহিতে আছিলাম, বাঘেব বাচ্চা;—সবটা টাইনা শ্রাঘ কবিস না, নাপিতেব-পো, একটু বাখিস,—বুড়া বয়সে শ্ববীর গৰম বাথতে—ও বাজাবাবু, শোন তো বাবা, শুইনা যাও—ও কাবিগবেবা—’

৪

বাজা কহিল, ‘এই কেবলবাম, শুনচিস।’

কেবল কহিল, ‘আইজা, কর্তা।’

‘শুধু শুধু কি কেউ কাঁসি বাজায়, বোকাবাম—টাকেব সঙ্গে বাজাতে হয়। তোব নামটা কে বেখেছে বে, হি হি হি—। বাতাসা খাবি? বাড়িব ভেতব যখন যাব, পকেট ভবে’ নিয়ে আসব। তখন তোকে দেবো অখন, বুঝলি?’

কেবলবাম কেবল কহিল—‘আইজা।’

## চার

শহর হইতে বড় ডাক্তার পাঠাইবাব জন্ম দুর্গাপ্রসন্ন ঢাকায় আত্মীয়-দেব নিকট জরুবি তাব পাঠাইবাছেন। প্রতুল ডাক্তার তাব যথাসাধ্য কবিতেকে গন্ধেই নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত বোগিণীব পীড়াব উপশম হওয়া দূবে থাকুক, প্রতিদিনই আবও বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ প্রভাত হইতেই বিকাল শুরু হইয়াছে, বেলা বাড়িবাব সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতাও বাড়িয়া চলিল। বোগিণী এত অজস্র প্রলাপ বকিতে লাগিলেন যে, আশঙ্কায় দুর্গাপ্রসন্ন তটস্থ হইয়া উঠিলেন। ক্ষণে ক্ষণে হেমঙ্গিনী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিতে চান, পদ্মাব পাড়-ভাঙাব শব্দ শুনিবার জন্ম উৎকর্ষ হইয়া

অপেক্ষা করেন এবং সে-শব্দ শুনিতে পাইলে ভয়ে চিৎকার কবিয়া উঠিয়া ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যার পর অবস্থা ভাবি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। প্রতুল ডাক্তারকে দেখিয়া হেমাজিনী আবণ্ড ক্ষেপিয়া গেলেন। কহিলেন—  
‘কি চাই আপনার? কি চাই এখানে? পদ্মাকে আটকাতে পারেন? স্রোতের মুখ ঘূবাতে পাবেন? যদি নাই পাবেন, কে চায় আপনাকে? কে চায়?’

‘হাতটা একটু দেখি, মা—নাড়িটা দেখব’, প্রতুল ডাক্তার মুহূর্তে কহিলেন।

‘নদী যে ছুটে আসচে, নাড়ি দেখে হবে কি? ভেঙে যাবে যে সব, বাড়ি-ঘর, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-সংসার, সব যে চুবমার হয়ে যাবে, তাব কি?’

‘কিছু নয়, কিছু নয় মা। ও শুধু মনেন ভয়।’ বুদ্ধ ডাক্তার আশ্বাস দিয়া কহিলেন।

এমন সময় অদূরবর্তী পদ্মায় আবার পাড় ভাঙিয়া পড়াব শব্দ হইল। শুনিয়া হেমাজিনী চিৎকার কবিয়া উঠিলেন—‘ঐ নিল, নিল সে, সব নিল! আমার বাজা কই?—অ্যা, আমার বাজা কই? শুনলে না তোমরা তার চিৎকার। ওবে কে আছিস, ছুটে যা। বাফুসী তাকে নিলে রে, নিলে—’

দুর্গাপ্রসন্ন আগাইয়া আসিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—‘এ কি বলছ, বাজাব আবার কি হবে, কিছু হয় নাই। দুর্গামণ্ডপে বসে সে প্রতিমা দেখচে। ওব জন্ত মিছিমিছি ভয় পাচ্চ কেন।’

‘মিছে কথা বলছ তোমরা—আমাকে ভোলাচ্চ। আমি স্পষ্ট শুনলাম তার গলা—‘মা’ ‘মা’ বলে চিৎকার কবে সে জলের মধ্যে ডুবে গেল—পদ্মা তাকে—’

‘এই তাকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি, নিজেব চোখে দেখ ।—যা তো অতসীর মা, বাজাবাবুকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আয় তো—ইন্দিব-দিদিব কাছে পাখাটা দে ।’ দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন ।

অতসীর মা হেমাদ্বিনী শিয়রে বসিয়া পাখা কবিতেনি, দুর্গাপ্রসন্নের দৃশ্যসম্পর্কীয়া বিধবা বোন ইন্দিব ঠাকুরবাণীব হাতে পাখা দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল ।

বাজা মহাউৎসাহ সহকায়ে আরতিব উত্তোগ দেখিতেছিল । মা’ব শরীর বেশি খাবাপ না হইলে আজও একটু ঢাক বাজাইতে পাবিবে—এ আশ্বাস সে বাবাব কাছ হইতে আদায় কবিয়া লইয়াছে । তাই গভীর আনন্দবিক্রম সঙ্গে প্রতিমার কাছে সে মনে মনে প্রার্থনা কবিতেনি লাগিল—মাকে অল্পখ দিয়ে আব কি লাভ পাচ্ছ, দুর্গা-মা, নিজেই জগবন্ধুব এমন বাজনাটা শুনতে পাচ্ছ না । মাকেও তুমি ভাল ক’বে দাও, বাজনাও শোন । আজিই তো শেষ দিন । কেবলরাম কেমন দুলে দুলে কাঁসি বাজাবে, দেখো । এমন তোমাব হাসি পাবে—

‘বাজাবাবু, বাজাবাবু, হনচ নি—’

বাজা ফিবিয়া দেখিল অতসীর মা হস্তদস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে । বলিল—‘কিবে বুড়ি, কি চাস ? এখন খেতে-টেতে পাবব না, আগেই বলে দিচ্ছি । দেখচিস, এইবার আরতি শুরু হবে । মণ্ডাই দিস আর পাতক্ষীরই দিস, আমি কিছুতেই যাব না ।’

অতসীর মা ক্লান্ত অশ্রুব মতো সশব্দ নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে কহিতে লাগিল—‘কর্তাবাবু তোমাবে লৌড়াইয়া যাইতে কইচে, ছুইটা আহ ।—হনচ নি, ও ছোটবাবু—’

‘দেখ—ছুইটা আহ ।—আর ইদিকে আরতি শুরু হয়ে যাক । দেখ্

অতসীর মা, ও সব চালাকি চলবে না। বাবার নাম করে মিছিমিছি খেতে ডেকে নিতে চাও, না ?’

‘কও কি তুমি, ছোটবাবু! ইদিকে মা ঠাইবাণেব যে শ্বাস উঠচে, তার কি।’

বাজা নির্লিপ্তেব মত কহিল—‘নিশ্বাস উঠবে না তো কি হবে যাবে না কি-রে বুড়ি। ফাঁকি দিয়ে ভেতবে নিতে চাস্, না? আমি আর বুঝি চালাকি বুঝি না?’

নিরুপায় অতসীর মা ব্যাপারটাব গুরুত্ব বুঝাইবার অল্প উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সহসা দুর্গামণ্ডপের মেঝের উপরে মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কহিল—‘কিরা, ছোটবাবু, কিরা। ছুইটা যাও,—মা ঠাইবাণের শবীল বড খরাপ লাগতে লাগছে।’

শরীর খাবাপ লাগিবার কথাটায় বাজার সহসা বড আতঙ্ক হইল। কহিল—‘দূর, তা নয়। এক্ষণি ভাল হয়ে যাবে, দেখিস। শবীল খরাপ হলে কিছু হয় না। যারা ভগমানকে ডাকে, তারা কক্ষণে মরে না, জানিস্। দুগ্গা মাকে আব আমি বুঝি বলিনি, মাকে ভাল করে দাঁও—’ বলিতে বলিতে বাজা অন্দবেব দিকে ছুটিতে আবস্ত কবিল। তাব বড ভয় হইল। পূজাব উৎসবের হৈ-চৈ-এতে মার কাছে বড একটা ঘাইতে পারে নাই—এই কথাটা মনে পড়িয়া নিজেকে ভারি অপবাদী মনে হইল। অসুখ করিয়াই তো মানুষ হবে; মাও যদি মরিয়া যায়। ‘ধ্যৎ, ভগমানকে ডাকলে বুঝি আবার কেউ মরে! দুগ্গা-মা, মা যেন মরে না, একদিনও যেন মরে না, এক মিনিটের মধ্যে যেন ভাল হয়ে ওঠে—’ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাজা দুর্গা-মার উদ্দেশে বারম্বার প্রণাম জানাইতে লাগিল।

রাজাকে দেখিয়া প্রথমটায় যেন হেমাজিনীর বিশ্বাসই হইল না। কতক্ষণ এমনি করিয়া রাজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন যে, রাজা পর্যন্ত

খতমত খাইয়া গেল। ঘরেব এতগুলি লোকই বা তার দিকে এমন হাঁ কবিয়া তাকাইয়া আছে কেন। বেশ তো!

দুর্গাপ্রসন্ন গম্ভীর স্ববে কহিলেন—‘রাজা, মার কাছে গিয়ে বস।’

সহসা হেমাদ্বিনী কাদিয়া উঠিলেন—‘আয় রাজা, আয়, আমার কাছে আয়। একটু বস আমার পাশে। যদি ফেলে যেতে হয়—চিব-দিনেব জন্ম যদি ফেলে যেতে হয়—’

বাজা অগ্রসব হইয়া মাব কাছে বসিয়া পড়িল। মায়ের একটা হাত নিজের হাতে উঠাইয়া লইয়া কহিল—‘দেখো, এখন আর তোমাব একটু অস্থখও থাকবে না। দুর্গা-মাব কাছে আমি খুব কবে’ বলে’ এসেচি; দেখতে দেখতে তুমি ভাল হয়ে যাবে। শুয়েও থাকতে হবে না, জান্না দিয়ে কালকেব দশমীব তামাসাটাও দেখতে পাবে—কত আমি বাজি কিনেচি, দেখো। দুর্গা-মাই তো অস্থখ দেয়, আবাব অস্থখ ভালোও করে দেয়—সব মস্ত্রে হয় কিনা—’

‘বাজা, পদ্মা আসচে দেখচিস, হাঁ কবে’ ছুটে আসছে?—’ হেমাদ্বিনী যেন এই ক্ষুদ্র বালকেব কাছে আশ্বাস পাইতে চান্—তার বীর পুত্র বাহুবলে পদ্মাকে পবাত্ত কক্ক, এমনই যেন কিছু একটা আশা কবেন।

‘কই আসচে?’ বাজা জানালাব দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল।

‘দেখচিস না, কেমন মাটি ভেঙে এগিয়ে আসচে। আমাদের ভুবিয় দেবে, সব ভুবিয় দেবে, ভাসিয়ে দেবে।’

‘ধ্যোং, আমাদের বুঝি আর নৌকো নেই। কি কবে ডোবাবে। তুমি কিছুই জান না—হি হি—ডোবাক্ না দেখি কেমন পারে—হি হি। বাবার বজ্রা তো ঘাটেই বাঁধা আছে। এখান থেকে তুমি বুঝি কিছুই দেখতে পাও না।’—রাজা বিজ্ঞের মত কহিল।

‘রাজা?’

‘কিঃ?’

‘পদ্মা যদি আমায় ডুবিয়ে দেয়, মাকে কি তোব মনে থাকবে, বাজা ? একেবারে ভুলে যাবি নে তো ?’

‘বাঃ বে, তোমাকে আমি ডুবতে দেব কেন। আমি বৃষ্টি কম সাতাব জানি। সেদিন খুকিটাকে বাঁচালাম না বৃষ্টি। তুমি এমন ডবাও—হি হি হি—ডুবিয়ে দেবে। ধ্যেং—। কিচ্ছু ভয় নেই মা—এক ঘুঘি দিয়ে দেব পদ্মাকে ?’ বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পদ্মাব উদ্দেশে একটা ঘুঘি ছুঁড়িয়া রাজা মাকে আশ্বস্ত কবিল, এবং পুনরায় মায়েব কাছে বসিয়া কহিল—‘জগবন্ধু ছেলেটা, জান মা, কি হলে হলেই যে কঁাসি পেটায়, হাসতে হাসতে পেটেব নাড়িভুঁড়ি বেবিয়ে আসে—হি হি হি—ও একটা আশ্ব উজ্জ্বল। কিন্তু বড ভাল ছেলে—আমাকে ‘কর্তা’ ‘কর্তা’ বলে ডাকে। সবকার-মশায় শুধু শুধু সেদিন ওব—’

পা টিপিয়া প্রতুল ডাক্তাব ও দুর্গাপ্রসন্ন ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেলেন। প্রতুল ডাক্তাব সহর্ষমুখে কহিলেন, ‘এইবার উপযুক্ত ওষুধ আবিষ্কার কবা গেছে, চৌধুরিমশায়। বড চালাক ছেলে আপনার—এমন লাখে একটা মেলা ভাব। কি আগ্রহেব সঙ্গেই মা ওব গল্প শুনচেন, লক্ষ্য কবেচেন ? একটু অশ্রমনস্ক রাখতে পাবলেই যে চিকিৎসার বাবোআনি হয়—’

রাজা কহিতে লাগিল—‘তোমাব অশ্রুত বলেই তো ঢাকের বাজটা ইচ্ছেমত শোনা গেল না। জগবন্ধু তো বাজাতেই চায় ; কেমন কায়দা করে’ নেচে নেচে বাজায়। বড হলেই আমিও ঢাক বাজাতে শিখব। ভারি মজা লাগে, তাই না ? মনে হয়, যেন যাত্রাগানের যুদ্ধুটা হচ্ছে। সব তুমি মাটি কবে দিলে, মা। যাত্রাগান আব হলো না কেন, তোমার জন্তাই তো ! কী রকম সেবাব অর্জুন তীর ছুঁড়েছিল, না মা। অর্জুনের ধনুককে কি বলে জানো ? বলে, গাণ্ডীব—হি হি।—অশ্রুত কবলে তবেই



বুঝি ডালিম খায় ?—ধোং, না, না, অশ্বখের মানুষেবটা কি খেতে আছে !  
পুঞ্জোটা গেলে আমিও একবার অশ্বখ করবো ভাবচি। অনেক মিছুরি  
আর ডালিম দিতে হবে কিন্তু। অ ব আমি কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকতে  
পাবব না।’

বাজা তাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুল দিয়া হেমাঙ্গিনীর মাথা আঁচড়াইয়া দিতে  
লাগিল। অপূর্ব স্বথে এবং অপাব নির্ভবতায় হেমাঙ্গিনী নিদ্রিত হইলেন।  
তখন বাজা আব এক মুহূর্ত্তও দেবি কবিল না ; পা টিপিযা টিপিযা ঘব  
হইতে বাহিব হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দুর্গামণ্ডপেব দিকে ছুটিতে লাগিল।  
পঞ্চপ্রদীপেব সেই আবতিটা শেষ হইয়া গেলেই সব মাটি কবিয়াছে।

মধ্যবাত্রে হেমাঙ্গিনী সহসা নিদ্রা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।  
বিজ্ঞপ্তিত গলায় কহিলেন—‘কে আছ, ওগো, কে আছে এখানে ?  
আমি তুচোথে আব কিছুই দেখতে পাচ্চি নে—আমাব কেমন জানি  
কবচে।—’

দুর্গাপ্রসন্ন শিয়বেব কাছে একটা চেযাবে বসিয়া ছিলেন। বসিয়া  
থাকিতে থাকিতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ডাক শুনিয়া তিনি ধড়মড়িয়া  
জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন—‘কি হলো, কি হলো ?’

‘উঃ, আমাব নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে—আমাব কেমন জানি  
কবচে।—’

দুর্গাপ্রসন্ন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনীকেই  
ধবিবেন, না নিচেব দারোয়ানকে প্রতুল ডাক্তাবেব নিকট ছুটিয়া যাইতে  
বলিবেন, স্থিব কবিতে পারিলেন না।

‘জল, একটু জল।’

‘চৌবে। বাম চৌবে।—জল ? ই্যা, ই্যা, জল দিচ্চি—অধিকা,  
অধিকা—’

‘পদ্মা নিলে, আমাকে নিলে। তাব সঙ্গে আব আমি লড়তে পারিনে। উঃ, বড় ব্যথা।’

‘গোবর্দ্ধন, অধিকা, ইন্দিব দিদি, অতসীব মা—কিছু নয়, ও কিছু নয়, হেম।—জল ? এই আমি জল দিচ্ছি।’—দুর্গাপ্রসন্ন ভীত শিশুর মত কাঁপিতে লাগিলেন।

‘ওগো, তোমার পা দুটো কোথায় ? একবাব শেষ প্রণাম কবে যাই। কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি নে। আঃ, কি সুন্দর জল। আমার হাতটা তোমাব পায়ে ছুঁইয়ে দাও। আবাব দেখা হবে—সাবধান, পদ্মাকে সাবধান ! এ কি ! বড় ভাল লাগচে, খুব ভাল লাগচে, আঃ—’

কম্পিত কণ্ঠে দুর্গাপ্রসন্ন হেমাজিনীব কানেক কাছে উচ্চারণ কবিতে লাগিলেন—‘শিবান্তে সন্ত পছানঃ—শিবং শিবং শিবং—’

পরদিন দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পূর্বেই চৌধুরি-বাড়ির গৃহিণী বসর্জনে সমাপ্ত হইল।

## পাঁচ

পূর্বের ঘটনাবলীর স্মৃতি ধবিয়া কোটালভিটাব আমবাগানের নতুন জন্ম হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই জনহীন অবণ্য যে নতুন আকাব ধারণ করিল, তাহা আলাদোনেব আশ্চর্য্যপ্রদীপেবই উপযুক্ত। দুর্গাপ্রসন্ন তাঁর শোকবিদগ্ধ চিত্তকে এই নতুন খেলা দিয়া তুলাইয়া বাখিতে চেষ্টা করিলেন।

লৌহজ্জেলৈব পদ্ম সা’ দেড়া দামে কোটালভিটা বিক্রয় কবিয়া পরম

আত্মপ্রসাদ লাভ কবিল। দুর্গাপ্রসন্ন সেই আমবন কিনিয়া জ্বল কাটাইলেন, বাস্তা পাতিলেন, দীঘি পঙ্ক উদ্ধাব কবাইলেন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা কবিলেন, নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিলেন, এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু ও অপবিচিত্র, অনাহৃত এবং ববাহৃতদেব বিনামূল্যে জমিসত্ত্ব বিলাইয়া দিলেন। সমবায়-প্রণালীতে স্তম্ভব স্তম্ভব বাড়ি তৈরি হইল, সমবায় ভাণ্ডার সর্বসাধারণের চাহিদা মিটাইতে লাগিল, আত্মছায়াচ্ছন্ন পথেব পাশে আলোকস্তম্ভে প্রতিবাত্রে দীপ জ্বলিতে লাগিল, নলকূপেব পবিস্কৃত জল প্রতি গৃহে পৌঁছিল। নগর-পবিচালনার জগ্ন সমিতি গঠিত হইল। দুর্গাপ্রসন্ন কোটালভিটার নাম দিলেন কোটালনগর।

কোটালভিটার শুধুমাত্র ভদ্রলোকেরই ডাক পড়ে নাই। একাধিক ঘর কুমোব আসিয়া চক্র ঘুরাইতে লাগিল, শাঁখাবিরা বাড়ি-পত্তন কবিয়া শশকে শঙ্খ ঘষিতে লাগিল; ছেলে-পল্লীতে বাহিবে শুকাইতে লাগিল কতই জাল এবং প্রতি গৃহে কতই কোলাহল জাগিল, তাঁতিদেব মাকুর শব্দে এবং কাঁসাবিদেব পিতল এবং কাঁসা পিটানোব ঘটায়ে একটা সম্পূর্ণ পাড়া মুখব হইয়া উঠিল। বন্দব হইতে কোটালনগরেব ঘাটে বহু মালবাহী নৌকা যাতায়াত শুরু কবিল, কাঁসাব বাসন, শাঁখা, তাঁতেব সূক্ষ ও মোটা কাপড় এবং বিস্তব গামছা রপ্তানী হইতে লাগিল। বহু বৎসরেব মৃত কোটালভিটা নবীন জন্মেব মধ্যে সর্গোববে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু দুর্গাপ্রসন্ন কিছুতেই তৃপ্ত হন না। যে-পদ্মা তাঁব গৃহ, তাঁব আনন্দময় সংসার ভাঙিয়া দিয়াছে, তাহাব উপব একটা মর্যাস্তিক আক্রোশ লইয়া তিনি কোটালভিটাকে স্তম্ভবতব কবিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। বাফসী পদ্মাব নির্দয় দৃষ্টেব একটা সমুচিত প্রত্যুত্তব তিনি এক অপূর্ণ সৃষ্টিব মধ্য দিয়া দিবেন।

কোটালনগরের মাঝখানে যে বিরাট দীঘি শৈবালদামে একেবারে আচ্ছন্ন ছিল, বহু অর্থব্যয়ে তিনি সেটাকে পবিত্রাব করাইলেন, তা'ব চতুর্দিকে বাগান তৈরি হইল,—সাধারণের বিশ্রামাগার, কৃত্রিম ঝর্ণনা, শিশুদেব জগ্ন দোলনা এবং ছেলেদের খেলাব সবুজ মাঠেব সৃষ্টি হইল। খালের পাড়ে বেড়াইবার জগ্ন দুর্গাপ্রসন্ন পাকা সড়ক তৈরি করিয়া দিলেন। এক সৃষ্টি-উন্মাদ ব্রহ্মার মত দুর্গাপ্রসন্ন প্রতিদিন নতুনতর সম্পদ সৃষ্টি কবিয়া চলিলেন।

খালপাড়ে সর্কসাধাবণের জগ্ন যে মিলনীগৃহ তৈরি হইতেছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছুতোব মিস্ত্রীবা বর্ত্তমানে কাঠেব কাজ লইয়া ব্যস্ত আছে,—করাতেব শব্দ এবং ব্যাদাব ঘস্ঘসানিতে দুর্গাপ্রসন্ন সঙ্গীতের স্বব শুনিতে লাগিলেন। মিলনীগৃহ কাঁচা ঘব নয়,—ইটের ইমাবেতব উপব কবগেটেড্ টিনেব ছাত দিয়া স্ববহুং বাড়ি তৈরি হইয়াছে। এমন একটি মিলনী'ব অভাব দুর্গাপ্রসন্ন বহুদিন যাবৎ অনুভব কবিতেছিলেন,—শুধুমাত্র অগ্নাগ্ন কাজ বেশি জরুবি ছিল বলিয়া এই বিলম্ব। এই মিলনীবাড়িব একপ্রান্তে থাকিবে রঙ্গমঞ্চ, দেওয়ালেব চারদিকে বই-ভবা আলমাবী, গৃহতলে নানা-প্রকার খেলাব সবজাম। পাশেব এক ক্ষুদ্র কাম্বায় পড়িবা'ব ব্যবস্থা থাকিবে। রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে শখেব অভিনয় হইবে, এবং অগ্নাগ্ন সময়ে বক্তৃতা'দির জগ্ন ইহা ব্যবহৃত হইবে। সন্ধ্যাবেলায় এই মিলনী-গৃহ আনন্দে কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিবে।

মেয়েদেব জগ্নও দুর্গাপ্রসন্ন বন্দোবস্ত করাইয়াছেন। ফলে দীঘিব পূব পাড়ের সার্কজনীন দেবমন্দিরের সমুখেব নাটমন্দিবে অন্তঃপু'বিকাদেব ভিড আব কখনও কমে না। মবালদীঘির স্ফটিকস্বচ্ছ জল তাহাদেব দ্রুতগামী জিহ্বাব প্রতিধ্বনি তুসিতে তুলিতে ক্লাস্ত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু দুর্গাপ্রসন্নের তবু তৃপ্তি হয় না। সর্কনাশী পদ্মা, তুই ভাবিয়া-

ছিল সব ডুবাইয়া শেষ করিয়া দিবি, দুর্গাপ্রসন্ন সর্ব্বশ্ব হাবাইয়া হেঁট মাথায় বশুতা স্বীকার কবিলে,—দেখিয়া তুই নির্দয় আনন্দে অট্টহাসি করিয়া উঠিবি। চাহিয়া দেখ—কী আমি করিতে পারি, কত শক্তি আমার মনে, কত বল আমার বাহুতে,—আমাব গৃহ ভাঙ্গা যায় না।

এই স্বপ্নেব মত সুন্দর জনপদের দিকে চাহিয়া কখনও-বা গর্কে দুর্গাপ্রসন্নের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। মনে মনে বলেন—‘দাঁড়া, বাজা, তোব জগ্ন আমি কী অপূর্ব্ব বাড়ি তৈরি কবে যাই দেখিস। আমার ঘব তো ভেঙেই গেছে—এ নতুন ঘব শুধু তোবই জগ্ন তৈরি কবছি।—পদ্মা তোকে মাতৃহীন কবেছে, গৃহহীন যেন না কবতে পাবে। যাবাব আগে তোব উপযুক্ত একটা স্থান আমি গড়ে যেতে চাই।’

সে-দিন বৈকালে দুর্গাপ্রসন্নের বাড়িতে নগব-পরিচালনা সমিতির অধিবেশন বসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপ্রসন্ন ভিন্ন অন্যান্য সভ্যো নগব-পরিচালনার সামান্যই বোঝেন। কিন্তু দুর্গাপ্রসন্ন চান, কোটাল-নগব তৈরি কবিতে সকলেই যোগ দিক্, পৌব-ব্যবস্থাব দায়িত্ব গ্রহণ কবিতে শিখুক। কিন্তু এই শুভ-সঙ্কল্প তাঁহাব বহু অশ্রুজলের কাবণ হইয়াছে।

বৈঠকখানাব কোঠা হইতে খালের বাঁকটা একটা বাঁকা তলোয়ারেব মত দেখা যায়। এখান হইতে খাল পর্য্যন্ত প্রায় দেড় বিঘা জমি সবুজ তুণে আস্তোর্প, অতি সামান্য ছয়েকটি গাছ দুর্গাপ্রসন্ন বাখিয়াছেন, বাকি সব কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। চোখেব সমুখে সর্ব্বক্ষণ তাঁব জল চাই, নহিলে তিনি অস্থিস্থি বোধ কবিতে থাকেন। খালের দৃশ্যটা এই জগ্নই মুক্ত বাখা হইয়াছে। পদ্মাকে দেখাব এত দিনেব অভ্যাস তাঁব অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; জল না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারেন না।

কিছুদিন আগে গ্রামে বিদ্যুৎ-সবববাহের ব্যবস্থা কবিস্বার জন্ত পরিচালনা-সমিতিতে দুর্গাপ্রসন্ন প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, এবং সমিতিব অভিমত অনুসারে এ-বিষয়ে উদ্যোগীও হইয়াছিলেন। কলিকাতাব এক কোম্পানী'ব সঙ্গে ইতিমধ্যে তিনি পত্র-বিনিময় করিয়াছেন এবং এখন হইতেই চোখ বুজিয়া কোটালনগবেব প্রতিঘবে, সাধাবণ-উদ্যান এবং মিলনীগৃহে পদ্মেব মত বিজলী বাতি জলিয়া উঠিতে দেখিতে আরম্ভ কবিয়াছেন।

পৌর-কর্তব্যেব তদারকেব জন্ত এক ডজন পৌবকর্তা আছেন, কিন্তু একসঙ্গে ইহাদের অর্ধেকের বেশি কখনও কোনও সভায় উপস্থিত হন না। আজ বিধু গাঙ্গুলী, নকুল চক্রবর্তী, হেম দত্তগুপ্ত এবং প্রতুল ডাক্তাব উপস্থিত ছিলেন। ইহাদেব মধ্যে এক প্রতুল ডাক্তার ছাড়া মা সবস্বতী আর কাহারও উপর সদয় ব্যবহাব না করায় আলোচনাব অনেকটাই সভ্যদের মস্তিষ্কে প্রবেশ কবিল না। তবে বিজলী-বাতি প্রবর্তনেব উপকারিতা সম্বন্ধে দুর্গাপ্রসন্নের সুচিস্তিত অভিভাষণ শ্রবণ কবিয়া কেহ মাথা, কেহ-বা দাড়ি এবং কেহ-বা ভুঁড়ি দোলাইয়া একবাক্যে কহিলেন, 'সাধু! সাধু!'

দুর্গাপ্রসন্ন কলিকাতাব এক বৈদ্যুতিক-এঞ্জিনীয়ারেব নিকট লেখা কতগুলি পত্র আছোপাস্ত পাঠ করিলেন। কহিলেন—কোনও কোম্পানী যদি নিজ দায়িত্বে কোটালনগবে বিদ্যুৎ-সবববাহেব ভার লইত, তবে আব চিন্তা করিবাব কিছু ছিলনা, কিন্তু এই ছোট জায়গায় বিদ্যুৎ-সবববাহ কবিয়া উপযুক্ত লাভেব আশা অতি সামান্য, এই কাবণে সেইরূপ কোনও কোম্পানী সংগ্রহ কবা যায় নাই। কাজেই নগব-পবিচালনা সমিতিকে নিজ দায়িত্বেই বিদ্যুৎ-যন্ত্র কিনিতে হইবে।

নকুল চক্রবর্তী মশায় অর্ধপঙ্ক দীর্ঘ দাড়িতে আঙুল চালাইতে চালাইতে কহিলেন—'নগব-পবিচালনা সমিতিব দায়িত্বেব কথাটা আমি

ঠিক বুঝতে পাবলাম না। দায়িত্ব কি আমাদের প্রত্যেকেই উপব  
ব্যক্তিগত ভাবেও বর্তাইতে পারে? তা যদি হয়—’

দত্তগুপ্তের ভূঁডিটা অত্যন্ত সস্তাস্ত গোছেব, এবং সামান্য উত্তেজনায়ই  
কাঁপিতে থাকে। ভূঁডিটা চাপিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন, ‘কিন্তু এই  
সবেই দাম উঠবে কি কইবা, তাই তো ভাবনা কথ। দাম নেহাৎ কম  
হইবে বইলা তো মনে হয় না—পাঁচ-সাত শো পডব গিয়া, কেমন?’

দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন, ‘না, না, আবও ঢেব বেশি পডবে। পাঁচ-সাত  
হাজারবেব কম তো নয়ই, বেশিই হবে। তবে আশা কবা যায়, বিদ্যুৎ-  
সবববাহ কবে যে আয় হবে, মূলধন তা থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে আসবে।’

তখন বিধু গাঙ্গুলী মশায় উদ্ভিন্ন হইয়া কহিলেন, ‘ওঃ, বাতির জল  
বুঝি আবাব পয়সা দিতে হইবে?’ অত্যন্ত করুণভাবে তিনি একটা  
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

প্রতুল ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—‘গাঙ্গুলী-মশায় কি বিনা  
পয়সায়ই আলো পেতে চেয়েছিলেন?’

গাঙ্গুলী অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, ‘না না, তা ঠিক না, তবে  
কিনা—’ ঠিক কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, এমন সময় নকুল  
চক্রবর্তী গাঙ্গুলীর মুখে কথ। কাড়িয়া কহিলেন—‘কি বকম আন্দাজ খরচ  
পডবে, সেইটা আগে থাকুতেই জাইনা নেওন ভাল। কি কও, দত্তগুপ্ত?’

দত্তগুপ্তের ইহাতে মতদ্বৈদ্য হইল না। কহিলেন—‘এইটা স্তায়্য কথ।ই  
কইচেন। লগ্ননেব থেইকা বেশি খবচা পডবে, না কম পডবে, যদি কম  
পড়ে, তবে কত কম, আব যদি বেশিই পড়ে—’

পৌবকর্তাদেব আলোচনায় ক্রমে আবও দূরদর্শিতা এবং মিত-  
ব্যয়িতার পবিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। দুর্গাপ্রসন্ন ক্রমশই হতাশ  
হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিলেন কথ।ব ঢেউ কোন দিকে  
যাইতেছে।

অবশেষে দত্তগুপ্ত বিনীত হস্ত কবিতা কহিলেন, ‘আপনার প্রস্তাব অতিশয় উত্তম সন্দেহ নাই ; কিন্তু গল্পচার কথাটাই আমরা ভাবতে আছি।’ বলিয়া গাঙ্গুলীকে ইসারা কবিলেন।

গাঙ্গুলী প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। কহিলেন—‘এই ব্যয়ভাব গ্রহণ কবা আমাগো সাধ্যাতীত।’

দাড়িতে আঙুল-চালনা স্তম্ভিত বাথিয়া নকুল চক্রবর্তী বলিলেন, ‘কেউ যদি থেকে কলকজা কিনেনেব টাকাটা দিয়া দিত, একমাত্র তবেই পারন যাইত...’

দুর্গাপ্রসন্ন ইঙ্গিতটা খুবই বুঝিলেন। বড় আহত হইলেন। বহু অর্থই তিনি কোটালনগবেব জগ্ন বাঘ কবিতাছেন—ইহাকে সুন্দর এবং সুবিধা-জনক কবিতাে কোনও ক্রটিই তিনি কবেন নাই। সেই সঙ্গে কোটালনগব-বাসীদের পৌরকর্তব্যও শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, পুৰব্যবস্থার দায়িত্ব-গ্রহণেব উপযুক্ত কবিতা তাহাদেব গডিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবে তা সফল হইবে, কে জানে। বর্তমানে যাহাব মাতরব তাহাব ঘোল আনা সুবিধাটুকু অগ্ৰেব হাত হইতে ফাঁকি দিয়া গ্রহণ কবিতাে পাবিলে একটু-মাত্র ক্ষতি স্বীকাবেও ধাজি নয়, ইহাবা অধিকাব পূবামাত্রায় ভোগ করিতে চায়, কিন্তু দায়িত্বটাও সমান আগ্রহেব সঙ্গে এড়াইয়া চলে।

সমিতির দূরদর্শিতাব দকণ ব্যাপাবটা সেদিন ঐখানেই চাপা বহিল। দুর্গাপ্রসন্নেব মনটা অত্যন্ত বিষন্ন হইয়া উঠিল, ঘবেব মধ্যে থাকিতে অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে নিজেব প্রায় অজ্ঞাতসাবেই তিনি খালেব পাডে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কল কল্ গল গল্ শব্দে জল হেলিয়া বাঁকিয়া টোল্ খাইয়া চলিয়াছে। অন্ত-আকাশের অবশিষ্ট রাগ-রেখাব ক্ষীণ প্রতিবিম্ব পড়িয়া রূপালী জলে কোথাও কোথাও সোনার কারুকার্য আঁকা হইয়াছে। কঁয়াচোর-কৌচর শব্দ কবিতাে কবিতাে দু’চারটা নৌকা রঙিন জলে দাঁড় নিষ্কেপ কবিতা আগাইয়া চলিয়াছে। জল-



শ্রোতের সঙ্গে দুর্গাপ্রসন্নের মনও যেন পদ্মার দিকে ভাসিয়া চলিল। নিস্তব্ধ নিদ্রালস পদ্মা রৌপ্যবর্ণ বিরাট এক চানরের মত পড়িয়া আছে; শ্রামল তটে তটে শুভ্র কাশফুল এবং সবুজ ধান এ উহার গায়ে হেলিয়া পড়িতেছে; পাল-তোলা কত যে নৌকা সূর্য্যাস্তের দিকে যাত্রা করিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। আকাশে সন্ধ্যাব তাবা ফুটিয়াছে, পদ্মাব রৌপ্য-শুভ্র জলে তাব প্রতিবিম্ব কাঁপিয়া উঠিতেছে। অন্ধাবে আঁকা ছবির মতন একটা কালো ডিঙি সর্বস্ব কবিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। বৈঠাব গা হইতে হীবার টুকরোব মতো জল ছিটকাইয়া আবার পদ্মাতেই মিলাইয়া যাইতেছে। স্বদূব চবে চাষীব মাচাব ঘবটাকে এক টুকবা স্বপ্নেব মত মনে হয়। কী শাস্তি, কী শুদ্ধতা!—

সহসা দুর্গাপ্রসন্নের কল্পনাব জাল ছিঁড়িয়া গেল। মিথ্যা। এ পদ্মাব চন্দ্রবেশ! চন্দ্রবেশেব অন্তবালে আছে কুৎসিত বান্ধসী, এক নির্ধম সংহাবিণী। মাস্তুষেব স্থ শাস্তি এক নিমেষে সে চুবমাব কবিয়া দেয়। একটা অবর্ণনীয় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সহসা যেন দুর্গাপ্রসন্নকে আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিল, মুর্ত্তিমতী পদ্মাব দেখা পাইলে তিনি বোধহয় ব্যাঘ্ৰেব মতন তাহাব উপব কাঁপাইয়া পড়িতে পাবিতেন।

‘দেবো, বৈদ্যাতিক সবজ্ঞামের সমস্ত টাকা আমি নিজেই দেবো, আবঃ কেউ নাই দিক্।’ দুর্গাপ্রসন্ন একাকী দাঁড়াইয়া সশব্দে কহিতে লাগিলেন। ‘ওবা আমাকে ঠকিয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায়ই দেবো।’ কোটালনগবকে আমি অপূর্ব্ব সুন্দব ক’বে গডতে চাই; পদ্মাকে দেখিয়ে বলতে চাই—বীবগঞ্জ ভেঙে বড তুই আমাব কবলি, সর্ব্বনাশী! একবার তাকিয়ে দেখ, কী জিনিষ আমি গডতে পারি।’

## ছয়

‘মিস্ত্রি !’

‘কি কন ?’

‘ব্যাদা দিয়ে আব কি কি সাফ্ করা যায় ?’

‘কেমন, কর্তা ?’

‘মাটি থেকে ঘাস চেষ্টে ফেলা যায় ?’

‘তা আর যাইব না ক্যান্, কিন্তু ধাব নষ্ট হইয়া যাইব যে। ঘাস কাইটা নি র্যান্দা নষ্ট কবে।’

‘তবে তো ব্যাদাব ভাবি জোর, ঘাস কাটতেই ভেঁতা—হি হি হি—ভারি তো ধারালো।’

মিলনীবাড়িৰ ভিতৰে দাঁড়াইয়া নিজের অপূৰ্ব রসিকতায় বাজা হি হি কৰিয়া হাসিতে লাগিল। ছুতাব মিস্ত্রীদেব সঙ্গে সে বীতিমত বন্ধুত্ব কৰিয়া লইয়াছে।

কাল তো মিস্ত্রীদেব জানেব বহব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রাজাব শেট ফাটিবাব জোঁগাড় হইয়াছিল :—

‘এই উচু জায়গাটাতো কি হবে, জান মিস্ত্রি ?’

‘কোনো ছাবতা-ট্যাবতা বহাইব বোধ কবি।’

‘ছাবতা-ট্যাবতা না রে বোকা, এটা থিয়েটাবেব স্টেজ ! স্টেজ হলো উচু জায়গা।’

বিস্মিত নন্দন মিশ্রি কাজের মধ্যেও ঈষৎ আগ্রহাশ্বিত বোধ কবিল। কহিল, ‘খেটাব কাৰে কয় ছোটকর্তা ? অ্যাংরাজি বাই-নাচ নাকি ?’

‘বাই নাচ আবাব কি ? ধ্যৎ, ওসব নয়। থিয়েটার হ্ছে যাত্ৰাই, তবে আলাদা বকমের যাত্ৰা। বাই-নাচও নয়, ভালুক-নাচও নয় !’

‘কেমন ?’ নন্দন সবিস্ময়ে প্রশ্ন কৰিল।

‘বজ্রবাহন, ত্রিশঙ্কর স্বর্গলাভ, হবিশ্চন্দ্র, গয়াস্বর—সব পালা-ই হয়, কিন্তু তবু যাত্রা নয়।’ বাজা বিজ্ঞেব মত ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

‘না ক্যান্ ?’

‘না ‘ক্যান্’ আবার ! থিয়েটারে ‘সীন্’ আছে যে !’

‘ছিন্ কাবে কয়, ছোটকর্তা ?’

‘এই না গয়াস্বর স্বর্গে গেল, পেছনে অমনি স্বর্গের ছবি ! এই না হবিশ্চন্দ্র শ্মশানে আছে, পিছনে শ্মশান ! যাত্রাতে আছে নাকি এমন ? একই জায়গা, তাকে একবার ভাব স্বর্গ, তাবপব যাক্ এক মিনিট, অমনি সেটাই হয়ে গেল শ্মশান—হি হি হি—’

নন্দন অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। অপাব খুসিতে দুই পাটি দাঁতই বাহিব কবিয়া কহিল, ‘এম্ন কবে ক্যাম্ তে ? ভেঙ্কি নাকি ছোটকর্তা, ভান্নুমতীব ভেঙ্কি ?’

নন্দনেব এই বিবাত অজ্ঞতাব কথা শ্রবণ কবিয়া রাজা সম্পূর্ণ একটা মিনিট হি হি কবিয়া হাসিয়া মবিল। কিছু যদি জানে এটা—হি হি—বলে ভান্নুমতীব ভেঙ্কি।—হি হি হি—। অবশেষে সে গম্ভীর হইয়া কহিল, ‘ধ্যোৎ, কিছু যদি জানে।’ ভেঙ্কি বুঝি,—দূর। ঐ তো বল্লম, সীন্—সীন্ দিয়ে—। সীন্ হলো কি জান ? মস্ত চণ্ডা এক একটা শাদা পদ্য এক একটা ক’বে ছবি এঁকে দেয়—কোনওটা স্বর্গ, কোনওটা শ্মশান, একটা বাজাব বাড়ি, একটা মন্ত্রীবাড়ি, একটা কোটালের বাড়ি, একটা নদী—এই সব কতই।’

এতক্ষণে দেখা গেল, নন্দন মিস্ত্রী একেবাবে বুদ্ধিহীন নয়। কহিল, ‘এক পদ্য টাঙাইনা থাকলে আব পদ্য দেখা যায় ক্যামতে ? মগ্গ গাখলাম, অখন শ্মশান দেখমু ক্যামতে ?’

রাজা হতাশ হইয়া কহিল, ‘এক ফোঁটা বুদ্ধিও যদি তোমার মাথায় থাকে, মিস্ত্রি। পদ্যগুলি একইসঙ্গে সব ঝুলতে থাকে বুঝি ? মাথার

ওপরে বাঁশ টাঙিয়ে আলাদা আলাদা করে গুটিয়ে রাখে যে। তাবপব যেই না দড়ি ছেড়ে দিলে, অমনি পড়ল স্বর্গ, গুটিয়ে নিলে—তাবপব পড়ল শ্মশান; গুটিয়ে নিলে—তাবপব ফেললে—একে বসে সীন্ ফেলা। থিয়েটার আবস্ত হোক, দেখো আমি কী করি! বাবা বলেচেন—আচ্ছা ফেলিস্। বলবে না—আমি বুঝি কম চালাক হয়েছি।’

‘কি করবেন, ছোটকর্ত্তা? কববেন কি?’

‘থিয়েটারের সময় সীন্ ফেলব দেখো।’ বাজা সগর্বে কহিল।

ছুতাবেব কাজ দেখা বাজার এক নির্দোষ আনন্দ। সময় পাইলে সে এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, বাঁদা এবং বাটালেব সাহায্যে কাঠেব তক্তা এমন সুন্দর দরজা-জানালায় রূপান্তরিত হয়, দেখিতে দেখিতে চেযাব ও বেঞ্চি তৈরি হইয়া ওঠে যে, রাজা আকৃষ্ট না হইয়া পাবে নাই। ছুতাবেব কাজের উপর গভীর শ্রদ্ধাই এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত কবিয়াছে।

‘আচ্ছা, মিস্ত্রি, তোমরা তামাক খাও কেন? খেতে মিষ্টি লাগে?’

নন্দন মিস্ত্রী হাতের কাজ সারিয়া নতুন কাজে হাত দিবাব আগে কলিকাতে বেশ এক খাব্‌লা দা-কাটা তামাক ঠাসিয়া কাঠেব চাঁচ দিয়া আগুন ধরাইয়াছে। কহিল, ‘নিশা, ছোটকর্ত্তা, নিশা। নিশাব টানে খাই, নাইলে আব ক্যান্।’ নন্দন বিরাট একটা টান্ লাগাইয়া কাশিতে লাগিল।

‘কাশতে বুঝি ভালো লাগে?’

‘নিশা-মাহাইয়া আপ্নে বুঝবেন না, ছোটকর্ত্তা—আগে বড় হইয়া লন, তবে যদি বোঝেন।’

‘ছাই।’ রাজা অবজ্ঞার সঙ্গে কহিল।

‘আইজ্ঞা হ—ছাইয়েরই সঙ্গী। মহাত্মাব গায়ে ছাই মাইখা তবে না কঞ্চি ধরণ শিখচে। আর টানলেও আঘে ছাই-ই থাকে—’ বলিয়া

নিজেব অপূৰ্ণ বসিকতায় হাসিয়া উঠিয়া নন্দন মিস্ত্রী আপ্রাণ জোরে কলিকায় টান লাগাইল, এবং পুনৰায় কাশিতে কাশিতে গৃহের অপর প্রান্তকে উদ্দেশ্য কবিয়া কহিল—‘শুনচ, পটুলাব বাপ্—নিবা নাকি, নেও।’

পটুলাব পিতাব এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। যেন এই আত্মহত্যার জন্য উৎকর্ষ হইয়াই সে অপেক্ষা করিতেছিল, ডাকা সমাপ্ত হইবাব আগেই আবিভূত হইল, এবং নন্দনের হাত হইতে কলিকাটা এমন একটা টান মাঝিয়া ছিনাইয়া লইল যেন নন্দন তাহাব সম্পত্তিই এতক্ষণ ধরিয়া বে-দখল কবিয়া তাহাব উপসব্ব অত্যন্ত অগ্নায়ভাবে ভোগ কবিয়া আসিতেছিল।

তামাকটা যে ইহাদেব কাছে কত বড় পদার্থ, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। পাভাগাঁয়ের এই সব দুর্গতাব দল পেট ভরিয়া ছুইবেলা ভাত খাইতে পায় না, ছেঁড়া শ্রাকডা পবিয়া ইহাদেব লজ্জা নিবাবণ করিতে হয়। আবাম, আযাস এবং বিশ্রাম ইহাদেব নিকট দুবাশাবও অধিক। দিনেব পর দিন ছন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবনেব নিরস পথে এই বঞ্চিত মানুসগুলি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিজেদেব মধ্যে অভাব বোধ পর্যন্ত ইহাদেব আব নাই, এমনি পবিপূর্ণভাবে ইহাবা মবিয়া গিয়াছে। এই প্রকাব জীবনেব মধ্যে তামাকটা যে কত বড় বিলাসিতা, কত বড় আনন্দের উপাদান, তাহা পটুলাব বাবাব মতন এইরূপ লোলুপতা না দেখিলে বুঝিতে পাবা সহজ নয়। যতই সে বলিতে লাগিল—‘নাঃ, কিছু বাখস নাই, নন্দা—সব শ্রাষ্ কইবা দিছস্’—ততই সে কঠিনতব অধ্যবসায়েব সঙ্গে কঙ্কি টানিতে লাগিল, যেন আখের কলেব মতন, ওব মধ্য হইতে বসেব শেষ ফোঁটা পর্যন্ত টানিয়া লইবে। তাব কাণ্ড দেখিয়া রাজা গভীর সহানুভূতিব সঙ্গে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

‘কেবলই তামুক খাস্ তোবা, কেবলই তামুক খাস্। বলি, কাজ-কন্ম করস কখন?’

ছুতারদের সঙ্গে রাজাও চমকিয়া পিছনে ফিরিল। দেখিল, একবাশ দাড়িব পিছনে নকুল চক্রবর্তী মশায় দাঁড়াইয়া বহিয়াছেন। এ-তল্লাটে চক্রবর্তী-মশায়েব দুর্শুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। নন্দন বডই ঘাব্ ডাইয়া গেল। জোড় হস্তেব উপর মাথা নিচু কবিয়া সবিনয় প্রণাম কবিয়া কহিল—‘আইজ্ঞা না, তামুক খাই কই। সাবা দুপুইবে এইতো মাত্র ধরাইলাম। পটলার বাপেবে জিগান্ না—’

‘একবাব ধবালি।’ চক্রবর্তী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘বলি দুটা কইবা উঠখ কি আমাগো আছে, না নাই? ভোবে যাইতাছি, দেখি তামুক টানচস্; অখন যাইতাছি, অখনও তামুক টানচস্—এইব থেইকা কি প্রমাণ হয়?’

পটলেব পিতা ঘেমন দ্রুত আসিয়াছিল, তেমনি আশ্চর্য্য ক্ষিপ্ততাব সঙ্গে সবিয়া পড়িয়া একটা কাঠেব গিঁঠেব মধ্যে বাটাল মাবিয়া এমনি শব্দ তুলিতে লাগিল যে, তাব কর্ম্মতৎপবতা সম্বন্ধে আব কোন সন্দেহেরই অবকাশ রহিল না। কিন্তু নন্দন মিস্ত্রী ভোবেবেলায় একবার এবং বিকাল বেলায় অন্তবাব তামাক-টানা হইতে কি নিশ্চিত প্রমাণ হয় তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পাবিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কহিল, ‘আইজ্ঞা, কাম-কন্ম তো উচিত মতনই কবতে আছি, চক্রবর্তীমশায়। তামুক না খাইলে জোব পাম্ কইখন?’

‘দেখ নন্দা, চালাকি কি আব আমি ট্যাব পাই না? চিবদিনেব ফাঁকিবাজ তুই। এক মাসেব মইধ্যে আমরা মিলনী খোলন ঠিক কবছি, আব এই দিকে তরা ফাঁকি মারতে শুরু কবছস্! উহ, ফাঁকি দেওন চলব না। ঠিক মতন কাম পাই বাখুম, নাইলে খেদাইয়া দিমু.’  
চক্রবর্তী সহসা বীরদর্পে কহিলেন।

নন্দ আহত কণ্ঠে কহিল, ‘আপ্নে এমুন কথাটা আমাবে কইলেন, চক্কত্তী মশয়! কর্তাবাবুও তো এমুন কথা নন্দন মিত্তিবিরে কইতে পাবে না যে, নন্দন..’

‘কর্তা কে বে, কর্তা আমরা হকলে। এইটা জমিদারের নিজের বাড়ির কাম না, মনে রাখিস্। জমিদার সমিতির সভাপতি হইলে কি হইব, এই নকুল চক্কত্তী যা কইব, তাই হইব। কোনও কর্তাব-ফর্তাব দোহাই—এই যে, ছোটকর্তা, কি কবতাছ এইখানে? লাটুব বায়না ধরচ বুঝি?—হ্যাঁ, কি কইতে আছিলাম। কর্তা একজন মানুষ বৈ তো না, সব দিকেই কি দৃষ্টি দিতে পাবেন যে, কর্তাব দোহাই দেস্?—দে, নন্দা, কি চায় কইবা দে। তা বইলা যখন তখন আইসা কাজে ব্যাঘাত কইরো না, বাজপুতুব। সর্বসাধাবণেব কাজে—’

বাজাব সম্মান আহত হইল। গম্ভীরভাবে সে কহিল—‘আমি কিচ্ছুই চাই না—আমি ওমনিই দাঁড়িয়ে বয়েচি—’

নকুল চক্রবর্তী ইজিত-গর্ভ হাসি হাসিলেন। কহিলেন—‘প্যাটে প্যাটে এত বুদ্ধিও হইচে—হা হা—। তা পোলাপানমানুষ একটা লাটু চাইছ, এইতে লজ্জা কি? তা দিস, নন্দা, একটা বানাইয়া দিস্।’ তাবপব নন্দন মিস্ত্রীব দিকে বুঁকিয়া গলাটা খাটো কবিয়া কহিলেন—‘কাঠ-টাট যদি কিছু বাচে, তবে একটা তক্তাপোষ তৈরি কইবা দিস্ তো, বাবা। তবে কিনা সর্বসাধাবণেব কাজ বাচাইয়া তবে। একটু ছুটিছাটা পাস্ তো দুই-চাইব খান তক্তা লইয়া আমাব বাসায়ই চইলা যাইস্, নাইলে আবাব মাপ-জোকেব অন্তবিধা হইব, বুঝলি না?’

‘আইজ্ঞা বুঝি, যামুনে।’—নন্দন কহিল।

‘খুবই মন লাগাইয়া কাজকর্ম কববি,—সর্বসাধাবণেব কাম কিনা। তামুক-টামুক খাবি বৈ কি, তবে একটু সাবধান কইবা দেওন, বাডাবাড়িটা না হয়।—ছোটকর্তাব কি পড়াশুনা নাই, যত্নতত্ত্ব ঘুইবা বেডান হইতেছে?’

‘ইন্সুল ছুটি।’—রাজা নির্লিপ্তভাবে কহিল।

‘ইন্সুলই না হয় ছুটি, তা বইলা ইচ্ছা থাকলে কি আব পড়াশুনা করন যায় না। টাকা-পয়সা না হয় ঢেব আছে, কিন্তু বাবা, পড়াশুনা না কবলে তো আব মাহুষ হইতে পারবা না—তবে অগন আসি ..’

নকুল চক্রবর্তী দবজাব দিকে অগ্রসব হইলেন, কিন্তু চৌকাঠ অতিক্রম করিলেন না। সহসা থামিয়া পড়িয়া ফিবিয়া কহিলেন, ‘শুনচস, নন্দন মিস্ত্রিবি, কাঠেব চাঁচগুলি আইজ আমার বাসায় পাঠাইয়া দিস্ তো, এই দিয়া চুলা ধরাইতে বেশ সুবিধা।’—বলিতে বলিতে তিনি অস্তর্দ্বান হইলেন।

রাজা ঠোটটা অবজ্ঞাব ভঙ্গিতে বাক্য কবিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নকুল চক্রবর্তী কর্তব্য সমাধা কবিয়া বাহিব হইবা-মাত্র নন্দন মিস্ত্রিবি দিকে চাহিয়া কহিল, ‘ব্যাঁদা দিয়ে দাড়ি চেঁচে দেওয়া যায় না, মিস্ত্রিবি ? তাতেও ধার নষ্ট হয়ে যায় ..’

বৈকাল হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই বাজা বাড়িব দিকে বণ্ডনা হইল। ইন্দিব-পিসিমাকে তাব যা ভয়, তা আব বলাব নয়। খাইতে যদি সে একটু-মাত্র আপত্তি দেখায়, স্নানাহাবে যদি একটুও অসময় কবে, দুধ খাইতে যদি সামান্য অনিচ্ছাও প্রকাশ কবে, তবে বুড়ি পিসি মায়েব নাম ধরিয়া এমনি বিলাপ শুরু কবে যে, বাজাব আব এক মিনিটও দেবি হয় না। ইন্দির ঠাকুবাণীও চমৎকাব এক অস্ত্র হাতে পাইয়াছেন, বাজা কোনও প্রকাব দৌবাণ্ডিয়া প্রকাশ কবাব ইঙ্গিত কবামাত্র তিনি মুখ ঈষৎ হেলাইয়া বা হাতে বা কানটা ঢাকিয়া সজল সুবে শুরু করেন—‘কোথায় গেলা গো, বৌমা, এই বুড়া বয়সে আমাব মাথায় বোকা দিয়া, সোনাব প্রিস্তিমা, কই হাবাইয়া গেলা গো।’—যা ভয় করে রাজা পিসিমাব এই কান্নাটা। তাই আগেই সাবধান হইয়া সে বৈকালিক জল-খাওয়াব জল বাড়িব দিকে অগ্রসব হইল।



খালে সোনার জল টলটল কবিয়া উঠিয়াছে। বড়িন জলে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ তুলিয়া অলস গতিতে দু'চাবটা নৌকা যাতায়াত করিতেছে। পাড়েব গাছ এবং অগাধ দ্রব্যেব ছায়া জলেব মাধ্য গা ধুইয়া লইতেছে, এক ঝাঁক বকের এক বিচিত্র ছাঁদেব সারি পদ্মার দিক হইতে উড়িয়া আসিয়া অজানা কূলায়েব দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাজ্রাব একবার ইচ্ছা হইল, এইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে কতদূর পর্যন্ত বকগুলিকে দেখা যায়, কখনই বা তাহাবা অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়ে। নৌকা-চলা দেখিতেও এমন ভাল লাগে যে, নড়িতে ইচ্ছা হয় না। নৌকাব মধ্যে যখন সুদীর্ঘ ঘোমটা-টানা বউ সওয়ারি থাকে, তখন তো বাজ্রা দৃশ্যটাকে বড়ই উপভোগ কবে,—বউয়েরা নাকি সব শশু-বাড়ি যায়, বউ কবে ঘোমটা না টানলে শাশুড়ি বকবে কিনা, তাই—হি হি—ওবা নিশ্বাস নেয় কি কবে? কিন্তু রাজার আব অপেক্ষা কবা চলিল না, পিসিমার কান্নাব চেহাবা মনে পড়িতেই সে সকল ইচ্ছা মনে চাপিয়া দ্রুত অগ্রসব হইল।

‘কোথা থেকে এলিবে, মানিক?’

‘আব কইখন্, ছোটকর্তা, গাঙেব থন্।’

জেলে-ডিঙিটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। শুপীকৃত জালের পাশে বসিয়া মানিক অলস-গতিতে বৈঠা বাহিয়া আসিতেছে। পাল টাঙাইবাব বাঁশটা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু পাল খোল!, মানিকেব কোনই তাড়া নাই। বেসুবা কঠে সে ভাটিয়ালি গাহিয়া আসিতেছিল, বাজ্রাব ডাক শুনিয়া চাহিয়া পবিচিতের হাশু কবিল।

বস্তুত, মানিক বাজ্রাব একান্তই বন্ধুস্থানীয়। বয়স উনিশ হইতে একুশেব মধ্যে, একহাবা সুস্থ শ্রামল দেহ, মাথায় বাব্রি চুল, এবং মুখে সর্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। তবে দোষের মধ্যে তাঁব গানের শখটা

একটু বেশি, এবং এইখানেই ওব বিবেচনা-শক্তির সব চাইতে বেশি অভাব। কিন্তু ওকে রাজ্যাব বেশ ভালই লাগে। মানিক মাছ ধবিবাব কৌশলটা রাজ্যকে শিখাইয়া দিবে বলিয়াছে, এবং আগেই সাবধান কবিয়া দিয়াছে, মানিকেব বাপ বা খুড়াদেব কাছে এ-কথা সে যেন ঘূণাক্ষবেণ্ড প্রকাশ না কবিয়া দেয়। বাজা প্রতিজ্ঞা কবিয়াছে, সে বলিবে না।

‘এত দেরি কবলি কেন বে ? সেই বাস্তিরে গিয়ে এখন ফিবে এলি ?’

‘হ, তাই তো।’

‘এতক্ষণ মাছ ধবলি ? তবে তো অনেক মাছ পেয়েচিস।’

‘আবে না—দূবু। দিনে মাছ ধরি না। আমি আইলাম কুটুম-বাড়ির থন থাইয়া। ঝাউতলায় খুড়া-মশয়ের হৌব-বাড়ি কিনা—তেনাব ছোট-পরিবাব—’

এতক্ষণে মানিকেব ডিঙি নিকটবর্তী হইয়াছে। বাজা কহিল, ‘এই, ভিড়া তো, আমি একটু উঠবো।’

‘নাঃ, ছোটকর্তা, উইঠো না, আইস্টা গন্ধ কইবো, তোমাগো ভদ্র-লোকেব নাকে সহিতে পাববা না।’

‘খুব পাবব। এইখানে না উঠলাম, মিলনী-বাড়িব কাছে নামিয়ে দিবি, বুঝলি ?’

খুসি হইয়াই মানিক ডিঙি পাড়ে ভিড়াইল। বাজাও সমান খুসিব সঙ্গে জেলে-ডিঙিতে উঠিয়া গলুইয়ের উপর বসিয়া পড়িল। জেলে-ডিঙিতে চড়াব শখ তাব অনেক দিনেব, কিন্তু সাহস করিয়া মানিককে ইতিপূর্বে সে ডিঙিতে চড়াইতে অমুরোধ কবে নাই। তাই এই অভিজ্ঞতা তাব পক্ষে যেমন নতুন, তেমনি লোভনীয়।

‘একদিন তোব সঙ্গে পদ্মায় মাছ ধবতে যাব।’

‘পদ্মায়।’ সবিস্ময়ে মানিক কহিল।

‘হ্যা।’

শুনিয়া মাণিক হাসিয়া উঠিল। কহিল, ‘তামসা বাথ, ছোটকর্তা।’

‘ধোয়, তামাসা নয়। দেখিস, একদিন যাব—তোব সঙ্গেই যাব।’

‘ডবাইবা না?’

‘ডবাত্তে বয়ে গেছে।’

‘ভক্তলোকে নি ডাক্তাব বাইবে পাও বাড়ায়—ডবে মবে।’

‘মবে, তোকে বলেচে।’ বাজা অবজ্ঞাব সঙ্গে কহিল।

মাণিক বুঝিল, কথাটা ছোটকর্তাব মন-মতন হয় নাই। তাই আব সে কথা চালাইবাব চেষ্টা করিল না, ভুরু কুঁচকাইয়া, গলাব বগ ফুলাইয়া বেস্ববা কণ্ঠে গান উঠাইল।

‘এই শুনচিস, গান থামা।’

‘কও।’ গান থামাইয়া মাণিক কহিল।

‘নিষে যাবি একদিন পদ্মায?’

‘গ্যালে আব নিমুনা ক্যান্।’ আমাব আব আপইত্যটা কি।’

‘কবে নিবি, বল? নিষে যদি যাস, তবে দেখিস, তোকে আমি কি দেই।’

এই প্রলোভনে মাণিক যে বিশেষ প্রলুদ্ধ হইল, তাহা মনে হইল না। অবিশ্বাসেব সঙ্গে কহিল, ‘বডকর্তায় বাজি হইলে, তবে না।’

বাজা সগর্বে কহিল, ‘আমি বল্লেই বাজি হবে, দেখিস।’

‘তবে আব নিমুনা ক্যান্।’—শোন, ছোটকর্তা, আখ্‌ডাব অমর্ত্ত, বৈবাগীব থন্‌নতুন গানটা কেমন শিখচি।’ বলিয়া সে তাব স্বরহীন কণ্ঠেব অপূর্ক স্ববে অসম্ভব দবদের সঙ্গে গান শুরু কবিল—

‘চড়ে ইংবেজের গাড়িতে তোব কিবা প্রয়োজন।

ওবে অবোধ মন বলি শোন।’

## সাত

আজও রাজার ইন্সুল ছিল না। দুপুরটা আর কাটিতে চায় না। মাহুঘেরা যে কি কবিতা ঘুমাওয়া দুপুরটা কাটাইয়া দেয়, ভাবিয়া বাজা বডই বিষয় বোধ করে। সে নিজে সে-চেষ্টা করিয়া দেখে নাই, এমন নয়। পিসিমাব সজল শাসনে একাধিক দিন দুপুর-রৌদ্রে পাড়া বেড়াইবাব হুনিবার প্রলোভন মনে চাপিয়া কম পক্ষে পাঁচদশ মিনিট নিদ্রার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ঘুম আসা দুবে থাকুক, যত বাজ্যেব কুল এবং আমগাছ, জেলে-ডিঙি এবং বোয়েব নৌকা এবং তার বিচিত্র শ্রেণীর বন্ধুদেব চেহারাগুলি চোখেব সমুখে আসিয়া এমনভাবে হাত-ইসায্য ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, বিকালে ফিবিয়া আসিয়া ইন্দিব ঠাককণেব বিলাপ সহ্য করা ছাড়া আব গতাস্তব থাকে নাই।

আজও আবার সেই সমস্তায় পড়িয়াছে। গত ববিবার সাবা দুপুব আদাডে-বাদাডে ঘুবিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া বাবাব কাছে যা বকুনি খাইয়াছিল, তা আব বলাব নয়। তাই যদিও আজ দুপুব হণ্ডাব সঙ্কে সঙ্কেই বন-জঙ্গল, খালেব পাড়, গয়লা পাড়া এবং জেলেপন্নী তাকে শুধুই ডাকিতে লাগিল, তবু সে শব্দ হইয়া বহিল।

কিন্তু এ রকম কুচ্ছ-সাধন বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। অবশেষে হতাশ হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে পিসিমার তাক হইতে আমের আচাব চুবি করিতে গেল। এই আমেব আচার বাজ্যেব একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতা। পিসিমা যতই আমের আচারেব বোতল সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া ওঠেন, রাজ্যেব লোভটা ততই আরও দুর্দমনীয় হইয়া ওঠে। কিন্তু তা হইলে কি হয়, পিসিমার সাবধানতাব গুণে এক দিনও সে বোতলটার নাগাল পায় না—কোথায় যে পিসিমা সেটাকে এমন অপূৰ্ণ কোশলে লুকাইয়া রাখে, রাজা স্নগভীর অধ্যবসায় সঙ্কেও তার কোনও কিনারা করিতে

পারে নাই। এই হয়তো দেখিল বোতলটা মুড়িব টিনেব পিছনে, ঠিক করিয়া গেল, পিসিমা একটু সরিলেই হয়, কিন্তু পিসিমা সরিয়া গেলে বাজা যখন হুট্টিচেতে পুনঃপ্রবেশ করিল, তখন আমেব আচারও অদৃশ্য হইয়াছে। অগ্ন অনেক রকমেব আচাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাদের উপর বাজার কিঞ্চিৎমাত্র লোভ নাই এবং সেইজন্ত সে-সব ক্ষেত্রে পিসিমা ব কৌশল-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

দিনান্তেব পবিত্রমেব পব ইন্দিব ঠাকুরণ মহা আবামে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নাকেব একটানা ডাক শুনিয়া বাজাব আব কোন আশঙ্কাই রহিল না, মুখেব সঙ্গে সঙ্গে সে গা'টাও দবজা দিয়া গলাইয়া দিল। একটু মুচকি হাসিয়া মনে মনে কহিল—লক্ষ্মী পিসিমা তো, বেশ একটু পাকা ঘুম ঘুমোও, বেশ একটু নিশ্চিন্ত ঘুম ঘুমোও। আমের আচাবেব জন্ত তোমা ব কোনও ভাবনা নেই।—

পা টিপিয়া টিপিয়া আদত একটা চোবেব মতন বাজা পিসিমার নিজ হাতে তৈবি যাবতীয় স্মৃথানগুলি যে তাকেব উপব সাজান থাকে, সে দিকে অগ্রসব হইল। আম পাকাইয়া কেন যে লোকে সেগুলি নষ্ট কবে, বাজা ভাবিয়া পায় না। কাঁচা থাকিতে পাড়িয়া আচাব করিয়া রাখিলে তা খাইতে ঢেব ঢেব ভাল। পায়েব বুডো আঙুল দুইটার উপব দাঁড়াইয়া, ঘাড়টা যথাসম্ভব প্রলম্বিত কবিয়া বাজা আমেব আচাবেব বোতল খুঁজিতে লাগিল। পাইবাব যে খুব আশা ছিল তা নয়—পিসিমাকে অতটা অসাবধান সে মনে কবেনা—তবে ববাতের কথা কে বলিতে পাবে।

ববাতই বটে। বাজাব দুই চোখ লুক খুসিতে চক্চক্ কবিয়া উঠিল। বাতাসাব হাঁড়িটার পিছনে, নাবকোল নাডু ও কিস্মিসের বড বোতল দুইটার মধ্যখানে সেই বহুমূল্য আচাবেব বোতলটা একান্তই অসহায়ভাবে অবস্থান করিতেছে। সোনা বর্ণ তেলের মধ্যে কম পক্ষে

দশ-পনেবো টুক্বা আমেব' আচাব অপূর্ব মাধুর্য বিস্তার কবিতেছিল, রাজাকে দেখিয়া যেন খিলখিল কবিয়া হাসিয়া উঠিল। বাজাব আব মুহূর্ত্ত সহিল না, একবার মাত্র ঘুমন্ত পিসিমাব দিকে চাহিয়া লইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল, এবং পবক্ষণে তাকের উপর দুই হাতের কনুইয়ে ভব করিয়া দেহের অর্দ্ধেক উঠাইয়া অবলীলাক্রমে আচার হস্তগত কবিল। পবমুহূর্ত্তে বাজা আব সে ঘবে নাই।

খালের পাডেব লিচু গাছটাব তলায় বসিয়া সমস্ত আচার নিঃশেষ করিবাব পব তবেই বাজার বিবেকটা একটু গোলমাল শুরু কবিল। সবটা খাইয়া ফেলা ভাল হইল না, একটু বাডাবাডি হইয়া গেছে। পিসিমা যে চাইলে একেবাবেই দেয় না, এমন তো নয়—একবারে এক আধ টুক্বাব বেশি দেয় না বটে, কিন্তু দেয় তো। ঘুম হইতে উঠিয়া আমেব আচারেব অবস্থা দেখিয়া পিসিমাব যা বিলাপ শুরু হইবে—হি হি হি—কিন্তু সবটা না খাইলেই ভাল ছিল। বাজা ভাবিতে লাগিল—খেতে খুব মজা লাগে কি না, তাই তো সবটা খেয়ে ফেলুম, যা ভাল লাগে আমেব আচার। কিন্তু বুডোমানুষেবটা সব শেষ ক'বে দিলুম—দুব। এত কষ্ট ক'বে সব সময়ে লুকিয়ে বাখে। নিরিমিষ খায় কি না, তাই আচার না হলে খাওয়া যায় না। এমন আমি লোভী হয়েছি, পেটকেব হাঁড়ি। রাজাব মনটা সহসা খাবাপ হইয়া গেল। এমন ভালমানুষ পিসিমা—কত পিঠা তৈরি ক'বে দেয়, কত কপকথা বলে, মাথায় তেল মেখে দেয়, কত আদব কবে—দুব, আচাব খেয়ে একটুও ভালো হয় নি—

কিছুক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে রাজা খালকে সন্মোদন করিয়া কহিল—‘খেলুমই বা, আর বুঝি তৈরি কবা যায় না। গাছে তো কতদিন বোল দেখা দিয়েচে—এইবার ক'চি আম দেখা দেবে। দিয়েচেই তো,—যমুনা

বোষ্টুমি সেদিন বললে না, আখ্‌ডাব গাছে এবই মধ্যে আম ধরে গেছে—  
আমাকে আনতে যেতে বললে না? ধবেচেই তো, ঈশ্ববেব জায়গায়  
আগেই সব ধবে!’

আচাব থাওয়া উপলক্ষ্য কবিয়া যমুনা বৈষ্ণবীৰ নিমন্ত্ৰণটা বাজাব মনে  
পড়িয়া গেল।

গ্রামেব প্রান্তে বাউলদেব একটা বড় বকমেব আখ্‌ডা আছে।  
দুর্গাপ্রসন্নকে ধবিয়া এই বাউল-সম্প্রদায় কোটালভিটাব উত্তব-প্রান্তে  
বিস্তৃত ভূমিখণ্ড জোগাড কবিয়াছে এবং গ্রামান্তব হইতে বাস উঠাইয়া  
আনিয়া এখানে মস্ত বড় আখ্‌ডা ফাঁদিয়াছে। বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে  
এবং পূজার্কনা ও নামকীৰ্ত্তনাদি বিশেষ আডম্ববেব সহিতই অমুষ্টিত  
হইতেছে। বৈবাগী-বৈষ্ণবীৰ সংখ্যাও কম নয়, এবং গ্রাম-গ্রামান্তবেব  
বিভিন্ন বাউল-সম্প্রদায়েব বহু অতিথি সৰ্বদাই এখানে যাতায়াত কবে।

তবে গ্রামেব সামাজিক জীবনেব সঙ্গে আখ্‌ডাবাসীদের কোনই  
সংযোগ নাই—তাবা সব কিছুব বাইবে। এব কাবণ এই নয় যে,  
বাউলেবা সংসাবেব সঙ্গে সম্পর্ক লোপ করিয়া সাধন-ভজন লইয়াই ব্যাপ্ত  
থাকিতে চায়, প্রকৃত কাবণ এই যে, গ্রামেব লোকেবা এদেব দেখিলে  
নাক সিঁটকায়—প্রায় অস্পৃশ্বেব কাছাকাছি মনে কবে, এবং ভিক্ষা দেওয়া  
ছাড়া এদেব সঙ্গে সম্পর্ক বাখা গর্হিত মনে কবে।

বাউল-সম্প্রদায়েব মধ্যে কদাচাব, দুর্কলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায কিছু  
অভাব নাই, প্রকৃত বাউল এবং ছদ্ম-বাউলেব তফাৎ সাধাবণেব কাছে  
লোপ পাইতে বসিয়াছে। কোটালভিটাব আখ্‌ডাবও দুর্গামেব অভাব  
ছিল না, বিশেষত, যুবতী বৈষ্ণবীদের প্রাহুর্ভাব গ্রামেব বুড়োবা বিশেষ  
সন্দেহেব চোখে দেখিত, এবং আব যাই হোক, ইহাবা যে শ্রীকৃষ্ণেব  
সেবাদাসী নয়, তাহাতে তাহাদেব সন্দেহমাত্র ছিল না। এই সম্প্রদায়  
কিছু দিন পূর্বে পর্য্যন্তও পাশেব গ্রামে বাস কবিত, কিন্তু সেখানে

পরকীয়া-ভাবের এমন নাকি কাড়াবাড়ি হয় যে, গ্রামের লোকেরা মিলিয়া এদের দূব করিয়া ছাড়ে। সেই দুর্গামেব অংশ এরা কেটালভিটায়ও বহন কবিয়া আনিয়াছে, এখানেও ওবা নেডানেডির দল নামে পরিচিত।

যমুনা এই আখ্‌ডাবই বৈষ্ণবী। কোটালনগবেব বাডি বাডি সে গান গাহিয়া বেড়ায়, তাকে চেনে না, এমন মানুষ কম। বছর তিবিশেক বয়স, চেহাৰাটা ভদ্রমেয়ের মতন, গলাটা মিষ্টি এবং কীৰ্ত্তনে সত্যই কিছু দক্ষতা আছে। এই সব কাবণে চাল সে সবার চাইতে বেশি সংগ্রহ করে।

রাজাব সঙ্গে যমুনা বড় ভাব। ভিক্ষায় আসিয়া কবতালে ঠোকাঠুকি করিয়াই সে হাঁক দেয়—‘কোথায় গেলে আমাব গোপাল—গান গাইব কার কাছে?’

বাজা হয়তো দোতলাব ঘবের জানালাব কাছে মুখ আনিয়া বলে—‘এই, টেচাচ্ছ কেন, বোষ্টুমি? দেখচ না পডাশুনো কবচি। ফের ‘গোপাল’ ‘গোপাল’ করবে না বলে দিলুম।’

‘ওঃ, ভুলে গেছলাম, ছোটকর্তা। কিন্তু তুমি যদি না শুনবে, কাব কাছে গাইব?’

‘তাব আমি কি জানি। আব শুনচো বোষ্টুমি, বোজ বোজ এক গান গেয়ো না, আমার মাথা ধবে যায়।’

যমুনা হি হি কবিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। হয়তো ইন্দির ঠাকরুণেব দিকে চাহিয়া সহর্ষে বলে—‘দেখলেন, মা ঠাকরুণ, ছোটকর্তার কেমন গানের কান—বলেন, বোজ বোজ এক গান গেয়ো না, মাথা ধরে যায়।’ সারা গাঁয়ে যমুনাকে এমন কথাটি আর কেউ বলে না।’

ইন্দির ঠাকুবাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—‘অখন ভগবান বাঁচাইয়া রাখে, তবে না।’



‘বাথবে, বাথবে মা—বাজাব ছে ল মল্লাবাজ হবে। এমন চালাক ছেলে আর তো চোখে পড়ে না।’

সেই যমুনাব কাছ হইতে বাজাব নিমন্ত্রণ ছিল। আখ্‌ডাব গাছে ইতিমধ্যেই আম বড হইয়া উঠিয়াছে—বাজা গেলে সে তাকে বিস্তব পাড়িয়া দিবে: তা’ছাড়া আখ্‌ডাব মতন এমন বিগ্রহ আব কোথাও নাই—বাধাক্ষণ যেন খুসিতে সৰ্ব্বক্ষণ হাসিতেছেন—শ্রীখোলেব সঙ্গে কীর্ত্তনও সে বাজাকে শুনাইয়া দিবে ইত্যাদি।

যদিও বাধাক্ষণকে বাজা ভক্তি কবে এবং শ্রীখোল শুনিতে তার আশৈশব আগ্রহ, তবু কিন্তু আমেব কথাটাই তাব মনে সব চাইতে বেশি লাগিয়াছিল। পিসিমাৰ আচাব শেষ কবিয়া আজ যমুনা বৈষ্ণবীৰ আম দিবার প্রতিশ্রুতিটা তাব মনে পড়িল। সঙ্কায় বাড়ি ফিরিলে পিসিমা যখন তাব স্বভাবসিদ্ধ বিলাপটা আজ অধিকতব তীব্রতাব সঙ্গে শুল্ল কবিবে, বাজা তখন কাপডেব খুঁট হইতে সগৰ্বে এতগুলি নতুন কচি আম বাহিব কবিয়া দিবে। দেখি, পিসিমাৰ কান্নাটা কোথায় থাকে।

যমুনা ঠাকুবঘবের সমুখেব মাটিব দাওয়ায় পিটুলি-গোলা দিয়া আল্পনা আঁকিতেছিল, চোখ উঠাইয়া বিস্ময়ে একেবাবে অবাক হইয়া গেল। বাজপুত্র পক্ষ্যবাজে চড়িয়া সত্যসত্যই যে তাব দুযাবে উপস্থিত হইতে পাবে, তাহা কি সে স্বপ্নেও ছাই ভাবিতে পাবিয়াছে। মুখটা তাব গৰ্বে, আনন্দে, হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া কহিল, ‘ছোটকর্ত্তা, তুমি।’ এস, এস ভাই—তুমি আসবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পাবি নি।’

বাজা দাওয়াব উপব উঠিয়া কহিল—‘বাঃ বে, তুমিই তো আমাকে আসতে বলেছিলে। বলেছিলে যে—’

‘বলেছিলুম তো, সারা জীবন ধরে’ কত প্রার্থনাই তো করেচি, ক’টা চাওয়া আমার পূর্ণ হয়েছে? চল ভাই, এখানে আব নয়, রাজপুত্রকে একবার কুঁড়েঘরে নিয়ে বসাই।’

নিজেব কুটিবেব আল্পনা-আঁকা মাটির মেঝেয় যমুনা পাডেব স্মৃত্যায় তৈরি আসন পাতিয়া দিল। চিত্রিত হাত-পাখাটা তাড়াতাড়ি পাড়িয়া আনিয়া বাজাকে জোবে হাওয়া কবিত্তে লাগিল। অপূর্ব মমতাব সঙ্গে বারম্বার কহিত্তে লাগিল—‘এই বৌদ্রেব মধ্যে সাবাটা পথ হেঁটে এসে মুখখানা যে বাঙা হয়ে উঠেছে—কত কষ্ট কবে এলে—আহা মবে ঘাই। কী গোঁববই দিলে হতভাগিনীকে—’

‘কী বলছ? ও বকম কচ্চো কেন?—অস্থ কবেচে?’

‘না, গোপাল, না, অস্থ নয়। এব চাইতে বড স্থ যে আমি কল্পনা কবতেও পারি নে, গোপাল—’

‘ফেব্ গোপাল?’

‘কি বলব তবে? আব কোন্ বড গোঁববেব নাম দিয়ে তোমাঘ ডাকব?’

‘আমাব নাম তো বাজা।’

‘বাজা যিনি, তিনিই তো গোপাল।’ যমুনা চোখ বুজিয়া কহিল। ‘সবাব মনেন উপব তাঁবই তো বাজত্ব। বৃন্দাবনে একদিন তিনিই বাখালদেব সঙ্গে বাঁশি বাজিয়েছিলেন।—তাঁবি খোঁজে তো অন্ধকাবে হাত্‌ড়ে মবচি, পাব তাঁকে কবে?’

‘শুনচো, বোষ্টুমি, তাকাও।’

‘কি বাজা?’ যমুনা চোখ মেলিয়া চাহিল।

‘তোমাদের এখানে অনেক আমগাছ আছে, না?—সবশুদ্ধ কতগুলো?’

‘অনেক আছে। সবই দেখাব তোমাকে। কত আছে বৈবিগী,

কতই আছে বটুমি, কত গাছ, কত মিঠে ছায়া, কত ফুল, কত গান।  
রাধেশ্যাম রয়েছেন সবার মধ্যে রাজারানীর মত—সব তোমাকে  
দেখাব।—তাব আগে আমিই তোমাকে ছু' চোখ ভবে দেখে নি। ওদেরও  
দেখাব, কিন্তু ওবা চিনলে হয়।' যমুনা বৈষ্ণবী বিমুগ্ধ বিন্ময়ে রাজাব  
দিকে তাকাইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

বাজা বিব্রত হইয়া কহিল, 'ধ্যোং, এমন করলে আমার লজ্জা কবে।  
ও বকম ক'বো না।'

যমুনা তাডাতাড়ি নিজেই সংযত কবিল। দীর্ঘশ্বাসেব মত কবিয়া  
কহিল, 'না, আব কববো না, গোপাল।'

যমুনা বাজাকে একেবাবে টানিয়া লইয়া বেড়াইল। আশ্রমেব এমন  
কেহ বাকি বহিল না, যাহাকে যমুনা বাজপুত্র না দেখাইল। কিন্তু অল্প  
কাহাকেও সে বাজাব সঙ্গে অস্তবঙ্গতা কবিতে দিল না,—বাজা যেন  
তাব নিজস্ব সম্পত্তি, এমনি গোবব এবং গর্কেব সঙ্গে বাজাব হাত ধরিয়া  
সে ফিবিতে লাগিল। তাব ভাণ্ডাবে যত কিছু খাবাব ছিল, বিগ্রহেব  
ভোগেব যা কিছু শ্রেষ্ঠ ছিল, সব আনিয়া সে বাজাব জন্ত জডো কবিল।  
বাজা থাইতে চায় না, কিন্তু যমুনাকে আজ কে বোধ কবিতে পাবে। সে  
আজ দুর্দাব হইয়া উঠিয়াছে।

কাণ্ড দেখিয়া আশ্রমেব প্রবীণ অব্যাক্ষ মথুবাদাস স্থিত হাশ্ব করিয়া  
কহিলেন—'যমুনাব আজ হলো কি? ওবে তোবা দেখ,—আমাব  
পাগূলি মেয়েটা যে পদ্মাব মতো পাগুলা হয়ে উঠেছে—'

'গোপাল?'

'ফেব।'

'বাজা।'

'কি?'

‘বল, আবার আসবে, আবার তুমি আসবে। এই শেষ নয়। একটু আশা আমাকে করতে দাও। বল আসবে—’

‘না।’

‘না।’ যমুনা স্তম্ভিত হতাশার সঙ্গে কহিল—‘নয় কেন? কি অপরাধ আমি কবলাম? সত্য বলতো, কি দোষ আমি কবেচি—সজ্ঞানে তো কিছু কবিনি, যদি—ওঃ! তোমাকে গান শোনাব বলেছিলুম, শোনাই নি—না? শুনবে? বল, কি গান আমি গাইব?—’

‘দূর, তা নয়। বাঃ বে, তোমাব একটুও মনে নেই বুঝি?’ বাজা হতাশ হইয়া কহিল। ‘আমাব আম কোথায়? সেদিন তো কতই কাঁচা আম পেড়ে দেবে বলেছিলে, একটাও দিলে কি?’

‘ও আমাব পোড়া কপাল!’ বলিতে বলিতে যমুনা উচ্ছ্বসিত হাসির বেগে একেবাবে গড়াইয়া পড়িল। কহিল, ‘আমি তো ভয়ে মরি, কেন জানি এতো রাগ!—কত আম তুমি নেবে, এই নাও।’—বলিয়া সে তন্তুপোষের নিচে হইতে ডালা ভব্টি ছোট ছোট কাঁচা আম বাহির কবিয়া আনিল।

এতগুলি কাঁচা শামল সুন্দর কচি কচি আম দেখিয়া বাজা খুসিতে প্রায় নাচিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিয়া উঠিল, ‘ঈস্, কী সুন্দর বে!—হি হি হি—এই আমি খুঁট মেলে ধবলাম, ঢেলে দাও—সব ঢেলে দাও—’

‘ও কি!’ হাসিয়া যমুনা কহিল—‘দূর, তুমি খুঁটে কবে’ নিতে যাবে কেন? তোমাব ছটো পকেট আজ ভব্টি কবে নিয়ে যাও—বাকি যা থাকবে, কাল ভোরেই আমি পৌছে দিয়ে আসব—আবও কুড়িয়ে নিয়ে যাব। না না, ছি ছি, বাজপুত্রকে আমি আম খুঁটে বেঁধে দিতে পাবব না—আমাব কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই, লোকে আমাকে বলবে কি?’

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই রাজাকে রাজি হইতে হইল। কিন্তু নিচের দুইটি এবং উপবেব একটি পকেট সে মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং দুই হাতে সাধ্যাতিবিক্ত আম তুণীকৃত কবিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করিল। ইহাও পর যমুনা বৈষ্ণবীকে পুনর্বার আসিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া তাব পক্ষে আব কষ্টকর হইল না। আব এক মিনিট সময়ও রুথা নষ্ট না করিয়া সে আখ্‌ডাব বাহিবে আসিল এবং দ্রুত বাড়িব দিকে ছুটিতে শুরু করিয়া দিল।

সন্ধ্যাব আব বেশি বাকি ছিল না। রাজাকে বিদায় দিয়া সেই অত্যাসন্ন সন্ধ্যাব ধূসব ছায়ায় আখ্‌ডার প্রবেশ-দুয়াবে হেলান দিয়া যমুনা বৈষ্ণবী একটা বিষন্ন উদাস-দৃষ্টিতে সমুখ দিকে চাহিয়া স্থিব হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। কিছুই যেন সে দেখিতে পাইতেছে না—ঘনায়মান সন্ধ্যাব মত তাব দৃষ্টিও ঝাপসা হইয়া আসিল। শুধু মনের মধ্যে বহুদিনবিস্মৃত একটা ক্ষীণ বাগিনীর লুপ্তপ্রায় একটু বেশ আসিয়া বাববাব উপস্থিত হইতে লাগিল—আখ্‌ডায় ফিবিবাব মত শক্তিও আব তার বজায় বহিল না।

## আট

দুর্গাপ্রসন্ন এক সময় রাজাকে একটা এয়াব-গান্‌ কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহাব বহুদিন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু সমুদয় পাখি এবং কাঠবিড়ালী অক্ষত থাকিয়া গেছে। এ-অবস্থায় বাজা যখন ছব্বা ছুঁড়িত তখন, গীতার নিষ্কাম কৰ্ম্মের গ্রায়, কোনও ফলেরই আশা করিত না। কিন্তু একদিন সহসা তাব গুলি লক্ষ্য বেধ করিল—ছোট একটা চডুই পাখি ঘুরিতে ঘুরিতে হাওয়াব মধ্যে চক্র রচনা করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র প্রাণীটাব বৃক্বেব মধ্য হইতে যখন রাঙা শোণিত ফিনিক্‌ দিয়া

বাহির হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র কোমল লোমগুলি যখন বস্ত্রে রঞ্জিত হইয়া গেল, একটা নিক্রপায় বেদনায় যখন সেটা ডানা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দুইটা দাপ্‌ড়াইতে লাগিল, তখন রাজার সমস্ত বীবত্বগর্ভ একেবারে জল হইয়া গেল ।

মনে মনে সে কহিল, 'দুব, এস্তোটুকু একটা পাখিকে আবাব মারতে আছে—না মাবলেই ভালো ছিল, কিচিবমিচিব কবে কতই খেলে বেডাত!—আর ওব যদি একটা মা থাকে, তবে তো আমাব পাপই হবে । মাবতে যদি হয়, বাঘ মারো, সাপ মারো, বুনা শূয়োব মাবো—ঘারা তোমার ক্ষতি করবে । ও-বেচারি আব কোন ক্ষতিটা কবত'—  
শুল্লি পাখি, মাহুঘের হাতে না মবলি, স্বর্গে ঘাবি, বেশ মজাতে থাকবি, কিচিবমিচির আর করতে হবে না, 'সুন্দব সব গান গাইতে শিখবি—  
মরেচিস্ তাতে ভয় কি, না ?'

রাজা ঠিক কবিল, চড়ুইয়েব বীতিমত একটা অস্ত্যোষ্টি করিবে, যাতে উহার স্বর্গলাভে আব কোনও বিঘ্নই না ঘটে । স্বর্গে যদি যাইতে পাবা যায়, তবে মবাটা যে অকিঞ্চিৎকব ও উপেক্ষাবই জিনিষ, বাজাব এই দর্শন আজিকার নয় । ওব মার মৃত্যুব পর হইতেই এই হৃদুট বিশ্বাসকে সে ঝাঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে ।

দুপুর বেলা । চাকরবাকরেরা পর্য্যন্ত কাজকর্ম সাবিয়া দিবানিত্রা উপভোগ করিতেছে,—শুধু বাজারই বিশ্রামের ফুরসৎ নাই । সমুখে তাহার কর্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে । দেশলাইয়ের বাস্কাটা হাতের তেলোব মধ্যে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে সে দালান হইতে বাহিব হইয়া আসিল । এখান হইতে খালের মধ্যপথে একটা চৌচালা ঘর ছিল—দালান সম্পূর্ণ হইবার আগে দুর্গাপ্রসন্ন সেইটাকে বৈঠকখানারূপে ব্যবহাব করিওন । তারই পিছনে তেঁতুলগাছটার তলায় রাজার প্রভাতের শিকার কচুপাতায় ঢাকা ছিল । রাজা সেইখানে আসিয়া থাকিল ।

পকেটেব মধ্যে হাত চালাইয়া কয়েকখণ্ড কাঠের টুকরা বাহির করিয়া আনিল এবং সেই কাষ্ঠসহযোগে পরিষ্কার করিয়া এক চিতাশয্যা বচন করিল—মায়েব চিতা রাজ্যব দেখা ছিল। অবশেষে পাতাব আচ্ছাদন হইতে পবম মমতাব সঙ্গে মবা পাখিটাকে বাহিব করিয়া আনিয়া চিতাব উপব শোয়াইয়া দিল এবং শুকনো পাতা দিয়া পুনৰায় তাকে ঢাকিয়া দিয়া মুখাঘিৰ ব্যবস্থায় উত্তোগী হইল।

কিন্তু মুষ্কিল হইল দেশলাই জ্বালান লইয়া; আংশিকভাবে দেশলাইট। পুৰান হওয়াব দরুণ এবং আংশিক ভাবে বাতাসের দৌবাভ্রাতে কাঠি আব কিছুতেই ধবান যায় না। বাজা কাঠিব পর কাঠি ঘষিতে লাগিল—মুখ বিকৃত কবিয়া, ক্রোধে ঠোঁট কামড়াইয়া যতই সে অধ্যবসাযের একশেষ হইল, দেশলাই ততই অদ্ভুত কৌতুকে মুখ গম্ভীৰ কবিয়া বহিল—একটু ঝিলিকমাত্র দিল না। কিন্তু বাজাও নাছোড়বান্দা, একটা কাঠি সে খোলে, দেশলাইয়েব গায়ে প্রবল জ্বোবে ঘষিয়া দেয়, এবং তাহা না জ্বলায় ক্রোধেব সঙ্গে ঘবেব বেড়ার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া নতুন কাঠি বাহির কবিয়া প্রাণপণে ঘষাইতে আবন্ত কবিয়া দেয়।

উত্তোগী পুরুষসিংহেব লক্ষ্মীলাভ সম্বন্ধে একটা কথা আছে, বাজাব ক্ষেত্রেও তাহা ফলিল। সহসা একবার দেশলাইয়েব বারুদ মৃদুগুঞ্জন কবিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শুকনো পাতায় আগুন ধবাইয়া দিতে রাজা একটুও আর দেবি করিল না। এক নিমেষে মবা পাতাগুলি বড়িন মহোৎসব শুরু করিয়া নৃত্য কবিত্তে লাগিল—বাজাব আর আক্ষেপ বহিল না। একটু দূবে গিয়া দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া হাত জোড় কবিয়া সে প্রার্থনা কবিত্তে লাগিল—‘ভগবান, ওকে তোমাব কাছে স্বর্গে নিয়ে যাও। ও ভারি লক্ষ্মী পাখি,—কাউকে কিছু বলে না, শুধু আপন মনে কিচিরমিচির করে’ খেলে বেড়ায়।’

সহস্র। আগুনের ঝাঁজটা বড় বেশি উগ্র মনে হইল। পাতাব উপর ঘে-আগুন নাচিতেছিল তাব চাইতে বহুগুণ অধিক এক অগ্নিশিখাৰ আভা আসিয়া মুদ্রিত চোখেব মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। রাজা তাডাতাড়ি চোখ মেলিয়া ঘবেব দিকটায় চাহিল, এবং এক মুহূর্তে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, ঘবেব এদিককাব বেডাব নিচে একবাশ আগুন জলিয়া উঠিয়া উন্মাদেব মত উপবেব দিকে ছুটিতে আবস্ত কবিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহা বেডাব সমস্ত দৈর্ঘ্য আবেষ্টন কবিয়া ফেলিল—সাপের ফনাব মত অগ্নিশিখা উদ্ধতরোষে বাঁশেব বেড়ায ছোবল মাঝিতে লাগিল। মাটি হইতে ছাড়া পাইয়া যেন সহস্র দৈত্য লাফাইয়া উঠিয়াছে—তাহাদেব লোলুপ জিহ্বা হইতে ফুলিঙ্গেব পব ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিতেছে। বাঁশের গিঠ-গুলি বন্দকেব গুলিব মত সশব্দে ফাটিতেছে, সমস্ত বেড়া অগ্নিজ্বালে ছাইয়া গেছে।

রাজাব মুখ দিয়া কথা বাহিব হইল না, চিংকাব কবিতে গেল, দেখিল গলা দিয়া শব্দ বাহিব হইল না। তখন চোখ বুজিয়া প্রাণপণে সে বাড়িব দিকে ছুটিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া সাবা বাড়িব লোক সেদিকে ছুটিল। গমস্তা অম্বিকা-চরণ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অপবাপর সকলকে হাবাইয়া দিয়া ছুটিতে ছুটিতে চিংকার কবিতে লাগিল—‘ওরে বালতি আন, জল আন, আগুন, আগুন।’ দুর্গাপ্রসন্নও বাজাব ভীত চিংকার শুনিয়া বাহিবে আসিয়া পড়িলেন এবং ইন্দিব ঠাকরুণ ছুটিতে ছুটিতে বিলাপ শুরু কবিলেন—‘ওরে আমার সর্বনাশ হইল বে—কোনু পাপে এমুন হইল বে—বৌমা, তোমার সোনাব সংসার আমাব হাতে পুইডা ছাই হইল গো—’

একাধিক পাঁচিল, ঘব ও দালানের বাধা ডিঙাইয়া তবে সেই পুবাঁতন বৈঠকখানা ঘরের কাছে যাওয়া যায়। অম্বিকাপ্রমুখ সকলে যখন অকুস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন বিশ্বয়ে সবাই হতবাক হইয়া গেল। দেখিল,



একদিকের হৃদীর্ণ বেড়ার সমস্তটা মাটিতে কাৎ হইয়া পড়িয়া তখনও স্থানে স্থানে জলিতেছে, কিন্তু সাবা ঘরেব তর কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নাই। যেন কে একজন মহা বলবান ব্যক্তি একদিকেব সমস্ত বেড়াটা আলগোছে তুলিয়া লইয়া এদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে—অগ্ন্যাগ্ন বেড়াতে যাতে আগুন লাগিতে না পারে, সেদিকে তাব হুঁসিয়াবিব দক্ষণ সাবা ঘর জলিয়া উঠিতে পাবে নাই। অথচ আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, একটা জন-প্রাণীবও চিহ্ন দেখা যায় না। পোড়া বেড়াটাতে আগুনের যতটা আধিপত্য দেখা গেল, তাহাতে বিশ্বয়েৎ আব অস্থ থাকিল না এই ভাবিয়া যে, কোন্ অদ্ভুত উপায়ে বাড়িটা রক্ষা পাইল—অগ্ন্যাগ্ন বেড়ায় আগুনের ছোঁয়াচ লাগিল না কেন? কোন্ অত্যদ্ভুত উপায়ে তাবের বাধনগুলি খুলিয়া স্ববিশাল এই বেড়া এতটা দূবে ছিটকাইয়া পড়িল? এই আশ্চর্যজনক ঘটনাব কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেহই পায় নাই, বাজ্ঞাও নয়। সে শুধু এইটুকু দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, তাব পাখিটাব দাহকর্য্য বেশ ঘটা কবিয়াই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ওব স্বর্গপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আব কোনও সন্দেহ থাকাই উচিত নয়।

কিন্তু এই ঘটনাব পবে এবং এই উপলক্ষ্যে কতকগুলি মনুষ্য বাজ্ঞাকে অত্যন্ত বেশি বকম প্রভাবান্বিত কবিয়াছিল। শিশুব মধ্যে যে মবমী চিববিবাজমান, তাব নিকট এগুলিব মূল্য কম নয়।

সদব-গমস্তা অঙ্গিকাচরণ বুড়া নায়েবমশাইকে এ-সম্বন্ধে বলিতেছিল, 'বড ছবস্ত ছেলে, আগুনটা জোব কবে ধবলে এই দালানটাই কি বক্ষা পেত, মনে কবেন—উন্টো দিকেব জোর হাওয়ায় আগুন এ-অবধি টেনে এনে ছাড়ত।—তবে আশ্চর্য্য বলতে হবে, একটা সাবা বেড়াময় আগুন ধবে উঠল, অথচ ঘবের অগ্ন কোথাও একটু আঁচড পর্য্যন্ত লাগল না। আব বেড়াটাই বা অমন করে' খসে দূবে ছিটকে পডল কেমন করে? জনমানুষ তো একটাও চোখে পডল না। আব যদি মাহুষেই কবে'

থাকে, তবে সে পালিয়ে যাবে কেন, গরু কবে' দাঁড়িয়ে থাকত—ছোট-লোক হলে বখশিশ আদায় কবে' ছাড়ত।'

বৃদ্ধ নায়েব গভীবন্ধরে জবাব দিয়াছিলেন, 'এমনি কবেই ভগবান শিশুব সঙ্গে খেলা কবেন, অম্বিকা।—ঐ তো তাঁব আনন্দ।'

বাজা এই কথাগুলি আডালে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল। শুনিয়া এক অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত পুলকে সে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান। সত্যই তো ভগবান।—শুধু চোখে দেখতে পাওয়া গেল না—এই যা দুঃখ।

তার বাবাকেও সে একদিন এ-সম্বন্ধে পিসিমাব কাছে মস্তব্য কবিত্তে শুনিতে পায়।—'ঘব-ভাঙ্‌বাব প্রবৃত্তি ওব বক্তেব মধ্যে আছে, দিদি, পুড়ে যে সব শেষ হয়নি, এ ভগবানেবই ইচ্ছা।—নইলে অমন আগুন এমন কবে' থেমে যায়?—এ যেন তিনি আপনি এসে নিজ হাতে নিবিঘে দিয়ে গেলেন, শিশুব সঙ্গে অদ্ভুত খেলা খেলে গেলেন।'

ইন্দিব ঠাকুবাগী অসীম স্নেহেব সঙ্গে কহিলেন, 'অখন ভগবান বাঁচাইয়া বাখে, তবে না।—রাখব—যেমন এইবাব বাখল, এমন কইবাই বাঁখব।'

ইহাব পব প্রায় একটা সপ্তাহ গত হইয়াছে। সেদিন বিকালে বাজা জেলেপাড়ার দিকে রওনা হইয়া পড়িল। উদ্দেশ্য, মাণিকেব সঙ্গে দেখা কবিয়া পদ্মায় মাছ ধরিতে যাওয়াব বিষয়ে একটা পাকাপাকি কবিয়া আসিবে। এমন ফাঁকি দেয় মাণিকটা—এ-ছুতায় ও-ছুতায় বাজাব অমন সঙ্গত প্রস্তাবটা এড়াইয়া চলে। রাজা আজ ঠিক করিয়াছে, মাণিককে ঘাইয়া বলিবে যে, বাবা ঘাইতে অনুমতি দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মাণিক রাজাকে নীচ্র একদিন না লইয়া গেলেই ববং তাঁব রাগ হইবে।

বড় সড়ক ছাড়িয়া রাজা জেলেপাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরিল। বা-দিকে

কিছু দূবে চোখে পড়িতেছে মুণ্ডেশ্বরীর বাগান। অমাবশ্যা রাত্রে এই বাগানেব দুই প্রান্তেব দীর্ঘ দুইটা তালগাছে পা দিয়া মুণ্ডমালিনী কালীকে নাকি এখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। ‘আজ্ঞাবি।’—বাজা মনে মনে বলে। ‘মা কালীর খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই।’

কিন্তু মুণ্ডেশ্বরীর বাগানটা গ্রামবাসীদের কাছে একটা মহা আতঙ্কের স্থান। ঘনসন্নিবিষ্ট আমবাগানের মধ্যে মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরটা এখন একটা ভক্তিহীন ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই স্তূপ ফুঁড়িয়া একাধিক অশ্বখ এবং বটগাছ ক্রমেই ক্ষীতকাষ হইয়া উঠিতেছে। নিচেই কচুবি এবং শ্রাওলায় আচ্ছন্ন একটা ডোবা পুতিগন্ধ বিস্তার কবে। ইহা নাকি একসময় স্নবহং দীঘি ছিল—ক্ষটিকেব মত স্বচ্ছ জলে মুণ্ডেশ্বরীর স্নন্দর মন্দির ইহাতে সততই প্রতিফলিত হইত। কত লোক ইহা হইতে জল লইত, কত লোক স্নান করিত—ঘণ্টা এবং বাঙেব শব্দ জলবাশিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত আমবাগান মুখবিত কবিয়া বাখিত। যাহা অতীতেব গৌবব ছিল, ভক্তিতে এবং প্রাণেব উচ্ছ্বাসে যে-দেবায়তন এককালে স্পন্দমান থাকিত, আজ তাহা গ্রামেব আতঙ্কেব বস্তু। সবস্বতী পূজাব সময়ে ইস্কুলেব ডানপিটে ছেলেরা এখানে পলাশফুল সংগ্রহ করিতে আসে—আব কেহই আসে না, আসিবাব প্রয়োজনও হয় না। জেলেবা ছাড়া এ-পথ দিয়া চলিবাব অণু কাহাবও প্রয়োজন হয় না এবং জেলেবাও অধিকাংশ সময়ে খালেব পথেই যাতায়াত কবে।

শিশু দিতে দিতে বাজা মুণ্ডেশ্বরীর বাগানেব কাছ দিয়া আগাইয়া চলিল।—এই বাগানে নাকি ভূত থাকে। ভূত কেমন হয়, রাজার বড়ই দেখিতে ইচ্ছা, আবাব ভয়ও কবে। মুণ্ডেশ্বরীর বাগানে একদিন মাণিককে সঙ্গে লইয়া আসিতে পাবিলে মন্দ হইত না। পবম কৌতূহলেব সঙ্গে বাজা গভীর জঙ্গলেব মধ্যে মুণ্ডেশ্বরীর ভগ্নস্তূপ দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছুই চোখে পড়িল না। সে বরাবর হাঁটিয়া চলিল।

মাণিক্বেব দেখা পাওয়া গেল না। বটতলির হাটে সে মাছ বেচিতে গিয়াছে, হুতবাং বাজাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের কাছ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বাজার গা'টা একটু ছুঁছুঁ কবিতে লাগিল।—সত্যি, কী আছে এই বাগানেব মধ্যে? কেন লোকেরা এব ভিতবে যায় না? গেলে কি হয়? ভূত কি সত্যিই আছে? বাবা বলেন, ভূত যদি থাকেও, তবু আমাদের চোখ দিয়া ভূত দেখা সম্ভব নয়; অনিষ্ট কবিবাব শক্তিও ভূতের কিছু নাই। আব ভূত যদি সত্যিই দেখা যায়, তবে কেমন দেখিতে হইবে?

সহসা চম্কাইয়া বাজা দেখিল, কখন সে দুর্বাচ্ছন্ন অসমতল পায়ে-চলা পথ ধরিয়া মুণ্ডেশ্বরীর বাগানেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছে, টেবই পায় নাই। অদূবে একটা ইঁটের পাজা দেখা যাইতেছে—হয়তো এমিই মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির। তার নিচেই হাজিয়া-ঘাওয়া, ঘাস ও দামে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন একটা দীঘি। এক মুহূর্ত্তে বাজা দুই চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সর্বনাশ! কেমন করিয়া, কোন্ পথে সে এই ভয়ঙ্কর বাগানেব মধ্যে আসিয়া ঢুকিল? কোথায় ছিল তাব চোখ, কোথায় ছিল তাব বুদ্ধি! অ্যা, ভূত! ভূত! যন্ত্রচালিতেব মত বাজা মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরেব ভগ্নস্তূপের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিল। ছুটিয়া ফিবিয়া পালাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কে যেন একটা লোহার শিকল দু'পায়ে পবাইয়া দিয়াছে এবং সেই শিকল টানিয়া তাহাকে কাছে আকর্ষণ কবিয়া লইতেছে। অত্যন্তুত পরিশ্রমে রাজাব কপাল দিয়া টম্‌টম্‌ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং ভগ্নস্তূপের নিকট সে যে কখন গিয়া বসিয়া পড়িল, নিজেই টের পাইল না।

কারা সব ও-দিক হইতে আগাইয়া আসিতেছে? চতুর্দিক হইতে

যেন সহস্র সহস্র অশবীরী আত্মা একটা জীবিত মনুষ্যেব সঙ্গ পাঠিবাব  
জগৎ অন্ধকাব বাগানেব সংখ্যাহীন গোপন আবাস হইতে প্রাণপণ ছুটিয়া  
আসিতেছে। সহসা একটা ডাল মডমড কবিয়া ভাঙিয়া পড়িল, এবং  
যেন অদৃশ্য বহুজনেব মিলিত পদশব্দে শুকনো পাতাবা মুখব হইয়া উঠিল।  
একটা প্রবল বাতাস ছুটিয়া আসিয়া ভগ্নস্তূপেব ছিদ্রগুলির মধ্যে হি হি  
কবিয়া অটুহাসি শব্দে কবিল।

হাটু দুইটা বুকেব মধ্যে গুঁজিয়া বাজা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।  
চোখেব দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপ্সা হইয়া উঠিতে লাগিল। ভয়ে আর সে চোখ  
মেলিতে পাবিতেছে না। শুধু নিজেব মধ্যে সাহস আনিবাব আপ্রাণ  
চেষ্টা করিয়া কহিতে লাগিল—‘বেশ তো, ভূত দেখা গেলে ভালই তো—  
আমাব মাও তো এখন ভূত—মাকে দেখলে তো মজাই—কতদিন যে  
দেখিনি। বেশ তো—’

বাজা চোখ মিটিমিটি কবিয়া চাহিল। অস্পষ্ট অন্ধকাব ক্রমশই  
দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতেছে। বাজা উঠিতে চেষ্টা কবিল, পাবিল না, ইটোব  
স্তূপে কনুই ভাব কবিয়া কোনও প্রকাবে সে অবসন্ন দেহটাকে খাড়া কবিয়া  
বাগিল। কে যেন চুপিচুপি শুধুই পবামর্শ দিতে লাগিল—আব কেন,  
শুইয়া পড়, জাগিয়া থাকিয়া লাভ কি। শুইয়া পড়

অকস্মাৎ অতি সুস্থ সাহসিক একটা শব্দ বাজাব কানে প্রবেশ  
কবিল। শব্দ লক্ষ্য কবিয়া বাজা দূবেব তেঁতুলগাছটাব দিকে চাহিল।  
পলকে দুই হাতে সে চোখ ঢাকিল। স্পষ্ট দেখিয়াছে—একটা অশবাবী  
কালো ছায়া অদ্ভুত নাকী শব্দ কবিতে কবিতে সক্র সক্র দীর্ঘ পা বাড়াইয়া  
এক ধাপ এক ধাপ কবিয়া কাছে আগাইয়া আসিতেছে। বাজা সে শব্দ  
কানে শুনিল, মূদ্রিত ঋগি-পল্লব অশবাবী মূর্ছিক আটকাইতে পাবিল না।  
ভয়ে বাজা মুচ্ছা যাইবাব উপক্রম হইল।

সহসা বৃদ্ধ নায়েব-মশায়েব কথাটা তাব মনে পড়িয়া গেল—‘এমনি কবেই

জগদ্বান 'শিশুর সঙ্গে খেলা করেন, অধিকা।—ঐ তো তাঁর আনন্দ!' ইহা যেন মস্তুর মতো কাজ করিল; এই ভয়াল আবেষ্টনের গহন অন্ধকার ও রহস্যকটকিত বনস্থলী চমকিত করিয়া সহসা রাজা উচ্চহাস্য কবিতা উঠিল—'কিছু না, ভগবান, কিছু না—সব তোমার চালাকি—আমি সব বুঝতে পেরেছি।'—হি হি করিয়া বাজা কেবলই হাসিতে লাগিল। কৌতুক এবং ভয়েব সংমিশ্রণে এক বিচিত্র হাস্য।

হি হি হি—ছেদনীন, সমাপ্তিহীন হাসি।

জেলেপাড়ার দিক হইতে ক্রমশ একটা সঙ্গীত অগ্রসব হইয়া আসিতেছিল। শীঘ্রই গানের পদগুলি পর্য্যাপ্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল—'ও মন-মাঝিবে তুই আমাবে ভবপাবে লয়ে চল্!'

রাজা প্রথমই অন্তর্যমান কবিষাছিল, গলা শুনিয়াই চিনিতে পাবিল এ মাণিক ছাড়া আর কেহ নহ। এবার সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং প্রাণপণে চিৎকার কবিতা ডাকিতে লাগিল—'মাণিক, মাণিক, আমি বাজাবাবু—ছোটকর্তা—মুণ্ডেশ্বরী বজলে এসে পড়েছি, তুই এসে নিয়ে যা তো আমাকে—ও মাণিক—'

'ও মন-মাঝিবে তুই আমারে ভবপাবে লয়ে চল্—'

মাণিকের গান থামিল না। বাজা বুঝিল, সে শুনিতে পায় নাই। গলায় যতটা শক্তি ছিল সমস্ত সংগ্রহ কবিতা সে চিৎকার কবিতা লাগিল। অতঃপর মাণিকেব গান থামিয়া গেল। কতক্ষণ চুপ থাকিবাব পর তাব হাঁক শোনা গেল—'কে ? বাগানে কে কথা কয় ?'

রাজা সচিৎকারে কহিল, 'আমি, বাজাবাবু, ছোটকর্তা—তুই শীগগির আয়—আমাব ভয় কবছে।'

'ছোটকর্তা। দূব।—হ, আমি বুঝি আব তোমাগো কৌশলটা বুঝি না। ভুলাইয়া কাছে নিতে চাও।—মাণিক-মাঝি অত কাঁচা ছাওয়াল কিনা

‘—ছোটকর্তা না হাতী—ছাই পড়ুক, ছাই পড়ুক তব মুখে।’

‘আরে না, না—আমি সত্যই আমি। আমিই রে, আমি ভূত না।’

‘এইতে কি আব মাণিক-মাঝি ভোলে—হক্কল ভোলুই আমি জানি—মাঝিব ছাওয়াল না? কও দেখি—বাম বাম।’

এই বিপদের মধ্যেও বাজাব হাসি পাইল। বলিল—‘হি হি হি—বাম বাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বাধাকৃষ্ণ, দুর্গা—আব কত শুনিবি। দূর ভীক, আমি ছোটছেলে হয়ে এখানে আসতে পেবেচি, আব বুড়ো-ধাডী তুই ভয় পাচ্ছিস?’

বাজাব কণ্ঠস্বর চিনিতে পাবায়, এবং সর্কাপেক্ষা বেশি, তাহাকে রাম নাম উচ্চারণ কবিত্তে শুনিয়া মাণিকেব প্রত্যয় হইল। হাঁক দিয়া কহিল, ‘ওঃ, তুমি নি, ছোটকর্তা? দাডাও, আমি আইলাম।’

মাণিক ছুটিতে ছুটিতে বাগানে ঢুকিল। কিন্তু বাজাকে ইটের স্তুপেব কাছে স্পষ্ট দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইল না—তাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব প্রতি সন্দেহপর দৃষ্টি বুলাইয়া এবং অবশেষে মাটিতে তার ছায়া দেখিয়া তবেই সে নিকটবর্তী হইল।

বাজা বাগিয়া কহিল—‘যা ভীক তুই মাণিক, ভয়েই মরিস্।’

মাণিক কহিল—‘এই কি কাণ্ড কবচ, ছোটকর্তা।’ মুণ্ডেশ্বরীবা বাগানে জুয়ানমর্দও দিনছপুইবে একলা ঢুকতে সাহস পায় না—আব তুমি এই গহিন্ বাত্রে কবচ কি—ঐ্যা? আবে সর্বনাশ।—এইখানে যে দানাদৈতি, ভূতপেত্ভীব মহোচ্ছব।—’

বাজা সগর্বে কহিল, ‘হলোই বা, ভূত দেখতেই তো এসেছিলাম, দেখেওছি। ঐ তেঁতুলগাছটা থেকে নেমে, বুঝলি—’

‘খাউক, খাউক, কর্তা,—আগে ভালষ ভালষ বাগানের বাইবে চল।’

হাত ধবাধবি কবিষা তাহাবা মুণ্ডেশ্বরীবা বাগান হইতে বাহিব হইয়া আসিল।

## নয়

দুর্গাপ্রসন্নের শরীর ভাল যাইতেছিল না। তবু কিছু তাঁব উৎসাহের এবং পরিশ্রমেব বিবর্তি নাই। কোটালনগবন্ধে তিনি স্বপ্ন-নগর কবিতা তুলিবেন, জগতকে তাক লাগাইয়া দিবেন; শ্রদ্ধা এবং কল্পনা থাকিলে জগৎকেও কত সুন্দর কবিতা গডিয়া তোলা যায়, তাহা দেখাইবেন। লোকেবা সম্মুখে বলিল—ধন্য, ধন্য ক্ষমতা, ধন্য বদান্যতা। এবং আডালে বলিল—পাগল, পাগল, আস্ত পাগল। কিসের নেশায়, কোন্ উদ্দেশ্যে, কি আক্রোশে দুর্গাপ্রসন্ন এই অদ্ভুত সৃষ্টিকার্য্যে মাতিয়াছেন, বাহিবেব লোক তাব কিছুই জানিলনা। তিনি অর্থিব মায়া করিলেন না, শবীবেব মায়া কবিলেন না,—এক দুর্নিবাব শক্তিতে নতুন পৃথিবী গডিতে লাগিলেন।

হৈমন্তী লিখিয়াছে—অম্বিকাদাব চিঠিতে জানিতে পাবিলাম, তোমাব শরীর তেমন ভালো যাইতেছে না। শুনিয়া আমবা অতিশয় চিন্তিত হইলাম। উনি বলিলেন যে, এ অবস্থায় আমাব অবশ্য যাওয়া দবকাব। যদিও এখন কতগুলি জরুবি মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ত আছেন, তবু বলিলেন যে, পাঁচ-সাত দিনেব মধ্যেই একবাব সময় করিয় আমাকে কোটালনগবে পৌছাইয়া দিয়া আসিবেন। আমাব চাইতে তোমাদেব জামায়েব উৎসব কম নয়, উনি বাববাব বলিতেছেন যে, আমি গেলে তোমাব আদব-বস্ত হইতে পারিবে। অসুস্থ শবীরেব পক্ষে সেবাব প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। আশা কবি, বাজা ভাল আছে, আমাদেব একমাত্র ভয়, ও একেবারে গেঁয়ো না হইয়া ওঠে। উনি তো প্রত্যহ একবাব কবিতা ওকে এলাহাবাদে লইয়া আসিবার কথা বলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

‘বাজা, তোর দ্বিদি আসচে যে রে।’ দুর্গাপ্রসন্ন রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন।



‘দিদি! ধোং! কবে?’ বাজাব দুই চোখ সামান্য অবিশ্বাস এবং প্রকৃত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

‘এই আট-দশ দিনেব মধ্যেই।’ হুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

‘ফাঁকি দিচ্ছ না তো?’ বাজা এক গাল হাসিয়া কহিল,—‘ঈস, কী মজা। কতদিন দিদি আসে না, না বাবা? জহব আব মিলিও আসবে তো? হি হি হি,—ভাবি মজা হবে তো। মিলিটা বলে—মাম্ মা—এখন বড হয়ে গেছে, না?—’

‘তা হয়েছে বৈ কি।’

‘লিখে দাও না, বাবা, আট-দশ দিনেব আগেই আসুক, নইলে কাঁচা আম আবাব সব ফুরিয়ে না যায়। আম কুবে’ কুবে’ দিদি যা চমৎকার মাখতে পাবে।’

ইহাব পব বাজাকে বাড়িতে ধবিয়া বাখা অসম্ভব হইল। আশে-পাশে ঘাহাকেই সে পাইল, তাহাকেই এমন উৎসাহেব সঙ্গে এই অভাবনীয় সংবাদটা বিবৃত কবিয়া শুনাইল যে, ব্যাপাবটা প্রায় বোধগম্য হইল না। দাবাগ্নিব মত বাজা এ-পাডায় ছুটিল, ও-পাডায় ছুটিল—তাব দিদি আসিবাব অমূল্য সংবাদটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে একটু মাত্র বিলম্ব হইল না।

‘জানিস, আমাব দিদি আসবে—জামাইবাবুব সঙ্গে। জামাইবাবু ব্যাবিস্টেব সাহেব। আব জহব আব মিলি না, সাবাক্ষণ কেবল—মামা, মামা। দেখবি অখন দিদিকে,—যা কর্শা দেখতে, দেখিস অখন।’

‘শুনচেন, আমাব দিদি না, এই আট-দশ দিনেব মধ্যেই এসে পড়বে, এবার ঠিকই আসবে, দেখবেন। জামাইবাবু ব্যাবিস্টেবি চাকবি কবে কিনা, তাই—’ ব্যাবিস্টেবি চাকবি কবে, এই কথাটা জানাইয়া দিবাব জগ্গই ব্যাবিস্টেব কথাটাব আমদানি কবিয়াছিল, তাই কি তাহা ঠিক বকম সংগ্রহ কবিতে না পাবিছা কহিল—‘তাই আসতে পারে না। তবে

এবার আসবেই লিখেচে। জহব আব মিলি কেবলি বলে—মামা, মামা—’

সেদিন বিকালে বাজা খালপাড়ে হাঁটিতে গিয়াছিল। উৎসুক আগ্রহেব সঙ্গে নৌকার পব নৌকা লক্ষ্য কবিবাব পব সে সম্পূর্ণ হতাশ হইল—একটামাত্রও ঘোমটা-টানা বউ দেখিতে পাইল না। ঝাঁকি-জাল দিয়া ক’টা লোক মাছ মারিবাব ফন্দিতে ছিল, কিন্তু মাছেবা বুদ্ধি-খবচ কবিয়া জালগুলি এড়াইয়া গেল। তাই ওদিকেও বাজাব আকর্ষণ রহিল না।

খালেব জলে পাড়েব গাছপালাজঙ্গলেব ছবি অপূর্ব সুন্দর হইয়া কাঁপিত থাকে; নলখাগড়া বনেব কাছটায় দু’একটা বক ধার্মিকেব মত বাঁসয়া মহ-জপ কবিতে থাকে—একটা মাছ ঠোটে ধবিয়া উড়ান দিলে তবে তাদের চেনা যায়, এমন চালাক।—বাজা মনে মনে বলে। আব এই যাবা নৌকাব দাঁড বাহিতে বাহিতে সুর উঠায়, বাজাব বড ভাল লাগে তাদের। ওদেব গান শুনিলে মন যেন হ-হ কবিতে থাকে, ওদেব সঙ্গে অনেক দূবেব সব দেশে যাইতে ইচ্ছা হয়—নদী আব সমুদ্রেব সুর যেন এই গানগুলিব সঙ্গে জড়ান আছে, মনটা কেমন করিয়া দেয়। এই অপূর্ব ধূসব পথ দিয়া ঘোমটা-টানা বউয়েবা কোন্ বহুস্তর দেশে যায়?

সমবেত ক্লাবিওনেট, ফুট, পাখোয়াজ এবং তব্লা প্রভৃতিব ঐক্য-তানে সহসা রাজার চমক ভাঙিল, ভাটিয়ালি লজ্জিত হইয়া দূবে পলায়ন কবিল, এবং রাজা বুঝিতে পাবিল, মিলনীতে থিয়েটারেব মহড়া শুরু হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে অবশ্য আগেই সে সংবাদ পাইয়াছিল, কিন্তু মোশান-মাস্টার নটুবাবুর ব্যবহার সম্বন্ধে ইচ্ছুলেব সহপাঠীদের কাছে যে রিপোর্ট পাইয়াছিল, তাহাতে ওদিকে দু’মাবিতে বড বেশি একটা

ভবসা পায় নাই। কিন্তু এই অপূর্ণ ঐক্যতান শ্রবণ করিয়া তাব পক্ষে ধৈর্যধারণ কবা আব সম্ভবপব হইল না—মিলনীব দিকে সে সকৌতুহলে অগ্রসব হইল।

মোশন-মাস্টাব ও অভিনয়-শিক্ষক নটুবাবু একজন কম যোগ্য লোক নয়। জীবনে তিনি বহু স্থানে বহুবাব অভিনয় কবিয়া যেমন দক্ষতা তেমনি অভিজ্ঞতা অর্জন কবিয়াছেন। একাদিক শতের অভিনয় পরিচালনা কবিয়া সহবে নাকি তিনি রীতিমত নাম কিনিয়া আসিয়াছেন, এবং শুধু তাহাই নয়, একসময় কলিকাতাব পেশাদারি থিয়েটারে গেটে দাঁড়াইয়া টিকিট পর্য্যন্ত সংগ্রহ কবিতেন। এত সকল কৃতিত্বেব পব তিনি যে মিলনীব-ক্লাবেব অভিনয়-সম্প্রদায়েব পাণ্ডা হইয়া বসিবেন, তাহাতে বিশ্বয়েব কিছুই নাই। তাব অপবিসীম জ্ঞানে এবং দক্ষ পরিচালনায় ‘চন্দ্রগুপ্তেব’ অভিনয় যে অভিনয়-কলাব চবম্, উৎকর্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাতে কাহাবও সন্দেহমাত্র নাই।

কিন্তু নটুবাবুব কাজ সহজ নয়। প্রথম হইতেই চন্দ্রগুপ্ত সাজিবাব জ্ঞান অভিনেতাদেব মধ্যে যেমন কাডাকাডি পড়িয়া যাব, নন্দ সাজিবাব জ্ঞান তেমনি লোকেব অভাব হয়। এত অভিজ্ঞতা সবেও ইহা নটুবাবুব নিকট পরম বিশ্বয়কব মনে হইল, কেননা, সহবে সে দেখিত চাণক্য সাজিবাব জ্ঞানই যত মনোমালিগ্নের সৃষ্টি হয়,—একটু বোকাটে গোছেব লোক ছাড়া চন্দ্রগুপ্ত সাজিবাব জ্ঞান অগ্গদেব কখনও বিশেষ আগ্রহ সে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কোটালনগবেব অতি-অতি বুদ্ধিমানদেও চন্দ্রগুপ্তেব জ্ঞান এই লোলুপতা দেখিয়া সে ভাবি বিশ্বয় বোধ করিল, ঝাঁকুড়া চুল দোলাইয়া কহিল—‘আহা হা—এব জ্ঞান আব ঝগুড়া করছেন কেন! চন্দ্রগুপ্ত তো আব এখন রাজা নয়, নন্দই রাজা। চন্দ্রগুপ্ত মোটেই বাজা হবে কিনা, সবই নির্ভব কবচে ঐ আপনাব চাণক্য পণ্ডিতের ওপব। চাণক্য যদি একবাব বৈকে বসে, তবে নাও হ’তে পাবে—’

শুধু কি তাই। মোশন টিক করিয়া দেওয়া কি চাটখানি কথা। উপযুক্ত ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে কাতাবও কি ছাই কিছু জ্ঞান আছে। ‘পশ্চার’ দেখাইতে দেখাইতে নটুবাবু মেহন্নতের একশেষ হইল। তবে তাব উদ্দেশ্যটা এই যে, শিক্ষাদানে কৃতিত্ব দেখাইয়া দুর্গাপ্রসন্নকে মোহিত করিয়া ফেলিবে এবং অভিনয়-শিক্ষকের একটা স্থায়ী পদ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইবে। অবশ্য তাব পরিশ্রমেব কথাটা ভাবিয়া দেখিলে সংকল্পটা এমন কিছু দৃশ্যনীয় মনে হইবে না, এবং অভিনেতাদের অজ্ঞতা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে।

কাত্যায়নের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নটুবাবু হতাশ হইল। কহিল—‘শুনচ, গদাধব, এ কি যা-তা কবচ। অভিনয় কবা একটা সহজ কথা নয়, রীতিমত মাথা খাটিয়ে পার্ট কবতে হয়। অমন গদগদ স্ববে বলচ—পানিনি বলেছেন—। অমন কাঁদকাঁদ হয়ে পানিনিব নাম বলে ধমক খেয়ে মরবে যে। গর্কেব সঙ্গে বলবে, তবেই যদি চাণক্য পণ্ডিতের শ্রদ্ধা হয়—’

গদাধব কিন্তু মোশন-মাস্টারের এই অগ্রায় নির্দেশ মুখ বুজিয়া বরদাস্ত করিল না। কহিল, ‘গদগদ কইবা বলতাছি, তাতে দোষটা হইল কি? নিজেব ইস্ত্রীর নাম হক্কেই অমুন কইবা কয়—’

নটু আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—‘ইস্ত্রী। পানিনি?’

গদাধব কহিল—‘না তো কি? নাইলে আব চাণক্য পণ্ডিত অত চইটা উটব ক্যান? নিজেব ইস্ত্রী নাই কিনা, তাই পবেব ইস্ত্রীব নাম সইছ কবতে পাবে না। এইতো একেবে পষ্ট বোঝান যায়—’

নটু বাৎসব ঢোঁক গিলিয়া তবে নিজেব কণ্ঠস্বরের উপর দখল পাইল। কহিল—‘স্ত্রী। আরে গর্দভ, পানিনি একজন জ্যোতিষী। হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারত। তাব নিজের হাতের লেখা পুঁথি পর্যন্ত আমি কলকাতার যাদুঘরে দেখে এসেছি ’

গদাধব গজরু গজরু করিতে লাগিল। স্ত্রী হইলেই সে বেশি পছন্দ করিত এবং অভিনয়ও টের সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী হইতে পাবিত। কিন্তু যে স্বচক্ষে সেই জ্যোতিষীর পুঁথি দেখিয়া আসিয়াছে, তাব কথা অবিশ্বাস কবিস্বার উপায় কি। কাঞ্চৈ চাণক্যেব নিকট পানিনির নাম এখন আর সে গদগদ স্বরে উচ্চারণ করে না,—মোশন-মাস্টার নটুবাবু নির্দেশ-মত, নিজের কবতল চাণক্য পণ্ডিতের চোখেব সামনে মেলিয়া ধবিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে এই কথাটা বুঝাইতে চায় যে, মানুষেব ভূত-ভবিষ্যৎ হাতেব পাতায় অতি সংক্ষেপে লেখা আছে, এবং এ-বিষয়ে পানিনিব গণনাই নিঃসন্দেহে প্রামাণিক। বেচাবি পানিনি।

স্টেজের উপর সতেজ বিহাসসাঁল চলিতেছিল। নিচে স্টেজেরই সম্মুখে চেয়াব এবং বেঞ্চি টানিয়া আনিয়া সমজ্জদারেরা বসিয়া ভালমন্দ বিচার করিতেছিলেন। স্টেজের উপরে মোশন-মাস্টার নটুবাবু প্রতিটি ভঙ্গি অভিনয় কবিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, যাহাতে কাহাবও একটুমাত্র ভুলচুক না থাকে। ওদিকে এক দৃশ্যশিল্পী দেওয়ালে ক্যান্বিস টাঙাইয়া বাজসভা আঁকিতে আবস্ত করিয়াছে। মিলনীব দ্বারোন্মোচনের আব দেরি নাই, তাই সকলকেই তাডাতাড়ি করিতে হইতেছে।

বাজা ভিতরে প্রবেশ কবিয়া প্রথমে সীন দেখিয়া আকুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত যেমন গর্ব্বসহকারে নন্দবংশ ধ্বংস করিতে লাগিল, তাহাতে বাজা অধিকতর আকুষ্ট না হইয়া পারিল না। চুপে চুপে সে শ্রোতৃমণ্ডলীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি শীঘ্রই অভিনয়-নৈপুণ্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে হেলেন বঙ্গমঞ্চে আসিল। বেচাবার মুখে কতকগুলি ছুট ব্রণ হওয়াতে এক পক্ষের অধিককাল সে দাড়ি কামাইতে পাবিতেছে না, আধ ইঞ্চি লম্বা লম্বা দাড়িতে তাহার সারা গাল আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

যথাবিহিত যুবতীস্থলত দম্ভভরে সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় এন্টিগোনাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীমতী হেলেনের দাড়ি দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে হাসিতে রাজার পেটটা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল। ভাবি মজা তো,—একগাল দাড়ি—মেয়েমানুষেব—কাণ্ড দেখ! পরিশ্রম সহকাৰে বাজা গান্ধীৰ্য্য বক্ষা কবিল, কিন্তু হেলেনের যা মেয়েলী হাবভাব তাহাতে হাসি অধিকক্ষণ চাপিয়া থাকা সহজ নয়। এন্টিগোনাস তখন বীৰদৰ্পে বলিতেছে—‘আমি জানতে চাই, হেলেন, তুমি আমায় বিবাহ করবে কিনা, আমি জানতে চাই—’

পিছন হইতে সহসা একটা তীব্র হি হি হি সমস্ত ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে হাসি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অফুবন্ত। কাঁপিয়া কাঁপিয়া উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে বাঁশিব মত সেই হাসি পবন পুলকের আবেগে লুটোপুটি খাইতে লাগিল। চকিতে দর্শকমণ্ডলী ফিরিয়া চাহিল। মোশনের মধ্যে বাধা পাইয়া নটুবাবু হত্কাব করিয়া উঠিল—‘কে রে, কোন্‌ স্ত্রীর এসেচে—ওঃ! ছোটবাবু—কখন এলে? এসো এসো, এগিয়ে এসো।—তা এবকম একগাল দাড়ি নিয়ে হেলেনেব পাৰ্ট কবতে এসেছিস, দাস্ত্র—ওতে তো আমারই হাসি পায়, আর ছোটবাবু তো ছেলেমানুষ। এসো, এদিকে এগিয়ে এসো—বেশ, বেশ, বড় হাসালে সবাইকে—’

এমন গৰ্জিত রাজা জীবনে আব কখনও বোধ কবে নাই। স্বয়ং চাণক্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের পরিবৰ্ত্তে তাহাকে নন্দের সিংহাসনে বসাইবাব প্রস্তাব কবিলেও সে এতটা কৃতার্থ হইত না। মুহূৰ্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না, সগৰ্বে অগ্রসর হইয়া সে স্টেজে যাইয়া উঠিল এবং শীঘ্রই নটুবাবু শিক্ষাদান-নৈপুণ্য দেখিয়া সম্পূর্ণ অভিভূত হইল।

কিন্তু বেশিক্ষণ এ আনন্দ ভোগ করা কপালে লেখা ছিল না। গ্রামের নানান দিক হইতে শাঁখের শব্দ উদ্ভিত হইল—সন্ধ্যাব আবির্ভাব

সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিলনা। বাবার শাসন এবং পিসিমার ক্রন্দনের ভয়ে এই অপূর্ণ এবং বিষয়কব বিহাসেলের মধ্যপথেই রাজাকে একান্ত অনিচ্ছাব সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে হইল। রাত যাইবে, সকাল হইবে, তবে না ইস্কুল বসিবে। নটুবাবু নিজের স্বয়ং, তাহাকে স্টেজের উপর ডাকিয়া লইয়াছিল,—বিশ্বাস করো, আর না করো। নটুবাবু এই অন্তঃপ্রবৃত্তির খবরটা সহপাঠিমহলে প্রচার করিবার দুরন্ত আগ্রহে বাজা ছটফট করিতে লাগিল। সঙ্কীর্ণ না হইয়া গেলে দু'এক বাড়িতে এবই মধ্যে খবরটা সে নিশ্চয়ই দিয়া আসিত! ইয়া, বলিবে, নিশ্চয়ই বলিবে,—নটুবাবু বাবাকে যাহা যাহা বলিতে বলিয়াছে, সব সে বলিবে। 'একেবাবে গাধা-গরু পিটিয়ে মাহুষ কবতে হচ্ছে,—বলতে গেলে একলার পবিত্রমেই প্রেটা দাঁড় কবাচ্ছি'—এ কথাটাও সে বাবাকে বলিবে। শুধু নটুবাবুর একটা কথা বাজাব মনঃপুত হয় নাই। নটুবাবু বলিল, 'প্লে-র দিন এসো কিন্তু ছোটবাবু,—দেখো, এইসব যদি মাল দিয়ে কি একখানা প্লে আমি দাঁড় কবাই,—সবার তাক লেগে যাবে—' নটুবাবু কি ছাই ঘুণাক্ষবেও জানে যে, এই প্লে-ব সকল 'সৌন্দর্য' বাজা নিজ হাতে ফেলিবে, তবে নাটক হইবে।

তিথিটা পূর্ণিমা ব দিকে ছিল, খালের উপর মস্ত একটা চাঁদ উঠিয়াছে। রূপার মত চক্চকে জোৎস্না বাজাব বড় ভাল লাগে। গান সে জানে না, এই দুঃখ, নইলে অনায়াসে সে গান উঠাইতে পারিত, এমন তার মনেব অবস্থা। কিন্তু শীঘ্রই গানের স্বর তাহাব প্রতিগোচর হইল। বাজা কোতুলী হইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া গতি স্তিমিত কবিল, কিন্তু জনমহুগ্ন দেখিতে পাইল না। পরীষ গান নাকি বে—হি হি—লোক দেখতে পাচ্ছি না যে—বাজা মনে মনে কহিল। তাব কোতুল অসম্ভব বাড়িয়া গেল।

খালের পাড় অমনি সঙ্কীর্ণ হইতে না হইতে জনবিরল হইয়া ওঠে ;

তার উপর সড়ক এখানটায় মোড় ফিরিয়াই জমিদারবাড়ির ফটকে প্রবেশ করিয়াছে। জমিদার-বাড়িতে প্রয়োজন না থাকিলে এ-সময় বড় একটা কেউ এদিকে আসে না। মোড়ের কাছে কোনও রহস্যময় স্থান হইতে এই সঙ্গীতেব উৎপত্তি, এ বিষয়ে বাজা ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইল,—শুধু মাহুয়ে গাহিতেছে, না, আকাশেব কোনও পবী বা অম্বর গাহিতেছে, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইল না। উৎসুক চোখে পা টিপিয়া টিপিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যেখানে বুড়া তালগাছটা ক্ষুদ্র তালগাছগুলিকে কহুই দিয়া পিছনে ঠেলিয়া খালের উপর একেবাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেখানে সহসা বাজাব দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, এক ছায়ামূর্তি বুড়া তালগাছেব গুঁড়িতে হেলান দিয়া দিব্য আনন্দে গান উঠাইয়াছে—এবং গানটা এমনি কৰুণ এবং সান্নাতিসিক যে, রাজা উন্ট দিকে ফিবিয়া এক ছুট লাগাইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সাহসে ভব কবিয়া সে আগাইয়া গেল এবং অকস্মাৎ কণ্ঠস্বব চিনিতে পাবিয়া ফিক কবিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, সহসা একটা মতলব তাব মনে খেলিয়া গেল। হাসি বন্ধ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে বুড়া তালগাছেব দিকে অগ্রসর হইল। মনে মনে বলিতে লাগিল—কি পাগ্লা বে, বোষ্টুমিটা, একবার কাণ্ড দেখ, কোথায় এসে গান ধবেচে—যেন এই বাস্তবের এই গাছতলায় এসে লোকে শুকে চাল দিয়ে যাবে—হি হি হি—

যমুনা বৈষ্ণবী তালগাছের গোড়ায় হেলান দিয়া, খালের জলে পা বাড়াইয়া দিয়া তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল, চোরেব মত চুপিচুপি রাজা পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। ‘এমনি গানে মনোযোগ, কিছুই টের পায় নি—একটু ঠেলে দিলেই ঝুপ্ করে জলে পড়ে যাবে!’—রাজা ভাবিতে লাগিল। কানেতে ভূতের ফুঁ এবং ঘাডেতে ভূতের আঙুলের আঁচড় দিয়া যমুনাকে চমকাইয়া দিয়া অপাব কৌতুকে সেই দৃশ্যটা উপভোগ



করিবে কি?—রাজা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সহসা বৈষ্ণবীর সঙ্গীতে মন আকৃষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া পিছনে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া সে গান শুনিতে লাগিল।

বৈষ্ণবী বারম্বার গানের ধূয়াতে ফিরিয়া আসিতেছে :—

‘মনের মধ্যে অচিন্ পাখি কেমনে আসে যায়

ধবতে পাবলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায় ॥’

খুব বেশিক্ষণ বাজার ধৈর্য্য বহিল না। সহসা বাজা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ‘পাখি কই?—হি হি হি—পাখির পায়—বেশ তো গানটা, পাখির পায়।’

যমুনা চকিতে গান বন্ধ করিল। পিছনে ফিরিয়া সবিস্ময়ে কহিল, ‘বাজা! তুমি! কখন এলে? কি কবে তুমি এলে?—আমাব স্বপ্নেব মধ্যে থেকে এলে নাকি?’

রাজা কহিল—‘তুমিই বা এখানে এলে কেন এখন? রাত্তিরে বুঝি কেউ চাল দেয়।’ বলিয়া সে যমুনার পাশেই বসিয়া পড়িল।

‘চাল চাইতে তো আসিনি, বাজা।’

‘তবে কেন এসেছ?’

‘তোমাকে দেখতে পাব, তাই এসেছি।’

‘দূর।’

‘বালগোপালকে না দেখে দিন যে আমার কাটে না। তাই তো পথেব ধারে বসে আছি, রাত-বিবেতেব ভয় কবলে কি আমার চলে!’

‘ধ্যোং, পাগলী, কেবল মিছে কথা!’—বাজা কহিল।

যমুনা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, অদ্ভুত এক স্নেহ-বুভুক্ষু দৃষ্টিতে রাজাব মুখেব দিকে চাহিয়া বহিল। ক্রমে তাব চোখ স্তিমিত হইয়া উঠিল, এবং যেন চেষ্টা করিয়া সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—‘মিছে কথা নয়, রাজা, মিছে কথা নয়!—বাজা বাবু—’

‘কি?’

‘আখ্ ডাতে আর তো তুমি গেলে না। আমি কত আশা কবে পথ-চেয়ে থেকেচি, ভেবেচি—ছোটবাবু বলে গেছে, আসবে, ঠিক আসবে। কিন্তু কই, তুমি এলে কোথায়?’

বস্তুত, রাজার আখ্ ডায় ঘাইবাব প্রলোভনের কারণে আব বিজ্ঞান ছিল না। আজকাল যেখানে সেখানে অজস্র কাঁচা আম পাওয়া ঘাইতেছে, এমন কি নিজেদের গাছতলা হইতে গত কাঁচা আম মালীরা কুড়াইয়া আনিয়া দেয়, তাহা বাজা এবং বাজাব পিসিমাঝ পক্ষেও যথেষ্টেব চাইতে বেশি। কিন্তু সত্য কথাটা বলিতে বাজাব কেমন জানি মায়া হইল—মনে হইল, প্রকৃত কথাটা বলিলে বৈষ্ণবী, যেমন কবিয়াই হোক, আহত হইবে।

‘বাঃ বে, পড়াশুনো আছে না বুঝি।’

‘ওঃ, তা তো আছেই। আমাবই মনের রাশ নেই কিনা, তাই পাগল হয়ে উঠি। অন্তেব যে মেলাই কাজ, ভুলে যাই।’

‘বোষ্টুমি, তোমার ছেলে আছে?’

‘ছেলে।’ যমুনা বৈষ্ণবী অসম্ভব বকম চমকাইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল—‘ছেলে! হ্যাঁ, আছে, ছিল—মানে, এখানে নেই, কিন্তু আছে, সত্যি আছে—তোমাকে মিছে বলচি না, বিশ্বাস কব, সত্যি আছে—’ এক অদ্ভুত আবেগোচ্ছ্বাসে তাব কণ্ঠস্বর যুগপৎ সজল এবং অম্পট হইয়া উঠিল। ‘সব ছিল বাজা, সব ছিল। কি আমাব ছিল না? আমাব স্বামী ছিল, আমার ছেলে ছিল—’

‘তবে?’ বাজা বৈষ্ণবী এই উচ্ছ্বাসে কিছুটা ভড্কাইয়া গিয়া কহিল। ‘তাদের কি হলো?’

যমুনার সহসা আর্ন্তনাদ কবিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। অতি কণ্ঠে নিজেকে সে দমন করিল। অশ্রু-বিকৃত গলায় কহিল—‘তুমি বুঝবে না, রাজা। তুমি তা বুঝবে না—’

বাজা বোন্ধাৰ মত কহিল, ‘সে ছেলে মৰে গেছে, না ?’

ভীতস্বৰে যমুনা চোঁচাইয়া উঠিল—‘ঘাট, ঘাট, সে মৰবে কেন। যমৰ ভয়াবে কাঁটা দিয়ে চিৰকাল সে বেঁচে থাক। আব্‌ছায়াৰ মত শুধু তাৰ কচি মুখটা মনে পড়ে। এতিদিনে তোমাবই মত ডাগৰ হয়েছে, ভাবচি, তোমাবই মত এমনি ডাগৰ দুটো চোখ হয়েছে কিনা ? এমনি কি তাৰ বুদ্ধি হয়েছে ? এমনি স্বন্দৰ হয়েছে আমাব থোকা ?—একটা কাজ কৰবে, বাজাবাবু ?’

‘কিঃ ?’ বাজা শুধাইল।

যমুনা বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ কোনও সাড়াই দিল না, যেন এক বিগত-যুগেৰ বিন্মতপ্ৰায় স্মৃতি চোখেৰ সমুখে টানিয়া আনিয়া আতুৰ লোলুপতাৰ সঙ্গৈ নিবীক্ষণ কৰিতেছে ! সহসা বাজাব দিকে চাহিয়া সে অতি মিষ্টকণ্ঠে ডাকিল—‘গোপাল !’

‘ফেব্‌ !’

‘গোপাল, তোমাব মাথাটা আমাব বুকেৰ ওপৰ একটু বাখবে ? শুধু একটু, শুধু একবাব, একটু ক্ষণেৰ জন্তু। মায়েৰ বুকেটা যে জলে যাচ্ছে, একটু একটু কৰে পুড়ে যাচ্ছে—শুধু একবার গোপাল, শুধু একটি মুহূৰ্ত্ত—’ যমুনা তাৰ দুইটি ব্যাকুল বাহ বাজাব দিকে প্ৰসাবিত কৰিয়া দিল। দুই চোখ দিয়া ঝৰঝৰু কৰিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—যমুনা বৈষ্ণবী এক মুহূৰ্ত্তে ‘সম্পূৰ্ণ বদলাইয়া গেল।

‘ধ্যোং !’ বলিয়া বাজা উঠিয়া পড়িল। কহিল—‘ধ্যোং, তুমি একদম পাগ্‌লী, বোষ্টুমি—’

চক্ষুৰ পলকে বাজা ছুটিয়া পালাইল।

যমুনা সবেমাত্ৰ আখডাব অৰ্দ্ধেক পথ অতিক্ৰম কৰিযাছে। এমন সময় পিছন হইতে একটা ডাক শুনিয়া সে পিছনে ফিৰিয়া দাঁড়াইল।

দেখিল, স্নানজ্যোৎস্নার ঈষৎ অন্ধকার পথ দিয়া কে একজন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে।

‘বোষ্টু মি, শুনচো, দাঁড়াও,—একটা কথা আছে।’

রাজার গলা চিনিতে যমুনার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। পবমুহূর্ত্তে রাজা নিজেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—  
‘তুমি এমন পাগ্লার মত করতে পার! ধোং, অমন কবে!—এই নাও, হলো তো—’ বলিয়া হতবাক্ যমুনার বকের উপর রাজা গভীর স্নেহভাবে মাথাটা বাখিয়া মৃদুস্ববে ডাকিল—‘ছোট মা!’

‘ছোট মা! গোপাল।’ বলিয়া যমুনা বৈষ্ণবী তাব পুত্রস্নেহ-বৃত্তান্ত বকের মধ্যে বাজাব মাথাটা সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সংজ্ঞা হাবাইয়া ফেলিল। যখন জ্ঞান হইল, দেখিল, পথের একপ্রান্তে সে বসিয়া আছে—বাজা কখন চলিয়া গিয়াছে টেবই পায় নাই।

পাণ্ডুরজ্যোৎস্নাস্তিমিত অন্ধকারে যমুনা বৈষ্ণবী পাগলেব মত নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে চলিল—‘ছোট মা!—ছোট মা! আমি মা!’

### দশ

হৈমন্তী দুদিন হয় কোটালনগরে আসিয়াছে। স্বামী অর্দ্ধেন্দু কদিন থাকিয়াই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবে, হৈমন্তী হাইকোর্টেব দীর্ঘাবকাশের শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, এমনি কথা আছে। ইহাদের আগমনে দুর্গাপ্রসন্নের বাড়িতে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। গয়লা আসিয়া দই ও ক্ষীর দিয়া যায়, জেলে মাছ পৌছাইয়া দেয়, ময়বা খাবাব লইয়া আসে। রাধুণী এবং দাসী-মহলে উত্তেজনার আব অস্ত নাই; সমস্ত বাড়ি গম্গম্ করিয়া উঠিয়াছে।

কোটালনগরের ইতরসাধারণ আর রাজার দেখাই পায় না। জহর

আর মিলিকে লইয়া সে অতিশয় ব্যস্ত আছে ; এমন কি থিয়েটারের রিহার্সাল স্তনিতে যাইবার পর্য্যন্ত সে ফুরসৎটুকু পায় না। তবে ইতি-মধ্যেই জ্বরকে সে সগর্বে জানাইয়াছে যে, মিলনীতে থিয়েটার হইবার সময় সীন্ সে-ই ফেলিবে। নিজের এয়াব-গান্টাও সে জহ্বকে দিয়া দিয়াছে এবং সাবধান কবিয়া দিয়াছে, পাখির দিকে যেন গুলি না ছোঁড়ে—অনেক সময় হঠাৎ ওদেব গায়ে ছব্বা লাগিয়াও যায়! মিলি এখন আব ‘মাম্ মা’ বলে না—ব্যাপাবটাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সে মামা বলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু বাজার খুসি তাতে একটুও কম নয়। নিজের সমস্ত পুৰাতন খেলনা মিলিকে সে উজাড় কবিয়া দিল, এবং শুধু তাহাই নয়, গঙ্গাবাম কুমোবেব কাছে চুপে চুপে ফবমাস দিয়া রাঁধিবাব যাবতীয় বাসন-কোসন আনিয়া দিল এবং মিলির হাতেব ঘাস-পাতার অপূৰ্ণ রান্না খাইয়া বিশেষ তৃপ্তি প্রকাশ কবিল। কহিল, ‘দই রাঁধিতে জানিস নে বুঝি ? শিখিয়ে দেবো অখন, তেলাকুঁচেব পাতা দিয়ে কেমন স্নন্দর দই হয়। একটু সবুজ দই হয় এই যা—হি হি—’

দুইটি শিশুও বালক-মামাব অদ্ভুত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাবাদিন ওবা বাজাবই সঙ্গে আছে, বামধনি বেয়াবা খববদাবি করিতে আসিলে বীতিমত আপত্তি জানায়। বাজাব ভাবি ইচ্ছা কবে, ডিঙিতে কবিয়া ওদের একদিন খালেব মধ্যে বেড়াইয়া আনে, কিন্তু দিদি বাববাব সাবধান কবিয়া দিয়াছে—‘খববদাব, বাজা, ওদেব জলেব ধাবে কঙ্গনো নিবি, নে—খালেব আশেপাশেও নয়।’ তাই বাজা সে চেষ্টা কবে নাই, শুধু মনে মনে ভাবিয়াছে—দিদিটা ভাবি ভীতু। কেউ যদি জলে পড়েই যায়, তবে বুঝি আমি আব তুলতে পারবনা। কত ছোটবেলায়ই পেরেছিলাম। যেন আমি কম সাঁতার জানি—

এদিকে হৈমন্তী পিতাব সেবায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ কবিল। খাওয়া-শোওয়ার এমনি বাধাবাধি করিয়া দিল, ছুটাছুটি এমনি বন্ধ কবিল

যে, দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমটায় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তবু বহুদিন পরে আপন জনের সেবার স্পর্শ পাইয়া অকস্মাৎ আজকাল জীর কথাটা কেবলই তাঁর মনে পড়িতে লাগিল। হৈমন্তীকে কহিলেন, ‘এত করিস নে, মা,—এত করিস নে। এ আমাব সহিবে না।’

‘সাত সমুদ্র তেবো নদীব পাবে থাকি বাবা, একটু তোমাব সেবা কবব, তাব অবসর পাই কোথায়? কিন্তু সাবাক্ষণ ভেবে মবি—দেখবাব কেই বা আছে।’ বলিয়া হৈমন্তী ডালিমের বস ছাঁকিতে লাগিল।

‘দেখবাব লোক হবে বৈ কি, মা, হবে। কেমন মজবুত কবে আমি ঘব বানাচ্ছি, দেখচিস তো? এই ঘবে বাজার বো এসে দেখিস আমাব কত আদব কবে—বুডোকে নিয়ে কত খেলাই সে খেলে, দেখিস।’

‘রাজার বো।’ বিস্মিত হইয়া হৈমন্তী কহিল। ‘সে কি ছ’পাচ দিনের কথা?’

‘দেখিস, ওব আমি শীগগিবই বিয়ে দেব—এণ্ট্রান্স পাশ হলেই। বাজা যাবে কলেজে পড়তে, আব এই কোটালনগঘে থাকবো আমি আব বোমা, বোমা আব আমি। দেখিস, কেমন মজা হয়—কেমন লক্ষ্মীর মত একটা বউ আমি আনি, দেখিস।’

‘আর ছেলেমেয়েটোও এমন হয়েচে,’ হৈমন্তী কহিতে লাগিল, ‘সাবাক্ষণ কেবল—দাছ, দাছ। বিশেষ কবে জহব, যেন বাপ আমাব নয়, ওর। শান্তুড়ি বলেছিলেন ওদেব রেখে আসতে। আমি কি বাজি হই। বল্লম, ওরা গেলে বাবাব মন অনেকটা হাল্কা হবে—বলে’ আমি নিয়ে এলুম।—’

‘বেশ করেচিস্ মা, খুব ভাল করেচিস্।’

‘কিন্তু এখানে এসে অবধি তোমার কাছেও ঘেঁষতে দেখিনে—লজ্জা পায় বোধহয়, কতদিন দেখেনি।’

দুর্গাপ্রসন্ন সন্তোষ মুহু হাসিলেন। কহিলেন—‘মামাব সঙ্গে

খুবই ভাব হয়েছে—তার সঙ্গেই সারাক্ষণ ঘুরে যে ডায়। ছোট ছেলেমেয়ে, যাতে ওরা খুসি হয়, তাই করুক—তাতেই আমি খুসি হবো।’

বাজা কহিল—‘জানিস, তারপর সেই ভূতটা না, এগিয়ে আসতে লাগল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—আয় দেখি তোব সাহস কত—দুব, ভয় পাচ্চিস কেন বে, মিলি, আয় আমার পাশে এসে বোস—আয় দেখি তোব সাহস কত? ভয়ে ভূতটা তো আব কাছে এগোয় না। এমন আমার ভূতটাকে ধবতে ইচ্ছে হল, কি আব বলব।—খাঁচাতে ভবে বাথলে কত লোক এসে দেখতে পাববে। কিন্তু ভূতটা পিছনে না ফিবে এক ছুট—ছুটতে ছুটতে—ছি হি হি—’

সন্ধ্যাব সময় নিজের বসিবাব ঘবে নির্জনে ইজিচেয়াবে হেলান দিয়া দুর্গাপ্রসন্ন তামাক টানিতেছিলেন। গডগডাব ধূমেব মধ্য হইতে কোটালনগবের ভবিষ্যতের বহু স্বপ্ন তাঁর হই চোখে ভাসিয়া ওঠে, তাব কিছুটা তিনি বাস্তবে রূপ দেন, কিছুটা ভবিষ্যতে বাজা কবিরে বলিয়া বাখিয়া দেন। মনে মনে সংকল্প আছে, কোটালনগব সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত অসমাপ্ত কল্পনা তিনি পবিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ কবিয়া যাইবেন, যাহাতে বাজা ভবিষ্যতে সহজেই তাঁর আশাগুলিকে রূপ দিতে পাবে।

এমন সময় জামাতা অর্জুন্দুশেখর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া মুখ হইতে নল সবাইয়া দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন, ‘এস বাবা, বস।—এই চেয়ারটা বস।’

অর্জুন্দু বসিয়া পড়িয়া সামান্য ইতস্তত কবিয়া কহিলেন—‘রাজাব সম্বন্ধে আমি একটু আলোচনা কবতে চাই। ও আমাদের সকলেবই প্রিয়, তাই ওর বিষয়ে—আপনার কোনও অহবিধে হবে না তো এখন?’

‘না, না, কিছু নয়। তুমি কি বলবে, বল—রাজ্যের বিষয়ে বলবে?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।—আমার মনে হচ্ছে, গ্রামে গুর উপযুক্ত বকম শিক্ষা, মানে ট্রেনিং, হচ্ছে না—অর্থাৎ সেই বকমই আমার সন্দেহ হচ্ছে—’

দুর্গাপ্রসন্ন নল টানিতে টানিতে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিলেন, এবং অর্ধেন্দুশেখর বিষয়টা ব্যাখ্যা কবিয়া চলিলেন—‘আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, পড়াশুনোয় ওর মন নেই—ববস্ব সাবা দিন চাবদিকে খেলে বেড়ায়। তাছাড়া যাদেব সঙ্গে ও মেশে, তাদেব মধ্যে ভ্রলোকের সংখ্যা কম। যত বাজোব জেলে, তাঁতি, বোষ্টম, এদের সঙ্গেই ওর মাখামাখি। প্রথমত, মনঃশিক্ষার দিক থেকে এই সব অন্ত্যাজেব সঙ্গ ওর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, দ্বিতীয়ত, আপনাব সম্মান, মানে, প্রেস্টিজের দিক থেকেও এটা—কি বলে—একটু দৃষ্টিকটু—’

দুর্গাপ্রসন্ন অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে ভাবিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন—‘তুমি কি করতে বল?’

‘আমরা বল্‌ছিলাম—আমাদেব সঙ্গে ও না হয় এলাহাবাদে চলুক, ভাল স্থলে ভর্তি করে দেওয়া যাবে, এবং সেখানে সামাজিক আদবকায়দায় অভ্যস্ত হওয়া ওর পক্ষে অনেক সহজ হবে। অবশ্য আপনাব কথাটাও ভাবা দরকাব—কিন্তু ওর ভবিষ্যতটাই সকলেব অধিক কাম্য—’

‘না, বাবা, তা হয় না।’ দুর্গাপ্রসন্ন সহসা স্থিতিচক্রে এবং নিষ্পত্তিব স্ববে কহিলেন। ‘হয় না, এইজন্য নয় যে, আমার স্বার্থপর স্নেহের জন্য ওর ভবিষ্যতটা আমি নষ্ট করতে চাই, কাবণ এই যে, আমি মনে করি, শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে যে-শিক্ষা পায়, সে শিক্ষার তুলনা নেই—তেমন শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। জীবনেব প্রথম দিকটায় প্রকৃতির নিজের পাঠশালায় শিক্ষা পেলে মাহুষের মন, বুদ্ধি, শক্তি অধিকতর বিকাশ পায় বলে আমার বিশ্বাস।’



‘ওঃ, তবে আর কোনও কথাই ওঠে না।’ অর্দ্ধেন্দু বিনীতস্ববে কহিলেন। ‘আব একটা কথা আমি জিজ্ঞেস কবতে একটু ইতস্তত কবচি—তবে রাজ্যবই ভবিষ্যতের কথা ভেবে—’

‘বল।’

‘আপনার কি উইল কবা হয়ে গেছে?’

‘আমার তো অনেক ওয়ারিশ নেই, উইলেব কি দবকার?’

‘তবু, মানে, স্পষ্ট একটা বিবৃতি থাকা সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। তাতে ভবিষ্যতে যেমন কোর্ট ফ্যাকডা বাধবাব অবকাশ থাকে না, তেমনি উইলকাবেক প্রতিনিধি খুঁটিনাটি ইচ্ছা ওয়ারিশকে জানিয়ে দেওয়া যায়, আব বিশেষ কবে আমি এই কথাটাই ভাবচি—বাজা এখনও নিতান্ত নাবালক, সাবালক হতে ওব অনেক দেরি—এ অবস্থায় খুব বিবেচনার সঙ্গে একজিকিউটাব নিযুক্ত কবে যাওয়া উচিত—যাকে-তাকে নিযুক্ত কবা বিপজ্জনক বলে মনে কবি। অবশ্য সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন—তবু কর্তব্যের খাতিরে—’

‘এ-বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো, বাবা।’

সে-বাত্রে শুইতে আসিয়া অর্দ্ধেন্দু স্ত্রীকে কহিলেন, ‘সে কথাটা কালকেই উঠিও, বুঝলে?’

আঘনাব সমুখে দাঁড়াইয়া হৈমন্তী চুল আঁচড়াইতেছিল, কহিল—  
‘আমার ভাবি লজ্জা কবে।’

অর্দ্ধেন্দু ঈর্ষ বিবক্তিব স্ববে কহিলেন, ‘লজ্জা করে। এতে লজ্জাব কি আছে শুনি? চিবকাল তুমি এমনি বোকা। বিচার-বিবেচনা বলে একটা জিনিষ—’

‘বেশ, বেশ, বলবো’খন।’ বলিয়া হৈমন্তী নিজের চুলের মধ্যে নির্দয়ভাবে চিরুণী চালাইতে লাগিল।

নিশ্চিত হইয়া অর্ধেকদু কহিলেন, ‘এ আর কাব জন্ত, তোমাব ছেলে-পুলের জন্তেই তো—শুনচো, চুকটের বাস্তুটা এগিয়ে দাও তো ?—’

দুর্গাপ্রসন্নের তান পায়ের গোড়ালিতে সামান্য ব্যথা হইয়াছিল। ভোরবেলা হৈমন্তী তাহাতে কবিবাজি তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন,—‘মালিশ করিয়া দিবার লোকের অভাব কি, কিন্তু হৈমন্তী কিছুতেই শুনিল না, ঘরের মেঝেতে বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট দুর্গাপ্রসন্নের পায়ে সজ্জার ওষুধ ঘষিয়া দিতে লাগিল। স্বথ-দুঃখের অনেক কথাই হইল।

‘হয়েচে, মা, হয়েচে, যথেষ্ট হয়েচে।’ অবশেষে দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন। ‘আর দরকার নেই।’

‘কেবল তোমাব ফাঁকি দেওয়া, বাবা—ভাবচ, হৈমব বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে। কিছু নয়, ওখানে শশুব-শান্তিডিব আমি কত সেবা কবি, এতে আমার একটুও—এই গুণচিস্, জহব, যাকিস কোথায়, শুনে যা—’

জহব বাবান্না দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, মায়েব ডাক শুনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া কহিল—‘কি, ডাকচ কেন? আমাব একটুও সময় নেই, মামা টিয়ে পাখি ধবতে গাছে উঠেছে—আমি চল্লম—’

‘দাদুর কাছে কখনও আসতে নেই, না রে দুষ্ট ছেলে? এলাহাবাদে সারাক্ষণ তো শুধু দাদু দাদু কবতিস।—আব দাদুর সঙ্গে ভাব কবলেই লাভের আশা আছে, হাবা ছেলে। দেখ্, দাদুকে ভুলিয়ে টুলিয়ে জাহু করে’ এক টুকরো জমিদারি আদায় কবতে পারিস কিনা। সোনাকুপো যতই থাকুক, জমিদারি না থাকলে সে মান হয় না,—জমিদার হওয়াব সম্মানই আলাদা—’

‘আমি গেলাম,’ জহব যাইবার উদ্যোগ করিয়া কহিল।

‘ফেব্‌ দুষ্ট্রিমি ? দাছব কোলে এসে বোস্‌। রোজ ভোবে উঠে দাছকে পেন্নাম কবতে বলেছিলাম সেই এলাহাবাদে থাকতে—কবিস্‌ ?’

ধব, মামা যদি একটিমাত্র টিয়া ধরিতে পারিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেটা মিলিই দখল কববে, কেননা সে কাছে আছে, কিন্তু আনায়াসেই এতক্ষণে সে যাইয়া উপস্থিত হইতে পাবিত, এবং কাড়া-কাড়িতে মিলি তাব সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। অথচ এইরূপ অগ্নায়ভাবে অকিঞ্চিৎকর কারণে তাকে আটকাইয়া বাখা মিলিব উপর মায়েব পক্ষপাতেব দৃষ্টান্ত ছাড়া আব কি ?

জহবেব অবস্থা দেখিয়া দুর্গাপ্রসন্ন কৌতুক বোধ করিলেন। কহিলেন—‘দে, ওকে যেতে দে হৈম, কেমন চট্‌ফট্‌ কবচে, দেখ্‌।’

হৈমব আর মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না, দাছব নির্দেশ শোনা মাত্র জহব পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হৈম কহিতে লাগিল—‘শান্তি রোজই শোনায়, দাছ কিছু দিয়ে যাবে না। শুনে আমাব যা বাগ হয়। জহরেব দাছকে যদি চিন্তো, তবে এমন কথা বলতে পাবত না। বলে, এতো বড সম্পত্তি, ছেলেতে মেয়েতে সমানভাগে ভাগ কবে দিলে তবে না ন্যায়ের কাজ হতো, দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরিব উপযুক্ত কাজ হতো—তা মেয়েকে তো কিছুই দিলেন না—’

‘কেন মা, তোব বিয়েতে আমি তো লাখ টাকার ওপর ব্যয় কবেচি।’ দুর্গাপ্রসন্ন অগ্নমনস্ক হইয়া কহিলেন। ‘পঞ্চাশ হাজার টাকা, আমি তো নগদই দিয়েচি, তবে এমন কথা ওবা বলবেন কেন ?—’

‘কিন্তু এ-কথাও ঠিক, বাবা,’ হৈমন্তী তাড়াতাড়ি কহিল, ‘এমন তফাৎই বা তোমরা কববে কেন ? মেয়ে তো নিজেবই সন্তান, তবে এই বৈষম্য কেন ? তোমার এতো আছে, অথচ সামান্য এই ক’টি টাকা দিয়েই আমাকে বিদেয় কবে দেবে ?—এলাহাবাদে আমাদের মহিলা-

সমিতিতে এই অজ্ঞাযেব বিরুদ্ধে আমরা কত প্রস্তাব পাস্ কবেচি।—  
কিন্তু এ-ও আমি তোমার কাছে আদার ধরলুম, জহবকে একটা সম্পত্তি  
তোমার লিখে দিতেই হবে, কোনও ওজবই আমি শুনব না। জমিদাবেব  
মেয়ে আমি, জমিদাবেব মাও হ’তে চাই—’

দুর্গাপ্রসন্ন একেবাবে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, ‘আমি ভেবে  
দেখব, মা, ভেবে দেখব। বেশ, আমি ভেবে দেখি—’

সত্যই তিনি ভাবিলেন। হৈমের কথাব মধ্যে নিশ্চয়ই খানিকটা  
সত্য আছে। মেয়ে বলিয়াই না তিনি সম্পত্তিব অতি সামান্য অংশ  
দিয়া তাকে বিদায় কবিতে চান,—কিন্তু মেয়ে তো নিজেবই সন্তান।  
কোন প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তিনি এই বৈষম্যেব সাক্ষ্যই দিবেন ?  
অথচ ইহাও সত্য, যে-বহুশ্রম্য কাৰণেব জন্মই হোক, বাজাব জন্ম সমস্ত  
কিছু জমাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, একটুও ভাগাভাগি কবিতে ইচ্ছা  
কবে না। এই বিপুল সম্পত্তিব প্রতিটি অংশ বাজা একক ভোগ করুক,  
সমস্ত অস্তব যেন ইহাই চায়। সমস্ত জমাইয়া তিনি একটিমাত্র গৃহ তৈবি  
করিতে চান,—সে গৃহের শুধু একটিমাত্র মালিক থাকিবে।

কিন্তু হৈমের কথাগুলি যেন তাঁব দুর্বলতা এবং পক্ষপাতিত্বকে নিজেব  
কাছেই স্থম্পষ্ট করিয়া তুলিল। তাঁব বিবেকেব এক অখ্যাত কোণ হইতে  
একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন আসিতে লাগিল—তাইতো, তাইতো। কিন্তু  
মনটা পরমুহূর্তেই কঠিন হইয়া বলিতে লাগিল—‘না, তা নয়—তা নয়।  
আমার সমস্ত স্বাবব এবং অস্বাবব সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া আমি বাজার  
জন্ম গৃহ প্রস্তুত কবিবাছি, এতে হাত দিবাব কাহাবও অধিকাব  
নাই।—কিন্তু হৈমের কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিবার মত। কোন গায়ে  
আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পাবি ? আইনের উপরও তো একটা  
জিনিষ আছে—নাঃ, জহরকে অস্তত কিছু একটা আমাকে দিতেই  
হইবে—’

গভীর বাত্ম। সামান্য কিছু আগে কাঁচাবিবাড়ি ঘণ্টাতে বাবটা কুজিয়াছে। এবং সেই ঘণ্টা শুনিবাব পব হহুতেই বাজা বিছানায় চটকট্ কবিয়া মবিতেছে। কথা আছে, এই সময় মাণিক বাজার ঘবেব নিচে আসিয়া শিষ দিবে, কিন্তু মাণিকেব আসিবাব কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। অতি সতক হইয়া সে কান পাতিয়া বহিল, দম্কা বাতাসেব প্রতিটি হিম্ হিম্ শুনিতে পাইল, কিন্তু মাণিকেব শিষের দেখা নাই।

অধৈর্য্য হইয়া অবশেষে পা টিপিয়া টিপিয়া বাজা দোতলাব বাবান্দায় গিয়া দাঁড়াইল, এবং সমুখে চাহিয়াই দেখিল স্বদূব খালেব পাড়ে একটা ডিঙি ডিঙিয়াছে। ডিঙিতে অস্পষ্ট ছায়াব মত একাধিক লোক দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই ছায়াব মধ্যে একটি পাড়ে নামিয়া ক্রমেই এদিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। বাজাকে আব বলিতে হইল না,—যথাসম্ভব পা টিপিয়া টিপিয়া সে সিঁড়ি দিয়া একতল'য় নামিয়া আসিল। এমন দেরি কবতে পাবে মাণিকটা। একেবাবে বাগ ধবে যায়। কিন্তু পদ্মায় মাছ ধবতে যাওয়া ভাবি মজা—হি হি—

নিঃশব্দে জেলেডিঙি ছাড়িয়া দিল। মাণিক কহিল—‘বড়কর্তায় কইচে তো—দেইখো?’

রাজা গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া কহিল—‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে—এখন চল্।’

মাণিকেব বাবামশায় ও খুডামশায় আজ গাঙে যাইবে না। বাড়িতে কুটুম আসিয়াছে, তাহাদেব আপ্যায়নের জ্ঞাত আজ তাহারা কাজে কামাই দিবাব সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তবে শুধু মাণিক নয়, ও-বাড়ির আবও দুইজন জেলে সঙ্গে আছে। তাদের সঙ্গে রাজার ভাব নাই, কিন্তু মাণিক জানা থাকিলেই তার চলে; কেউ জানা না থাকিলেও এমন

কিছু আসিয়া যায় না। জেলেডিঙি চড়িয়া পদ্মায় মাছ ধবিতে যাইতে পারিলেই হইল। অবশ্য বাবামশায় এবং খুড়ামশায় উপস্থিত থাকিবে না। বলিয়াই মাণিক রাজাকে লইতে সম্মত হইয়াছিল। আজ সে-ই দলের সর্দার। তাব গানের বাড়াবাড়িতেই সেটা টেব পাওয়া গেল :—

‘যদি পদ্মা পাড়ি দিবি তবে ঢাকা দেখতে পাবি

মখমুদাবাদ কববি অশ্বেষণ।

শুনচ, হরিমণ্ডল, একটু জোরে বাও—ঐরে বৃন্দাবন, ঘুমাস্ নাকি—  
—শ্রাবের লাইন দুইটা একটু শুইনো ছোটকর্তা—

আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা

সাঁতার দে যায় বসিক যে-জন।’

কিন্তু ঘুমন্ত খালের মধ্য দিয়া, বিচিত্র ষোপঝাড়ের তলে তলে বিচিত্র প্রাণম্পন্দ তুলিয়া জেলেডিঙি পদ্মার দিকে অগ্রসব হইয়া চলিল। এমন অপূর্ণ লাগিতে লাগিল এই নিদ্রিত পৃথিবী, এই রহস্যময় জলপথ, এই অত্যন্ত সঙ্গীবা এবং পদ্মায় যাইয়া মাছ-ধরা দেখিবাব স্বপ্ন যে, রাজা কোনও বাক্যলাপই কবিল না—বিমুগ্ধ বিশ্বয়ে সমুখ দিকে শুধু চাহিয়াই রহিল।

ওদিকে তামাক টানিতে টানিতে তখন হবি মণ্ডল বৃন্দাবনকে কহিতেছে,—‘আইজ যদি শালারা ডিক্সির সমুখ কাইটা যায়, তবে আইজ কিন্তু একটা দাঙ্গা হইব, কইয়া দিলাম।’

বৃন্দাবন কহিল—‘আরে দাঙ্গা ককম ক্যান্, মণ্ডলের পো, আমবাই অগো সমুখ দিয়া ক্যাপ্ ফালামু—দেখি জন্টটা হয় কে? নাওয়ের আগ্ কাটতে বুঝি আর আমরা জানি না।—’

‘জানু না আর ক্যান্—জানি সবই। সর্দারেরা ভরে মরে, সাধে কি আর চূপ মাইরা থাকি? নাইলে কও দেখি, কুসুমপুয়ের বিরাট

জাউলা আমাগো থন্ কোন্ কুলিনটা? না হয় কন্সকারের বাড়িতে মাইয়া বিয়া দিছেই। কন্সকাব এমুন কোন্ কুলিন?’

‘দেইখো, আইজ আমরাই কেমন অগো আগ্ কাটি। জালের মাছগুলি ছিনাইয়া নিলে বুঝুক কেমন রাগটা হয়—’

মাণিক গানের মধ্যে একটু ছেদ টানিয়া কহিল,—‘ফিস্ফাস্ কইরা কি কওয়া-কওয়ি লাগাইছ? গাও লাগাইয়া বাও না—আছে কলিতে কলিকাতা তিন সহবে আঁটা—’

ডিঙি পদ্মাব মোহনায় আসিয়া পড়িল। আকাশে সামাগ্র মেঘ কবিয়াছে,—একটু হাওয়াও আছে। ওরা পাল উঠাইল, এবং দেখিতে দেখিতে পদ্মাব বুকে ষাইয়া প্রবেশ কবিল। অসংখ্য জেলেডিঙি ইতস্তত জাল নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে—দূব হইতে তাহাদেব অস্থির যুহু আলোগুলিকে আলেয়ার মত মনে হয়। এই ডিঙির ভিডের মধ্যে মাণিকের ডিঙিও মিশিয়া গেল।

আকাশেব প্রান্তে মেঘ থাকিয়া থাকিয়া যুহু যুহু গর্জন কবিতে লাগিল, ছ’একবাব বিদ্যুৎ উঁকি দিয়া শাসাইয়া গেল, এবং পদ্মার অন্তহীন বাবিরামি বুকে কতগুলি নির্ভীক মানবসন্তান জালের মধ্যে ‘অভুত কোশল’ এবং ক্ষিপ্ততার সঙ্গে সহস্র সহস্র বোঁপাবর্ণ ইলিশমাছ বন্দী কবিতে লাগিল। জেলেদেব ছিপ্ নৌকাগুলি যেন মাহুষে চালাইতেছে না, মাহুষ যেন এই জালগুলি নিক্ষেপ কবিতেছে না, নৌকাগুলি যেন যন্ত্রেব মত স্থনির্দিষ্ট পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে এবং জলবাশি নিষ্পেষিত কবিয়া এই জাল-যন্ত্রেবা মৎস্ত উৎপন্ন করিয়া নৌকার পাটাতনের তলায় নিক্ষেপ করিতেছে—এমনি এই সকল জেলেদের দক্ষতা। বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শীতগ্রীষ্ম নাই, এই জল-কৃষকেরা পদ্মাব জল চাষ করিয়া মাটির মাহুষের জন্ত

অজস্র খাণ্ডদ্রব্য সংগ্রহ কবিয়া আনিতেছে। রাত্রির অন্ধকাবে ইহাদেব কর্মতৎপরতা সভ্য মাহুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। ধবণীব এই বীবপুত্রদেব কথা এমন কি কবিদের কাব্যোপস্থান পাষ না, ইতিহাসে স্থান পাওয়া তো দূরেব কথা। কিন্তু এই অ-স্তুত বীবেরা অতি সামান্য এক মুঠা উদবায়েব জন্ম অস্থিব এবং হিংস্র জলবাশিব মধ্যে জগতেব শ্রেষ্ঠ সাহসিকতাব পবিচয় দেয়,—জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান কবিয়া ধবিত্রীব সর্বাপেক্ষা হিংস্র আবেষ্টনেব মাধ্য অবহেলায় সংগ্রাম কবিয়া ফিবে।

সহসা সেই নিম্নক অন্ধকাবে একটা কর্কশ ছক্কাব শোনা গেল—  
‘নাওয়েব আগ কাট্‌লি, শালা,—চউথে দেখস্ না? নাওয়েব আগ কাট্‌লি, অ্যা?’

‘বেশ করচি, করুম না, একশোবাব করুম।’ প্রত্যুত্তর আসিল।  
‘বোজ রোজ যখন আমাগো আগ্‌ কাইটা যাও, তখন কেমন? সেই কথাটা মনে নাই—’

‘খপরদাব কইলাম’, নিঃশব্দ জলবাশিতে আবার সেই কর্কশ স্বর প্রতিধ্বনিত হইল—‘সাবধান, পরিণাম ভাইবা কথা কইও।’

‘ওরে আমার ই রে।’ সবাক্সে জবাব আসিল।

‘বা, যা দেখি আবার। কেমন মবদেব পো দেখি, কাট্‌ দেখি আবার নাওয়ের আগ্‌। আমি কুহুমতলিব বিবাট জাউলা, ইন্‌ থাকে য়ান্‌।—’

‘যামুনা, হাজারবার যাম্‌’, হরিমণ্ডলের গর্বিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।  
‘যেমন ইচ্ছা যাম্‌—কণ্ডের বাপেব জাগা দিয়া যাই কিনা? লাগা বৃন্দা—  
আগে লাগা।’

মানিক শঙ্কিত হইয়া কহিল—‘আরে কর কি মণ্ডলের পো—কাইজা বাধাইলা যে—কি মন্ডিল—আ হা হা, কর কি—’

‘করি, বেশ করি। চূপ মাইরা যাম্‌? বা’ বা’ বৃন্দা, আগ কাট্‌--’



চক্ষের পলকে ডিঙিটা অল্প ডিঙির সমুখ দিয়া শাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং হবি মণ্ডলের দক্ষতা এক জাল ইলিশ মাছ চক্চক্ কবিয়া উঠিল।

‘গেলি।’ বিবাট জেলে বিভ্রম সজ্জাব করিয়া উঠিল।

‘গ্যালাম।’ হরি মণ্ডলও সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিল।

‘তবে বে শালা, মজাটা বোঝ্।’ সঙ্গে সঙ্গে বিবাটের ছিপ্ এই ডিঙিটার প্রায় গায়েব উপব আসিয়া পড়িল। পলকেব মধ্যে চার চার জোয়ানেব হাতে চার চাবটা শড়্কি ঝলসিয়া উঠিল।

‘শালাব পো শালা’, ভীমদর্শন বিবাট জেলে ডাকাতেব সর্দারের ভক্তিতে গর্জ্জন কবিয়া কহিল—‘আগ্ কাটস্—জলেব মইধো পুইতা ফালাম্ না—’

হবি মণ্ডলও জেলেব বাচ্চা, সেও কম যায় না। চক্ষের পলকে সেও পাটাতনেব তলা হইতে একটা শড়্কি বাহির কবিয়া কুখিয়া দাঁড়াইল এবং বৃন্দাবন বৈঠাটা মাথাব উপর উত্তত কবিয়া বন্ বন্ কবিয়া ঘুবাইতে শুরু কবিয়া দিল।

ক্রোধে জলিয়া উঠিয়া বিবাট আদেশ দিল,—‘লাগা—শালাগো মাথা ববাবইব লাগা—’

‘এই, শুনচো ? শুনচো ? এই—’

যুধ্যমান দুই দলই চমকিয়া চাহিল।

‘এই, কে তোমাদেব ঝগ্ড়া করতে বলেচে ? থামো, থামো বলচি—এক মিনিটে শড়্কি নামিয়ে নাও,—নামাও। কেউ ঝগ্ড়া করতে পাববে না বলচি—বাস্।’

দুই হাতের দুই কল্লুই দিয়া পাশের লোক ঠেলিয়া রাজা সমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকটা সমুখ দিকে ফুলাইয়া দিয়াছে, মাথাটা আধিপত্যের গর্বে উদ্ধত, কণ্ঠে তাহাব আদেশের স্বব।

‘কে আমি, জানো ? জমিদার দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি আমার বাবা । আমার বাবা বাঘ, জানো, বাঘ । তাব যদি রাগ হয়, ঘাডেব ওপব তবে আর কারুর মাথা থাকবে না । সেই আমি বলচি,—খবরদার, একটুও ঝগড়া করতে পারবে না—ব্যস্ !’

বিব্যাট জেলে শুধু যে দুর্গাপ্রসন্নের প্রতাপের কথা জানিত, তাহাই নহে, উৎসব উপলক্ষ্যে একাধিকবার জমিদার চৌধুরিদেব বাড়িতে মংশ সন্মেলন করিয়াছে এবং যাত্রাগান শুনিতে কতবার যে সেখানে গিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই । বাজাকে দেখিয়া বিস্ময়ে সে হতবাক হইয়া গেল । কহিল, ‘ছোটবাবু । আবে বে, আপনে আইলেন ক্যামতে ?’

‘আমি মাছধবা দেখতে এসেছি । নামাও সব, শড়্‌কি নামাও—দু’দলই নামাও—ব্যস্ ।’ রাজা আব ক্ষুদ্র বালক নয়, সে প্রভু, সে হুকুম কবিতে জানে । পলকে সমস্ত শড়্‌কি নত হইল ।

বিব্যাট কহিল—‘কিন্তু অগো কাণ্ডটা দেখলেন তো, হুজুব ? আগ্‌ কাইটা এই যে মাছ লইয়া গেল, এইব কোনো বিচাব হইব না ?’

‘কাল বিচাব হবে—যাবে আমাব বাবাব কাছে । কিন্তু খবরদার, নিজেরা ঝগড়া কববে না ।—যাও, মাছ ধব গিয়ে,—আব শুনচো, দু’দলই আমাকে পাঁচ পাঁচটা করে ইলিশমাছ দেবে, বুঝেচো ? আমাব দিদি এসেচে কিনা,—কমে হবে না ।’

যুদ্ধের মেঘ মঙ্গবলে উড়িয়া গেল । পাটাতনের তলায় শড়্‌কি-গুলি অদৃশ্য হইল, দুই ডিঙি বিভিন্ন দুইদিকে মংশ-শিকাবে ছুটিল । শুধু বিব্যাট দ্বব হইতে চিৎকার করিয়া শুনাইয়া দিল—‘বড বাইচা গেলি বে, বড বাইচা গেলি ।’ কিন্তু প্রত্যুত্তব না পাওয়ায় চূপ কবিয়া গেল ।

অসম্ভব রকম ইলিশমাছ সেদিন উঠিতে লাগিল ; এত মাছ সচবাচব কোনও দিন ওঠে না । সাবা রাত তাহারা মাছ ধবিল, এবং যখন থামিল, অন্ধকার আর তখন নাই ।

## এগারো

রাজার অন্তর্দ্বারের বিষয় শেষবাক্যেই ধরা পড়িয়া গেল ; এবং তারপব হইতে সারা বাড়িতে এবং ক্রমে সারা গ্রামময় ছলছল পড়িয়া গেল । শেষবাক্যে দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমত প্রার্থনা কবিতো উঠিয়াছিলেন এবং প্রথমতই তিনি পাশেব ঘবে নিদ্রিত পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন । দেখিলেন, বাজা নাই । সামান্য বিস্মিত হইয়া বাবান্দায় খোঁজ কবিতো গেলেন, সেখান হইতে ক্রমে নিচে নামিয়া সভয়ে আবিষ্কার কবিলেন,—নিচেব বড় দবজা বন্ধ নয়, আলগোছে ভেজানোমাত্র । তাবপব হইতে কী যে নিবাট অন্বেষণ শুরু হইয়াছে, তাহা আব বলিবার নয় । গ্রামেব প্রতি পাড়া, প্রতি বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা হইল, জেলে নামাইয়া প্রতিটি পুরুবিগী জাল দিয়া ছাঁকিয়া ফেলা হইল—যদিও বাজা জলে ডুবিবে, এমন সম্ভাবনা খুব কম । এমন কি জেলেবা খালের মধ্যে পর্য্যন্ত ইতস্তত জালেব ক্ষেপ ফেলিয়া চলিল । কিন্তু বাজাব কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না । সম্পূর্ণ বহুশ্রমক ভাবে সে অদৃশ্য হইয়াছে ।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কেবলই মাথা চুলকাইয়া হয়বাণ হইতেছেন—‘অদ্ভুত, অদ্ভুত শিক্ষা পাছে পাড়াগাঁয়ে—অবাক হয়ে যাই, দেখতো একবাব কাণ্ডটা—ট্রেনিংয়েব অভাব ছাড়া আর কিছু নয় । জহব আব মিলিকে এমন করে ওর সঙ্গে ঘুবে বেড়াতে দেওয়া কিছুতেই আর সেফ হবে না—’

হৈমন্তী সত্যিকাবেব ভয় পাইয়া গেল, এবং আন্তরিক উদ্বেগে বাজাব উপর সহসা তাব অত্যন্ত ক্রোধ হইতে লাগিল—‘হাড দুষ্টু ছেলে, একবাব কাণ্ড দেখ তো । কোথায় গেল, কি হলো, তার কি একটু পাত্তা আছে । —ও অস্থিরদাদা, একবাব নেডানেডিব আখ্ভায় লোক পাঠাও না, শুনেচি ওদিকে ওটা—’

‘তা কি এতক্ষণ আব বাকি আছে, দিদিমণি—কিন্তু তাব টিকিবও দেখা নেই। ভোজবাজির মত একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নিজে না বোঝেয়ে এলে অগেব সাধ্য কি খুঁজে বের করে। আমাব তো এখনও মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই কোথাও লুকিয়ে আছে—চালাক ছেলে দিদিমণি—তার অনিষ্ট করা কান্নর পক্ষে সহজ নয়। ইদিকে কর্ত্তা মুখ দিয়ে আব কথাটুকু বের কবতে পারছেন না, একেবারে স্তব্ধ মেবে গিয়েছেন—’

ইন্দির ঠাকুরাণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাব সনাতন পদ্ধতি অমুসারে উচ্চৈশ্ববে ক্রন্দন উঠাইলেন—‘বোমা গো, আমাব সোনাব প্রিস্তিমা গো, তোমাব নয়নের মণি আমি নিজ অবহেলায় হারাইলাম গো—কেমুনে তোমারে মুখ দেখামু—’

সমস্ত বাড়িৰ যখন এই অবস্থা, এমন সময়ে দুই হাতে অত্যন্ত মুস্কিলেব সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ বহন কবিয়া বজতপ্রসন্ন খালেব দিক হইতে প্রসন্নবদনে অগ্রসব হইয়া আসিতে লাগিলেন। বেলা নয়টা কিংবা সাড়ে নয়টা হইয়াছে, অতি দ্রুত নৌকা বাওয়ায় তবেই এত শীঘ্র আসা সম্ভব হইয়াছে। ব্যাপারীদেব কাছে মাছ বিক্রি কবিতেই বেলা হইয়া যায়, রৌদ্র জমিয়া ওঠে, তারপর খালের পথে তিন ক্রোশ পথ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসা কম উত্তমবে কথা নয়।

রাজাব বিশ্বাস ছিল, পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ দুর্ভেগ্ন বর্ষেব কাজ কবিবে। বাবা যদি ধমক দেন বা দিদি যদি বলে—কোথায় গিয়েছিলি, সে বলিবে, দিদির জন্ত পদ্মা হইতে তাজা ইলিশমাছ আনিতে গিয়াছিল—‘কেমন বড বড মাছ নিজ হাতে বেছে এনেছি, দেখ।’ কিন্তু বাজাকে দেখা মাত্র একটা অতিশয় পুষ্ট জনতা হইতে যে প্রকাব উচ্চগ্রামেব বাক-এক্যতান উদ্ভিত হইল, তাহাতে বাজার ভবসা কবিবার বিশেষ কিছুই আব বজায় রহিল না।

হৈমন্তী সৰ্বপ্রথমে ছুটিয়া আসিল। চোঁচাইয়া কহিল—‘ওরে

ডাকাত, গিয়েছিলি কোথায়? ওবে, তুই যে মাহুষ খুন কবতে পাবিস্।’

‘জ্ঞাখা না, দিদি, একবার চেয়ে—কেমন পাঁচ পাঁচটা মাছ নিয়ে এলাম। পদ্মার থেকে তুলেছি আব নিয়ে এসেছি,—একটু আগেই নড়ছিল—’

‘পদ্মায় গিয়েছিলি কি রে ডাকাত। আবে ওবে বলিস কি তুই?’

‘নইলে খালে বুঝি আবাব ইলিশমাছ ধবা যায়।’ অবজ্ঞাব সঙ্গে এই কথা বলিয়া বাজা অগ্রসব হইতে উত্তত হইল। তাব বডই ঘুম পাইয়াছে, তাচ্চাড়া এত ক্ষিধে পাইয়াছে এবং হুঁসল লাগিতেছে যে, বলিবাব নয়। কিন্তু অগ্রসব হওয়া সহজ কথা নয়। বাধা পাইয়া সে দেখিল, অভিমত্যায মত চতুর্দিকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের জনতা ভিড কবিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত উপদেশ এবং মন্তব্যগুলি একই সঙ্গে নিঃশেষ কবিয়া ফেলিবাব জ্ঞপ্ত প্রস্তুত।

‘অদ্ভুত ছেলে হয়েছে—ঠিক মতন ট্রেনিং পাচ্ছে না।’ ‘ও আমার নয়নেব মণি, এমুন কইবা কই গেছিলি বে।’ ‘বড হুবস্ত ছেলে, কিন্তু চালাক্ আছে, এই তো পাঁচ পাঁচটা মাছ জোগাড় কবে নিয়ে এসেচে।’ ‘বলিহাবি যাই সাহসেব। জাঘবাত্রে পদ্মায় গিয়া মাছ ধইবা লইয়া আইল। বলি, দেখচোনি বুকব পাটা—’

‘সব্ না মোক্ষদা,—পথ আটকে বেখেছিচ্ কেন? মান্বেষেব বুঝি ঘুম পায় না। নিজেবা মজা কবে সাবাবাত ঘুমিয়েচেন কিনা—’

‘মোক্ষদা, বাদবটাকে নিয়ে যা—খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দে গে। আগে একটু স্নস্ হোক, তাবপীব দেখা যাবে—’

কণ্ঠস্বব শুনিয়া বাজা শিহবিয়া উঠিয়া আডচোখে চাহিয়া দেখিল, বাবা—এবং ওদিকে আব চোখ না তুলিয়া সটান দালানের দিকে হাঁটিয়া

চলিল, এবং মোক্ষদার হাতে অমূল্য ইলিশমাছগুলি জিন্মা করিয়া বরাবর দোতলায় উঠিয়া গেল।—মিছিমিছি সবাই বাগ দেখাইতেছে ! পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ জোগাড় কবিয়া আনিল, একটু প্রশংসাও যদি কেউ করিল—বয়ে গেল—

দুর্গাপ্রসন্ন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বৃকেব মধ্য হইতে যেন একটা ভাবি পাথর নামিয়া গেল—দ্রুত নিশ্বাস টানিয়া তিনি বুক পূর্ণ কবিত্তে, লাগিলেন। গতবাত্রে তিনি একপ্রকার মনস্থির কবিয়াছিলেন যে, জমিদারি একটা অংশ হইবেব পুত্র জহবকে লিখিয়া দিবেন ; কিন্তু বাজার অন্তর্ধানব সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটাব আয়তন ক্রমেই কমিয়া আসিতে আবস্ত কবিল, এবং অবশেষে বাজাব নিবাপত্তা সম্বন্ধে আশা কবিবাব যখন আব কিছু বহিল না, তখন অকস্মাৎ তিনি সিদ্ধান্ত কবিলেন—না, একটুও না—প্রত্যেকটা টুক্বা আমাব বাজাব, এব এক কণাও আমি বিলিয়ে দেব না ; সব তাব—সব তার, সব কিছু তাব। অত্বে উপহার দিতে পারি, কিন্তু সত্যি বলচি, সম্পত্তিব একভাগও তাব ছাড়া আব কারুব নয়,—তুই বাগ কবিস্ না—

বাজা আসিয়া পৌঁছানয় বাড়িতে আলোচনা থামা দুবেব কথা, ক্রমেই তাহা বর্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুরুষ-মহল এবং স্ত্রী-মহলে চাঞ্চল্যকব সব গল্প উঠিল, এবং বাজাব অত্যাচ বহু দুঃসাহসিকতাব কাহিনী শুনিয়া কেহ বা চমৎকৃত, কেহ বা শিহবিত, কেহ বা বাগাস্বিত হইয়া উঠিল।

বেলা আন্দাজ বারোটা ; বাজা তখনও অকাতবে নিদ্রা যাইতেছিল। কাছাবিবাড়িতে বসিয়া দুর্গাপ্রসন্ন তখনও লোকজনব সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কবিত্তেছেন, বেলা একটা দেড়টার আগে মধ্যাহ্নের আহাব হয় না। ভোব হইতে এই দ্বিপ্রহর অবধি তিনি জমিদারি কাজকর্ম দেখেন।

নানাস্থানের প্রজা, অর্থী-প্রত্যর্থী, পণ্ডিত এবং অজ্ঞান্বেব অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং লোকজনেব সহিত আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

‘আইজা, কৰ্ত্তা, নমস্কার—আমি কুহুমতলিব বিরাট জাউলা—’

দুৰ্গাপ্রসন্ন ফিরিয়া তাকাইলেন, দেখিলেন, প্রৌঢ়াকৃতি বলিষ্ঠকায় এক জেলে বেতেব আঙুটায় বাধা বড় বড় পাঁচটা ইলিশমাছ হাতে ঝুলাইয়া দণ্ডবৎ কবিয়া উঠিল।

‘কি চাই তোমাব?’ দুৰ্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

‘আইজা, হুজুবেব বাড়িতে আমি বিয়া-থাওয়ায় কতবাব মাছ দিছি। আমি কুহুমতলিব জাউলাব সৰ্দাব—’

‘কিন্তু এখন তো মাছেব কোনও দবকাব নেই, বিবাট।’

‘আইজা তা না।—ছোটবাবু কাইল গাঙে গেছিল কিনা মাছ ধবণ দেখতে, কইয়া দিছিল পাঁচটা মাছ দেওনেব লাইগা। একটু দেবি হইয়া গেল, কৰ্ত্তা,—কিন্তু ছোটবাবু কই?’

‘ঘুমোচ্ছে। তোমাবই সঙ্গে কি পদ্মায় গিযেছিল?’

‘আইজা না। গেছিল পদ্ম জাউলাব পোলা মাইনুকাব ডিক্রিতে। কিন্তু হুজুব অমুন আব যাইতে দিযেন না—বড় সৰ্বনাশেব কথা। কাইলই তো দাঙ্গা বাঁধছিল আব কি। এমুন সময় ছোটবাবু উইঠ্যা দাঁড়াইয়া দুই ধমকে আমাগো থামাইয়া দিল। এন্তটুকু পোলা, তার ত্যাজ কি কৰ্ত্তা। বকা থাইয়া নি আমবা থ’ মাইবা গ্যালাম।’ বলিয়া বিবাট আশুপূৰ্বিক গত রাত্তরের কাহিনী বিবৃত কবিল। শুনিয়া আতঙ্কে, বিস্ময়ে, এবং তারপব অকস্মাৎ এক পরম গৰ্বে দুৰ্গাপ্রসন্ন শিহবিয়া উঠিলেন। বাজা। রাজা যে এন্তোটুকু ছেলে। ওবে, তোবা বলিস্ কি—

‘পদ্ম জাউলাব বিরুদ্ধে আমাব এই নালিশটা আমি হুজুবেব কাছে নিবেদন কইয়া গ্যালাম।’ অবশেষে বিবাট কহিল।

‘আচ্ছা, আমি দেখব, নিশ্চয়ই দেখব;—তুমি পেয়াদাদেব ঘবে  
বিশ্রাম কর গিয়ে, না খেয়ে যেওনা কিন্তু,—অম্বিকা, যাবার সময় একে  
নতুন একজোড়া কাপড় দিতে ভুলোনা যেন—’ অদ্ভুত, অদ্ভুত তো—  
এতটুকু ছেলে—বাজা যে এতটুকু ছেলে !

‘ও ইন্দিব দিদি, কবচে কি সে—জ্ঞেগেছে ?’

‘না, অখনও ঘুমায় ।’

‘ঘুমাক, ঘুমাক,—বেশ করে’ ওকে ঘুমোতে দাও—কেউ যেন ওকে  
জাগিয়ে না দেয় । এতোটুকু ছেলে, কী ওব কাণ্ড, কী বীবদ্ধ দিদি—  
ঐয় বিশ্বেস হয় না !—’ সহসা পবলোকগত! স্ত্রীব জগ্ন দুর্গাপ্রসন্নের  
দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল—‘দেখে যেতে পারল না, ওব মানুষ  
হয়ে ওঠা দেখতে পেল না—’

নিদ্রা হইতে উঠিতে বজ্রতপ্রসন্নের প্রায় বিকাল হইল । দেখিল,  
চতুর্দিক কেমন ছায়াচ্ছন্ন; বিস্মিত হইয়া সে এধাব ওধাব তাকাইতে  
লাগিল । ঠিক পিছনেই ইন্দিব পিসিমা বসিয়াছিলেন, পবম স্নেহে  
রাজার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন ।

‘মেঘ করেছে, পিসিমা ?’

‘ম্যাঘ ? ম্যাঘ দেখলি কই ? আবে, পোল্লাপ বকস্ নাকি ?’

‘ধোৎ । তবে তেল আন, চান কবব ।’

‘ছান কববি ? কস্ কি । আবে বিকাল পড়েছে যে, ছান কইবা  
জবজারি কব আর কি ।’

‘বিকাল ।’ সবিস্ময়ে বাজা কহিল । ‘দুপুবে খেলাম কই ? বাঃ রে,  
আমার ইলিশমাছের ঝোল । এতো হান্ধামা কবে আনলাম—বেশ তো,  
আমাকে খেতেই দিলে না—বেশ তো—’



‘সব আছে, যাদু, তোমার লাইগা সব তোলা আছে, থাইবা চল।  
আমার সোনার বাছা বে, মুখটা কতটুকু হইয়া গেছে—’

পিসিমার সঙ্গে যাইয়া বাজা পিঁড়ি উপর জাঁকিয়া বসিল, এবং পর-  
মুহূর্ত্তে এমনই গোগ্রাসে ভাত গিলিতে আবস্ত কবিয়া দিল যে, স্পষ্ট মনে  
হইল এক মহাতুর্ভিক্ষের দেশ হইতে সে সত্তমাত্র পালাইয়া আসিয়াছে।  
সমস্ত পদ একই সঙ্গে ভাতের উপর ঢালিয়া লইল—আলাদা আলাদা  
মাখিবাব মতন সময় অপব্যয় করা পেটের এই অবস্থায় অসম্ভব।  
দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভাত এবং তবকাবি অদৃশ্য হইয়া গেল। কহিল,  
‘কী চমৎকার ইলিশমাছ,—কোনও জন্মে এমন মাছ খাইনি—যা স্বাদ।  
কত শঙ্কামা হবে আনলুম—তা কেউ কি একটুও ভাল বললে—’

‘ছোটবাবু, কর্তায় তোমারে ডাকচে।—’

বাজা অঁচাইতেছিল, নিশাব স্বপন সম মোক্ষদা আসিয়া এই বার্তা  
জ্ঞাপন করিল। পলকে ইলিশমাছেব অপূর্ণ স্বাদ পর্যন্ত বাজার মুখ  
হইতে তিবোহিত হইয়া গেল। এমন আনন্দ যে মোটেই লোভনীয়  
নয়, তাহা বুঝিয়া লইতে তাব একটুও বিলম্ব হইল না। বাবার  
তখনকার চোখের সেই দৃষ্টি দেখা অবধি বাজাব মনে আব শান্তি ছিল না।

‘কেন?’

‘তার আমি কি জানি,—ডাকচে যাও।’

‘ডাকচে, যাও!’ বাজা ডেঙুচাইয়া কহিল। ‘কোথায়?’

‘ঐ খালপাড়ে তেনি খাড়াইয়া আছেন, বাদামগাছেব তলে—  
তড়াতাড়ি যাইতে কইচেন।’

ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে যাইবার সময় কয়েদী যেমন যায়, রাজা মুখখানাকে  
তেমন বিরস এবং মরীয়ার মত করিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছুক পদক্ষেপে  
খালের দিকে অগ্রসর হইল। বেশ, মারুক, যত ইচ্ছা মারুক—একটা

কথাও সে বলিবে না, একটুও কাঁদিবে না, একটুও চোঁচাইবে না—মিছি-  
মিছি সবাই মারবে—এমন পদ্মায় গিয়ে মাছ-ধরা দেখে এলুম—এমন  
পাঁচ পাঁচটা মাছ মাণিকের কাছ থেকে নিয়ে এলুম—বিরাত জেলেটা  
ভারি কিপ্টে, দিলেনা মাছ, নইলে সবশুদ্ধ দশটা হতো—তা একদিন  
না হয় গেলুমই, ডুবে তো আর যাইনি—

‘রাজা !’

দুর্গাপ্রসন্নের ডাকে রাজা চমকিয়া থামিল। দেখিল, বাবাব মুখ  
অতিশয় প্রসন্ন, ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই।

‘বাজা, কাছে আয়, বাবা !’

এ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাজাব আর ভয় রহিল না। এ তো তিরস্কারের  
কণ্ঠস্বর নয়, এ যে স্পষ্ট আদবেব ডাক। এইটুকু বুদ্ধিতে পারিয়াই হাসি  
চাপা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল—কি ভয়ে ভয়েই না আসিয়াছিল।  
হি হি কবিয়া হাসিতে হাসিতে সে কহিল—‘কেমন তামাসা করে  
এলাম, না বাবা—হি হি হি—এই বারটি তুমি বকো না, বাবা। কেমন,  
ইলিশমাছগুলি খুব ভাল নয়?—খুব স্বাদ—’

‘হ্যাঁ, খুব।’

‘তবু তো বিরাত জেলেটা মাছ দিয়ে গেল না। ওটা শড়কি নিয়ে  
ঝগুড়া বাঁধাতে এসেছিল—আমি বল্লুম—খববদাব, ঝগুড়া কবতে  
পারবে না,—বাস্—আমাব বাবা বাঘ।—যদি শোনে, তোমাদের  
কাঁধে একটিও আব মাথা থাকবে না—হি হি হি—এমন ধমকে  
দিলাম—’

‘বিবাত তোঁর মাছ দিয়ে গেচে, রাজা।’

‘ক’টা? পাঁচটাই দিয়েচে তো?’ রাজা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

‘রাজা?’

‘বাবা।’

‘আমি যখন মবে যাব, এত সব প্রজাকে তুই শাসন ক’রে রাখতে পাববি তো?’

‘খুব। কিন্তু তুমি মরবে না—যেং।’

‘শুধু শাসনই নয়, এদেব কত সাহায্যও তোকে সর্বদা কবতে হবে। বড় গরিব ওবা, বড় সহায়হীন। ওরা যাতে উপোস কবে না মবে, তা তোকে দেখতে হবে, ওরা যাতে বিনা চিকিৎসায় না মবে, তা তোকে দেখতে হবে—’

‘দেখবই তো।’ বাজা সগর্বে কহিল।

‘সব তোকে আমি দিয়ে যাব—সব তোকে দিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় জেনেচি, তুই পাববি, ঠিক পাববি।’—সহসা বাষ্পোচ্ছ্বাসে দুর্গাপ্রসন্ন কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। রাজা বিস্মিত হইয়া বাবাব মুখেব দিকে তাকাইল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পাবিল না। সহসা সে উচ্চৈশ্ববে তাহাব স্বভাবহীন হি হি আরম্ভ কবিয়া দিল। সেই হাসিতে খালের জল, শস্ত্রপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর, অট্টালিকা এবং আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

‘বাজা, আমাব কাছে আয়।’

রাজা অগ্রসর হইয়া বাবাব গায়েব সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইল। স্বভাবতই গম্ভীর-প্রকৃতি দুর্গাপ্রসন্ন সহসা গাম্ভীৰ্য্য হাবাইয়া ফেলিলেন। রাজার মাথাটা নিজেব বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, দুই চোখ দ্বিয়া দব্দদব্দ কবিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।—বাজা আব অসহায় শিশু নয়, সে আদেশ কবিতে শিখিয়াছে;—ক্রুদ্ধ জনতাকে সে ব্যক্তিত্বেব তরবাৰি দ্বাবা শাসন কবিতে পাবে। এ গর্বে দুর্গাপ্রসন্ন আজ কোথায় ধরিয়া বাখিবেন।

সহসা রৌদ্রকবোজ্জ্বল পদ্মাব মহিমময় দৃশ্য তাঁর দুই মূর্তিত চোখে ভাসিয়া উঠিল।—কত প্রাণ, কত সঙ্গীত, কত গাম্ভীৰ্য্য, কত গৌরব এই

বহুমুখী নদী অকাতবে বিলাইয়া দিতেছে। পদ্মা নিজ হাতে যাহাকে শিক্ষা দেয়, তাহাব চাহিবাব আব কিছুই বাকি থাকে না, শৌর্য্যে তাব বুক পূর্ণ হয়, মহাশ্বে মন হয় উদাব, মর্যাদায় সে সকলের উর্দ্ধে ওঠে—একই সঙ্গে সে হাসে এবং শাসন কবে। পদ্মার জন্ত এক অপূর্ণ কৃতজ্ঞতাবোধে দুর্গাপ্রসন্নেব চিত্ত আগ্রত হইয়া উঠিল। মনে মনে শুধুই বলিতে লাগিলেন—এতোই যদি মা তুই দিস্, এতই যদি শক্তি ধারণ কবিস্, এতই যদি তোব কৃপা, তবে, মা, কেন এমন কবিয়া আমাব ঘব ভাঙিয়া দিলি ?

বহুমুখী নদী এই প্রশ্নেব কোনও জবাব দিল না। পৃথিবীব তটপ্রান্তে বারম্বার আঘাত কবিয়া বলিতে লাগিল—ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্—

# ପଦ୍ମା-ପ୍ରସନ୍ନା ନଦୀ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ



## এক

ইংরেজী ১৯২৯ সাল ।

ল' কলেজ হস্টেলের পাঁচতলার এক ঘরে রাত্রিবেলা আঠাবের পব গুটিকম্ব যুবক আড্ডা দিতেছিল । বস্তুতঃ, ইহাকে আড্ডা না বলিয়া সঙ্গীতের আসবাব বলা চলে । পূর্ণানন্দ দাস এতক্ষণ ধরিয়া বাঁশিতে অতি সুমিষ্ট ভূপালী আলাপ করিয়া সবেমাত্র থামিয়াছে । বেচাবাকে বিশ্রাম দিবার জন্তই গল্পগুস্তাবেব স্থত্ৰপাত করা হইয়াছিল ; তবে মুন্সিল এট, একবার গল্প শুরু হইলে থামিবাব লক্ষণ দেখা যায় না, এবং বিষয়টা যদি একবার স্ববাক্স বা সমাজতত্ত্ববাদে পৌছায় তবে অর্ধবাত্র পর্য্যন্ত তর্ক চলিতে থাকে । সিনেমা-অভিনেত্রী হইলে বাত দশটার বেশি হয় না, নৃত্যপটঙ্গী স্তম্ভনা চৌধুরীবা কথা আশু কিছু বেশিক্ষণ চলে, এবং ল' কলেজের অধ্যাপকদের কথা উঠিলে দশ মিনিটেব মধ্যে সকলেব ঘুম পাইয়া যায় ।

সময় ভট্টচাক্স ছাত্রসমিতিব সেক্রেটারি । ছাত্র-ধর্মঘট পবিচালনা কবিয়া এখন সে পাকা বাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে । তাব বিশ্বাস, বর্তমান গতিতে প্রসিদ্ধি লাভ কবিতে থাকিলে অচিবে সে ধনতান্ত্রিকতাব বিরুদ্ধে দেশেব সমগ্র শ্রমিকমণ্ডলীবা ক্রুদ্ধ আক্রমণ পবিচালনাব যোগ্যতা অর্জন কবিতে পারিবে । সমুখব টেবিলটায় এক প্রচণ্ড চাপড দিয়া সে কহিল—‘তোমবা যে-স্ববাক্স চাও, সে-স্ববাজেব অর্থ কি, ডান ? তাব অর্থ, দশবিশটা মিলেব মালিক, দশবিশটা ধনী মহাজন, কিছু ধুবঙ্কর বেকাব নেতা, কিছু স্বার্থাঘেযী বিদেশী ধনিক তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবাবা পূর্ণতব স্বযোগ পাবে ।—কী লাভ হবে এতে সর্বসাধারণেব, অগণিত মুক জনমণ্ডলীবা, যাঁবা হাল চাষ কবে’ শব্দ উৎপাদন কবে, কিন্তু খেতে পায় না, ধনীবা ভোগের উপাদান সংগ্রহ করতে যাঁরা কারখানাৰ যন্ত্র-

দানবেব উদরে নিজেদেব বিসর্জন দিয়ে ছি'ব্‌ডে হয়ে বেরিয়ে আসে ? যে-স্বরাজ তোমাদের লক্ষ্য, পাববে তা এই বক্ষিতদেব বাঁচাতে ? কি উপকারে লাগবে সংখ্যাতীত জনসাধাবণেব এই তথাকথিত আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকাব ? তোমাদেব এ-স্বরাজ কতগুলি মিল-মালিকেব স্বরাজ । জনসাধাবণেব স্বরাজ একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদেব মধ্যে । কিন্তু তোমাদের কংগ্রেস এ-সম্বন্ধে তাদেব মতামত এমন অস্পষ্ট করে বাথচে কেন ?—জিঞ্জেস কবি, এই স্বরাজে বড় বড় মিল-মালিকদেবই বা এতটা আগ্রহ দেখি কেন ?—'

প্রবীর বর্দ্ধন কহিল, 'মিল-মালিক হলেই কি তাব স্বাধীনতাব আকাজক্ষা লোপ পেতে হবে ? এ তো অদ্ভুত মতবাদ ।—'

'অদ্ভুত এটা নয়, যা অদ্ভুত তা' হলো তোমাব ধনিক-মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা ।'—সমব উত্তেজিতস্বরে কহিল । 'জগত্বেব ধনিকে ধনিকে আছে পৈশাচিক সখ্য । জগৎ জুড়ে ধনতান্ত্রিকতাব ষড়যন্ত্র চলচে । তাদেব উদ্দেশ্য সর্বসাধাবণকে লুণ্ঠন, তাদেব দর্শন—স্বার্থপবতা ; তাদেব স্বপ্ন হচ্ছে, স্বর্ণ, তাদেব-ধর্ম হচ্ছে—ভোগ । স্বাধীনতাব স্পিবিচুয়াল সিগ্‌নিফিকেন্স্—বা তোমাকে আমাকে, যদু মধু হবিকে মুগ্ধ কবে, আত্মত্যাগে উদ্ধুদ্ধ কবে—জ্বলেব মধ্যে পচিয়ে মাবে—ধনিকসম্প্রদায়েব তাতে সামান্য কাণা-কড়িও এসে যায় না । স্বাধীনতাব কোনও আধ্যাত্মিক মূল্যই তাদেব কাছে নেই ! তারা টাকাব দামে মূল্য হিসাব কবে ।—ওদেব দেবতা—ম্যাম্‌ ।'

তর্কটা হইতেছিল প্রধানত সুনন্দ গাঙ্গুলিব সঙ্গে । সুনন্দেব এক পিসেমশায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন হোম্বা-চোম্বা, ব্যবসায়ে ব্যাবিস্টর । সুনন্দ তাই এই হস্টেলে বহুলাংশে নিজেকে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির কার্যাবলীেব একজন পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বিবেচনা করে । এই একই কারণে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্রনেতা সমব ভট্টাচার্য



সে বিশেষ আক্রমণেব লক্ষ্যবস্তু। সুনন্দেব প্রতি সমবেব কংগ্রেস-সমা-  
লোচনাব শ্রান্তিহীন বাগ্মিতা নিষ্কিপ্ত হইয়া থাকে।

সুনন্দ কহিল, ‘স্ববাজ যদি না-পাওয়া যায়, তবে সমাজতন্ত্রই বা আসবে  
কোথা থেকে, এই কথাটা ভিজ্জাশা কবি, সমব ভট্টচাজ ? আমবা সবাই  
এক মত যে, দেশেব কল্যাণেব জন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—যাকে  
বলে—ফ্রি প্রাইমাৰি এডুকেশান—প্রবর্তন কবা অত্যাৱশ্যক। কিন্তু  
প্রবর্তনটা কে কব্বে ? ফ্রি এডুকেশান একান্ত প্রয়োজনীয় বলে, আমাদের  
প্রভুবা মিলিটাৰি বাজেটটা কি একটুও কমাবেন ?—তবেই বোঝ, যে-  
কোনও কল্যাণকব আন্দোলনেব বন্ডিশন প্রিসিডেট হচ্ছে স্ববাজ। স্ববাজ  
লাভেব আগে অত্ৰদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা হবে আত্মহত্যাৱ নামাস্তব। অর্থাৎ  
সেটা হবে—’

‘সেটা হবেন’, কথা কাড়িয়া লইয়া সমব সবাজে কহিল, ‘কংগ্রেসেব  
অৰ্ধসাহায্যকাবী মিল্-মালিকদেব স্বার্থবিবোধী। যুদ্ধ যখন বেঁধেছে, তখন  
প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যটা নিদ্ধিষ্ট কবে নেওয়া উচিত। কেন আমবা যুদ্ধ  
কবচি ? কোন্ নিদ্ধিষ্ট লাভেব জন্ত, কোন্ নিঃসন্দেহ আদর্শেব জন্ত, কোন্  
অভ্রান্ত কল্যাণেব জন্ত সংগ্রাম করচি, তা আগে থাকতেই ঠিক করে নাও।  
জনসাধাৰণেব সহায়ত্বভূতি যদি লাভ কবিতে চাও, তবে তোমাদের চবম  
উদ্দেশ্যেব রূপটা তাংদেব দেখতে দাও। অর্থনৈতিক পবাধীনতা রাষ্ট্রিক  
পবাধীনতাৱ চাইতে কম পীড়াদায়ক, কম পাশবিক নয়। যুদ্ধ যখন একবার  
আবস্ত হযেছে, তখন সমস্ত বিকল্প-শক্তিব সঙ্গে পাঞ্জা কবা হয়ে যাক্—  
ছ’বার কবে যুদ্ধ কবা কাকব পক্ষেই লাভেব নয়। তোমাদের বড বড  
কংগ্রেস-নেতাৱা এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট করে অভিমত ব্যক্ত কবছেন না কেন ?  
ইহুটা এমন ধোঁয়াটে কবে বাখাব হেতুটা কি ?—’

সুনন্দ কহিল ‘কেন, পণ্ডিত জওহরলাল বা স্বভাষচন্দ্র তো এ-সম্বন্ধে  
নিজেদেব অভিমত গোপন রাখেন নি ? তাঁরা তো স্পষ্ট করে নিজেদেব

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—

‘তাঁরা যাই বলুন না, তাতে কংগ্রেসের কিছু এসে যায় না। এরা এক সময় কংগ্রেসের কর্ণধার হতেও পাবেন, কিন্তু এখনও তাব দেবি আছে। কংগ্রেস এখন কাদের মত মতন চলছে শুনবে?—তাদের নাম কববো? থাক—কিন্তু তাবা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, এটা অতিশয় নিশ্চিত সত্য—’

‘সমাজতন্ত্রও একটা নির্ভুল ক্রটিহীন সমাজব্যবস্থা নয়,’ সুনন্দ পিসেমশায়েব প্রতিনিধিস্বরূপ কংগ্রেসেব বামপন্থীদের উদ্দেশে কহিল। ‘একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যবস্থা হিসাবে, কম্যুনিজম্ ছোডে দাও, সোশ্যালিজমই কতটা সচল, এখনও তা প্রমাণিত হ’তে বাকি আছে।—মানুষেব চিবন্তন খর্ব্বতা এই যে, তাব কল্পনা তাব সামর্থ্যেব অনেক উর্দ্ধে বিচরণ কবে। যাকে আমবা ভাল বলে কল্পনা করতে পাবি, জীবনে তাব কপ দিতে গিয়ে ভালর চাইতে যদি মন্দ বেশি কবে বসি তাতে বিশ্বয়েব কিছুই হবে না। বাশিয়াব নয়। ব্যবস্থা অত্যন্ত অল্পদিনেব, এখন পর্য্যন্তও তা বিশ্বয়কব কোনও ফল-প্রসব কবে নাই। দুর্ভিক্ষ, ব্যক্তিস্বাধীনতাৰ হ্রাস, অর্থনৈতিক গোলযোগ—আমবা তো প্রধানত এই সবই দেখতে পাচ্ছি। অস্তুত, এমন কোনও বিশ্বয়কব উপকাৰ দেখি না যাতে ভাবতবর্ষে তা প্রবর্তনে কিছু দেরি হলে মাঝামাঝি ব্যাপাব ঘটবে। দেশে এম্নি যেন বিবাদ-বিসম্বাদের অভাব।—এব ওপর আবাব সোশ্যালিজম চাপিয়ে মাঝামাঝিটা বাডান কেন?’

সমব সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, অধৈর্য্য হইয়া সে কেবলই প্রতিবাদ কবিবার চেষ্টা কবিতেছিল, কিন্তু সক্ষম হইতেছিল না, সুনন্দও বক্তৃতাতে এমন দক্ষ। সুনন্দও ছাত্র-নেতা, তবে তাদের প্রতিষ্ঠান সময়দের প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন—এমন কি এদের প্রতিষ্ঠানেব প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। কাজেই উপস্থিত সবাই বুঝিল, তর্ক-যুদ্ধটা আজ রীতিমত

জমিয়া উঠিবে, এবং আশেপাশের ঘরে কাহাবও নিদ্রা যাওয়া আর সম্ভবপর হইবেনা। সঙ্গীতের আসব জমিবাব আ' কোনও সম্ভাবনাই বহিল না। বাঁশির স্থানে অসি—যদিও বাচনিক অসি—আসিয়া আফালন করিয়া উঠিল।

‘বুর্জোয়া মনোবৃত্তি।’ সমব আবস্ত কবিল, ‘অত্যন্ত শোচনীয় বুর্জোয়া যুক্তি, যা দিয়ে সর্বদেশেব সর্বকালেব ধনিকেবা নিষ্পেষিত শ্রমিকদেব গ্ৰায্য দাবি চাপা দিতে চেয়েছে।—কিন্তু সতাকে কেউ চাপা দিতে পারে না। কবি বলেছেন—বাখায় না হয় স্নান, আঘাতে না টলে।—যদি সোশ্যালিজমেব ক্রিটিসিজমেব কথাই তুললে তবে আমার কাছ থেকেই তাব জবাবট’ শোন। স্পষ্ট কবেই তবে প্রসঙ্গটা ওঠাচ্ছি—’

‘দেগ্, সমব, তোব লাফালাফিটা একটু থাম। আমি এখানে পূর্ণব বাঁশি শুনতে সবাইকে ডেকে এনেছি, সমাজতন্ত্রেব বক্তৃতা শুনতে নয়। থাম বলছি।—পূর্ণ, তুই বাঁশি ধব। চমৎকাব একটা বাগিনী চাই—যা শুন, ক্যাপিটালিজম্ এবং সোশ্যালিজম্, দু-ই যেন—ট্রেমল্ অ্যাণ্ড ডাট।’

ইজিচেয়ারেবে হেলান দিয়া টেবিলেব ছায়ায় একটি যুবক শুইয়াছিল, সমবকে যুদ্ধেব জগ্ন গলা শাণাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাবধান করিল। সুনিয়া চতুর্দিক হইতে সমর্থন উঠিল—তিয়া র, হিয়াব। বাজনাতি হইতেও যে এবা সঙ্গীত বেশি পছন্দ কবে, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পাবা গেল।

সমব বক্তৃতা উত্তত কবিয়াছিল, বাধা পাইয়া বাগিয়া কহিল, ‘বুর্জোয়া অব দা বুর্জোয়াস্। জমিদাব—প্রজার বক্তৃতা খাস্—সোশ্যালিজম্ ভাল লাগবে কেন? তুই যে এতটা হৃদয়হীন তা আমি জান্তাম না, বক্তত।’

রজত হাসিয়া কহিল, ‘বেশি বাজে বকিস না। আম’চেয়ার সোশ্যালিস্ট্—ঘবে বসে বসে বক্তৃতা দিচ্ছি, পারিস্ এখন গোলদীঘিব

পাড়ে গিয়ে চোঁচাতে ? সে সাহস আছে ? কেন শুধু শুধু এতটুকু ঘরে এতটা বাগ্মিতা নষ্ট করে ফেলেচিস, আহাম্মুক ! হয় চূপ কবে বাঁশি শোন, নইলে গোল্লায় যা—যেটা তোর ইচ্ছে । পূর্ণ, ধব তোব বাঁশি । ওব নাভ'গুলো ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেচে ; স্বব ওর পক্ষে ওষুধেব কাজ করবে । বরঞ্চ উচ্চশ্রেণীর সুর না বাজিয়ে তোব জন্ত ক্ষেতেব স্বব বা কারখানাই বাগিণী বাজাবে এখন—'

'বোম যাচ্ছে পুড়ে, এদিকে নেবো বাজাচ্ছেন বাঁশি ।' বলিয়া সমব তীব্র আপত্তিব ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল । 'কি নিষ্ঠুর হৃদযহীন হবে উঠচিস, রজত ! দেখলে কষ্ট হয় । যদি আধ্যাত্মিক মৃত্যু এড়াতে চাস্ তবে প্রথমেই ঐশ্বর্যেব বন্ধনগুলি দূব কব্ ।' বলিয়া অতিবিক্ত দৃষ্ট পদক্ষেপে সমর ঘরের বাহির হইয়া গেল ।

রজত মুচ্কি হাসিয়া কহিল, 'নির্ঘাৎ চুকট আনতে যাচ্ছে । নইলে ওর এতটা বৌবস্ত্র !—'

সমব কহিল, 'একশো বার যাচ্ছি । স্বার্থপর ধনিক, চুকট খাস্ যে, কম্যানিজম্ করবো ? অবিবেচক, এক-চোখো বুজ্জিয়া ।'

'দূর হ', দাড়ি-না-কামানো কম্যানিস্ট্ ।' রজত কহিল । 'তুই শুরু কব, পূর্ণানন্দ ।'

পূর্ণানন্দ শুরু করিল । বজত পুনবায় চেয়ারে এলাইয়া অঙ্ককাবে ঢাকা পড়িয়া গেল ।

বজতেব মধ্যে শৈশবেব রাজাকে খুঁজিয়া পাইতে দেবি হয় । কত বড়ই না সে হইয়া উঠিয়াছে । সেই এক বস্তি হাওয়াব মত চঞ্চল শিশু আজ দীর্ঘ স্তম্ভাম বলিষ্ঠ যুবা । গায়ের বঙ উজ্জলশ্যাম বর্ণ, নাকটা খড়্গের মত তীক্ষ্ণ, রাজার দুর্বলতার সঙ্গে রজতের বলদৃষ্ট দেহভঙ্গির তুলনা কবিলে তাহার দুজনে একই লোক বলিয়া সহসা প্রত্যয় হইবে না ।

তবে এক জায়গায় শৈশবের সঙ্গে তার একান্ত সংযোগ বহিয়াছে। তার মধ্যে যে-ব্যক্তিও, যে-সহজ গৌরব ও তেজদৃঢ়তা অবিসংবাদীরূপে বন্ধুত্বহলে স্বীকৃত ও সম্মানিত, শৈশবেও তাহা প্রায় এমনি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

তিন বৎসব হয় দুর্গাপ্রসন্নের মৃত্যু হইয়াছে। প্রিয় পুত্রের ঘব-বাঁধা তিনি আঁব স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, কিন্তু বজ্রতের যে পবিচয় তিনি পাইয়া গিয়াছেন, তাতে তাঁব সংশয় থাকে নাট যে, বড় হইলে পুত্র যোগ্যতাঁব পিতাকে ছাড়াইতে পারিবে। আ গই তিনি তাঁর এক এটনট বন্ধুব কাঁছে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, বাজা সাবাল হইলেই সমস্ত কতৃত্বের ভাব তাহাঁক অর্পণ কবিত্তে হইবে, এই ব্যবস্থা ছিল। বাজাব তত্ত্বাবধানে তাঁব সম্পত্তি এবং প্রজাবা যে ক্রমশই উন্নতিব পথে অগ্রসব হইবে, তাহাতে তাঁব সন্দেহমাত্র ছিল না। কোটালনগবকে তিনি অপূর জনপদে পবিবর্তিত কবিয়া গিয়াছেন; রাজার কাঁছে তাঁব একমাত্র অম্বোধ ছিল, সে যেন কোটালনগবকে ত্যাগ না কবে—তাঁব এত স্বপ্নেব, এত কল্পনাব জনপদকে সে যেন সার্থক কবিয়া তোলে। বজ্রত এ-পয়াস্ত সে-আঁদশ বর্গে বর্গে পালন কবিয়াছে। কলেজের যখন ছুটি হয়, বন্ধুবান্ধবাব কেহ যায় পাহাড়ে, কেহ যায় সমুদ্র-তীরে, কেহ যায় সাঁওতাল-পবগণাব ঢেউ-খেলান প্রাস্তবে। কতজন তাহাঁকে আমন্ত্রণ কবে সঙ্গী হইতে, কত বন্ধু অম্বোধ কবে, কত প্রলোভন দেখায় পার্শ্বত্যাগ্রীব। কিন্তু প্রতি ছুটিতে বাজাব কোটালনগব যাওয়া চাই। সেখানে গেলে সে যেন তাঁব পিতার সান্নিধ্য অম্বুভব কবে—দুর্গাপ্রসন্নের কীর্ত্তিগুলি তাকে পিতৃগরের গর্ভিত কবে। কি গভীব বেদনায, কি তুলনাহীন হতাশাব যে পিতা এই গ্রামপত্তন কবিয়াছিলেন, কি স্নগভীব আক্রোশে তিনি যে এই কোটালনগবকে সম্পদে, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ কবিত্তে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আজকাল বজ্রত তাঁব অনেকটাই

বুঝিতে পাবে। পিতার জন্ত এক স্বগভীর শ্রদ্ধায় তাব বুকটা পূর্ণ হইয়া ওঠে।

বজ্রত সাবালক হইয়াছে। তাঁর পিতৃবন্ধু এটর্নী সত্যানন্দ মিত্র এক বছর হয় একপ্রকার জোব কবিয়াই তাকে সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়াছেন। বজ্রত কহিয়াছিল, ‘এত তাড়া কেন, কাকাবাবু। সম্পত্তি কেউ খেয়ে ফেলছে না, পড়াটা আগে শেষ কবে নিই।’

বৃদ্ধ সত্যানন্দ হাসিয়া জবাব দেন, ‘পড়বে বৈ কি, নিশ্চয়ই পড়বে। সম্পত্তি তদাবক ক’বে তুমি পড়াশুনায় ব্যাঘাত করবে সে কি আমিই চাই, বাবা।—সব আমিই দেখাশুনা করব, সব হাণ্ডামা পোয়াবাব ভাব এই বুড়োর, কিন্তু আইন-মতে তুমি মালিক হও—তাবপব তদ্বাবধানের ভাব আমার উপর ছেড়ে দিও। দুর্গাপ্রসন্ন তোমাকে সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবাব জন্ত যেন পাগল হয়ে উঠেছিলেন;—সব দিক দিখে যে এমন ধীব-স্থির মানুষ সাবালক ছেলেব হাতে সম্পত্তির দাঙ্ক দিখে যাবাব জন্ত কি বিষম তাব জেদ। সব কিছু তোমাকে বুঝিয়ে দিখে যেতে পাবলে যেন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—তোমাকে দিখে যেতে পাবলে সে যেন ধন্ত হয়ে যায়।—তাই, বাবা, তোমাব সম্পত্তি তোমাকে হাতে নিতেই হবে, দেবি হলে তাঁব আত্মা কষ্ট পাবে।’

সত্যানন্দবাবু প্রস্তাব কবিয়াছিলেন, বজ্রত বাড়ি ভাড়া কবিয়া থাকুক। এত বড় ধনীর সন্তান, কলেজ-হাস্টলেব অস্থবিধায় কষ্ট পাইবে, ইহাই ছিল তাঁব ভয়। কিছুদিন সত্যানন্দবাবুব বাড়িতেও বজ্রতকে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু বজ্রত অত্যন্ত সঙ্গীপ্রিয়; বন্ধুবান্ধব না হইলে তাব চলে না। এম্-এ এবং ল’ ক্লাসে ভর্তি হইয়াই সে ল’ কলেজ হস্টলে বাস কবিতে আবদ্ধ কবিল। শীঘ্রই সেখানে তাব বিবিধ সম্পত্তি লইয়া এক কম্যুনিষ্ট-প্রথাব প্রবর্তন—তাব জামা, জুতা, মাথার তেল সর্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া গেল।

পূর্ণানন্দের বাঁশি অপূর্ণ হইয়া বাজিতেছে। কি বর্ণনাভীত মধুর সে স্বব। নিদ্রালস মধ্যবাত্তের কোন্ এক অজ্ঞাত জায়গায় অব্যক্ত আকুলতা আত্মগোপন করিয়াছিল! দবদী যৌবন বাঁশিব মস্ত্রে অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার কবিয়া ফেলিয়াছে। এমন যোগাযোগ না হইলে এমন বাঁশি বাজেনা,—চাই নিদ্রিত বাজপুর্ব্বোব স্পন্দহীন অন্ধকার, চাই স্বপ্ন-বিলাসী যৌবনেব বহুশ্রম্য অল্পভূতি, চাই অব্যক্তেব স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা—মানুষেব চৈতন্যেব সঙ্গে তাব এক অপূর্ণ মিহালির অভিপ্রায়। তবেই না এমন কবিয়া বাঁশি বাজিতে পাবে। কোন্ বহুশ্রম্য আভাস পাইয়াছে পূর্ণানন্দ? কোন্ সৌন্দর্য্য, কোন্ বঙিন আশা, কোন্ বেদনা তাহাকে এ স্বব জোগাইল?

এমন সময় মস্ত্র একটা মোটা চুকটে ইঞ্জিনেব মত ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সমবেব পুনঃপ্রবেশ।

প্রবীবই তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিল, সামান্য পবিত্রাসেব স্ববে বহিল, ‘বন্দ্য চুকটেব পশ্চাতে কার্ল মার্কস্-এব পুনঃপ্রবেশ।’

সমব চকিতে দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রচণ্ড এক গর্জনে বাঁশকে দিক্কৃত কবিয়া কহিল—‘থববদাব বলচি, আব যা কব, তা কব, কার্ল মার্কস্কে নিবে ঠাট্টা কবো না, সেটা মিছতেই সহ্য কববো না।’ বলিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে গভীর প্রতিবাদেব সঙ্গে সে সমুখেব চেয়াবটায় বসিয়া পড়িল বাঁশি বলিল—পিউ পিউ পিউ পিউ।

দুই

‘শুন্চেন?’

লেট্-মর্গিংয়ের ল’-ক্লাস সাবিয়া বজ্রত হস্টেলে ফিবিতেছিল। স্নান-আহারাদি করিয়া এম্-এ ক্লাসে আসিবাব জন্ত এক ঘণ্টা সময় থাকে, এবং কলেজের গায়েই হস্টেল বলিয়া হস্টেলবাসী ছেলেবা প্রায় কেহই স্নান বা

খাওয়া সাবিয়া আসে না। আশুতোষ বিল্ডিংস্ ও দাবভাঙ্গা বিল্ডিংস্-এব  
মধ্যে দোতলায় যে প্যাসেজ্ আছে, সেখান হইতে আহ্নান শুনিয়া তেতলাব  
এ-প্রান্তের বেলিডেব কাছে বজ্রত দাঁড়াইয়া পড়িল। নিচে তাকাইয়া দেখিল  
এম্-এ ক্লাসের সহাধ্যায়িনী মঞ্জবী বায় মুখ এবং পশ্চ উদ্ধায়িত করিয়া  
তাকাইয়া আছে। বজ্রতেব সঙ্গে চোখাচোখি হইলে মঞ্জবী অশুচস্ববে  
ডাকিল, ‘একটু শুনুন।’

বজ্রত নামিয়া আসিল। কহিল, ‘কি বাপাব?’

মঞ্জবী কহিল, ‘একটু সাহায্য কবতে হবে। এড়াতে চেষ্টা কববেন  
না, আগেই বলে রাখছি।’

মুহু হাসিয়া বজ্রত কহিল, ‘গুণ্ডা পিছু নেয় নি তো? অবশ্যই সাহায্য  
কবব। একজন ভদ্রমহিলাকে বাঁচাব, এ আব কবব না। বলুন, কোথায়  
সেই দুর্বৃত্ত?’

মঞ্জবী হতাশাব অভিনয় কবিয়া কহিল, ‘কেবলই পবিত্রাস কববেন।  
সীবিয়স্ হওয়া কি আপনাদেব মধ্যে আব ফ্যাশান্ নয়? গুণ্ডা আক্রমণ  
কবলে আপনাদেব সাহায্য চাইব কেন, তিল উঁচু জুতো কি অম্নি  
পায়ে দিই?’

‘আশস্ত কবলেন’, বজ্রত সামাগ্ গম্ভীর হইয়া কহিল। ‘তবে দেখছি  
একটু দেবি হলেও চলবে। এদিকে আমাব স্নানাগাব কিছুই হয় নি,  
আপনার পক্ষে সামাগ্তম দেবি কবা সম্ভব হলে সে ছুটো সেবে আসি।  
ক্লাস আরম্ভ হতে আব দেবি নেই।’

‘যান, চাই না আপনাব সাহায্য। আপনি স্বচ্ছন্দে খান্ গিয়ে’, বলিয়া  
মঞ্জরী অনাবশ্যক উগ্রতাব সঙ্গে ডান কাঁধটা ভঙ্গিভাবে ঘুবাইয়া লইয়া পাশ  
ফিবিয়া দাঁড়াইল। তাব শাড়িৰ আঁচলেব প্রত্যন্তদেশটা ওড়নার মত  
ফুলিয়া উঠিয়া মঞ্জরীৰ অভিমানেব অশুকরণ কবিয়া অবশেষে ওব স্বন্ধ ও  
দক্ষিণ বাহুব উপর আঁটিয়া বসিল।



‘না হয়, নাই খেলাম । বলুন কি করতে হবে ?’

‘টিকেট বিক্রি কবে’ দিতে হবে ।’ শুদিক হইতে মঞ্জবী ব জবাব আসিল ।

‘টিকেট ! কিসের ?’

‘আগে প্রমিস্ ককন ।’ মঞ্জরী এমন একটা সুরে বলিল যাহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, পবিপূর্ণভাবে এই শর্তে রাজি না হইলে সে মুখটা এদিকে আব না ফিরাইয়া সোজা আশুতোষ বিল্ডিংস্-এ যাইয়া প্রবেশ করিবে ।

‘না, তা পাবি না । আমি ক্যান্ডাসাব নই । উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া টিকেট আমি বিক্রি করি না ।’ বজ্রত ঈষৎ আপত্তিব সুরে কহিল । ‘আপনাব জ্ঞান কাজে লাগাতে হলে ক্ষেত্রটা আপনি বলতে পাবেন, বিবেচনা কবে’ দেখব ।’

দুই চাবিটি ছেলে এ-পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাবা সকৌতুকে শুদেব দিকে চাহিয়া ফিস্ফাস্ করিতে করিতে চলিখা গেল ।

মঞ্জবী কহিল, ‘আপনি যান, আমাব জ্ঞান আপনাকে কিছুই কবতে হবে না । আপনি মস্ত বডলোক, তা আমি জানি ।’ বলিয়া হিল্-এর আঘাতে মেঝেতে শব্দ শু দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বন্দুকেব গুলিব মত সে জ্রুত আশুতোষ বিল্ডিংস্-এ ঢুকিয়া পড়িল ।

বজ্রত মনে মনে কহিল—‘বাবা । একবাব বাগ দেখ না । যেন আমাব মাথা কিনে ফেলেছে এলাহাবাদে দিদিব প্রতিবেশী ছিল বলে !’ এবং এক এক বাবে দুই দুই ধাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিতে লাগিল ।

মঞ্জরীব বাবা সত্যব্রত বায় ইণ্ডিয়ান্ অভিট্ অ্যাণ্ড একাউণ্ট সার্ভিসেব বড চাকুরে । কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিবার আগে তিনি এলাহাবাদে ছিলেন । সেখানে বজ্রতেব দিদিদেব ওঁবা প্রতিবেশী ছিলেন । সেই-খানেই তাদেব পবিবাবেব সঙ্গে শ্রীযুক্ত রায়েব পবিবারের অন্তরঙ্গতা হয় । সেই সম্পর্কে মঞ্জবী প্রথম হইতেই রজ্রতেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আবস্ত কবে ।

রজত বেচাৰি ব্যাপারটাতে খুব যে প্রীত, তা নয়, কিন্তু তা বলিয়া মধুর রসের কোনও অভাব হয় না। রজত লোকেব সঙ্গে যেমন মিশিতে ভাল বাসে, তেমনি আবার খুব বেশি লিপ্ত হওয়া তাব স্বভাব নয়। মগ্নবী এটাকে অনেক সময় রজতেব দেমাক্, কখনও বা ঔদাসীন্ম এবং কখনও বা অপমান মনে কবিয়া ত্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। কিন্তু বজ্রতেব তাতে কোনও পবিবৰ্ত্তনই হয় না, এদিকেও না, ওদিকেও না।

রজত উপরতলায় পৌছাইতেই সমব বদনমণ্ডল বিচিত্ররূপ এবং বিবিধ-অর্থন্তোতক বেক্সাসমূহে ভবিয়া তুলিয়া দ্রুত কাছে উপস্থিত হইল।

‘ও কি ?’ বজ্রত জিজ্ঞাসা করিল, ‘ও বকম কবছিস কেন ?’

‘মিসিবাবা কি বল্লেন ?’

‘যা ইচ্ছে বলুক, তোব কি—একটা হতভাগা হয়েছিস।’ বজ্রত ঘবের দবজা খুলিতে খুলিতে বলিল।

‘হতভাগা বই কি,’ সমব কহিল, ‘হতভাগা না হলে অন্তকে আমিই বা জিজ্ঞাসা কবব কেন। আমাকই অন্তেবা জিজ্ঞাসা কবত। শোন্—প্লেটোব কমুনিজ্মে কি বকম ব্যবস্থা ছিল, শোন্—‘বিপাব্লিকে’ স্পষ্ট কবে লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকেবা স্টেটেব—’

রজত গম্ভীবস্বরে ধমক দিয়া কহিল, ‘এসব কি বাদবামি হচ্ছে, শুনি। কমুনিজ্মেব যে দিক্টা তোকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট কবেছে, কাল’মার্কস তা নিশ্চয়ই তোকে শেখান নি। যা, পালা এখন!’ বলিয়া বজ্রত ঘরে প্রবেশ করিল।

সমব সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, ‘তেল ?’

‘নে না, মানা করচে কে।’

‘সাবান ?’

‘সাবান দিয়ে কি হবে বে, ভূত ? গায়ে মাখবি ?’

‘রাম ! আজ মিটিং আছে না !’ সমব সপ্রতিবাদে কহিল। ‘গায়ে

সাবান দিলে বুজ্জোয়ো-বুজ্জোয়ো দেখাবে যে ! শুধু গেঞ্জিটা কেচে নেব, বাস্ ! সুগন্ধি ভাল সাবানে ময়লা তাড়াতাড়ি গাটে ।’

‘তা জানতাম না ।’

‘কত কিছুই জানিস না ; শিখে রাখ্ । তবে গুরু-বিদায়টা হাতে হাতে চাই ।’

‘যথা ?’

সময় শিশি হইতে ববাবব তালুতে তেল ঢালিয়া লইতে লইতে কহিল, ‘প্রক্সিটা আজ দিয়ে দিস্ । স্পীচ্ টা তৈবি কবতে হচ্ছে কিনা । ভুলিস্ নে যেন ’ বলিয়া কে-স্-সহ গায়ে দিবার সাবানটা লইয়া সে নিলিপ্ত-মুখে বাহিব হইয়া গেল ।

বজ্রত যখন ক্লাসে গেল তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই । প্রথমত মনোবঞ্জন দত্তরায় ওজ্জ্বিনী ভাষায় বক্তৃতা কবিতেছিল । গান্ধীটুপি মাথায়, সর্বদা শব্দে মগ্ন, নন্থ-কোঅপাবেশন আন্দোলনের সময় জেলও নাকি খাটিয়াছিল । ক্লাসে আসিয়া বোজ্জই কোনও না কোনও অজুহাতে বাজনীতিপ্রসঙ্গে সে বাঙালি ছাত্রসম্প্রদায়কে তিবন্ধার কবে ; যে-ভীকৃতার জগ্ন ছাত্রসম্প্রদায় দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেয় না, তাহাকে সে নির্দ্ব্য ব্যঞ্জে জর্জ্বিত কবিয়া তোলে । মনোবঞ্জন বলে—এদেশেব যুবকদেব গায়ে মাছেব বক্তৃতা, শত অগ্নায়ে, সহস্র প্রবোচনাযও তা কখনো উত্তপ্ত হয় না । যে দুর্বাব অল্পপ্রেবণায় দেশে-দেশান্তবে স্বভূমিব স্বাধীনতােব জগ্ন তরুণেব দীপ্ত লাল বক্তৃতা অকাতবে ঢালিয়া দেয়, যে-প্রেবণায় কামানেব শব্দে সঙ্গীত শুনিতে পায়, বিভল্ভাবেব বন্ধু মনে কবে—যাক্ গে, ওসব নাম আব কববো না—বলা যায় না, কাব মনে কি আছে—আমাদেব নৈতিক দৈগ্ধ, আমাদেব ভীকৃতা, বাঙালিব স্বভাবমূলভ আবামপ্রিয়তা সে-অল্পপ্রেবণায় আমাদেব সাড়া দিতে দেয় না । সমস্ত জাতি একটা আধ্যাত্মিক মৃত্যাব সম্মুখীন হয়েচে । স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় বে ?—কেন, ভাবতবর্ষেব যুবক-সম্প্রদায় ।

মনোরঞ্জনব উৎসাহ এত তীব্র এবং বাঙালি ছাত্রদের রাতাবাতি বদলাইয়া তুলিবাব আগ্রহ এত উগ্র এবং বক্তৃতা এত অজস্র যে, ওকে ছেলেবা এখন আব পরিহাসের বস্তু ছাড়া অণু কিছু মনে কবে না; ওর বাগ্মিতায় কৌতুকই বোধ কবে। তবে দু'একজনকে সে গোপনে কি-একটা সম্প্রদায়ের কথা বলে। সামান্য দু'একজনকেই অবশ্য বলে। যাদেব সে এই গোপনীয় সংবাদ জানায়, তাদেব প্রত্যেকেবই কাছে পূর্বাঙ্কে প্রতিশ্রুতি আদায় কবে যে, এ-বিষয়ে তাব সহায়ভূতি থাকুক আব না থাকুক, এ-সংবাদ মরিয়া গেলেও অণু কাহাকেও জানানো চলিবে না। যাদেব সে দলে টানিতে চাহিয়াছে, রজত তাহাদেব মধ্যে একজন। কিন্তু রজত সৰ্ব্বশ্বে সে হতাশ হইয়াছে। বজ্রত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কবে নাই বটে, কিন্তু মনোবঞ্জন বা তাব গোপনীয় সংবাদেব উপব সে কোনই শ্রদ্ধা দেখায় নাই। ববঞ্চ যাবা মনোবঞ্জনকে বাতুল মনে কবে, বজ্রত তাহাদেব অগ্রণী। মনোবঞ্জন এখন আব বজ্রতকে ভজাইবাব চেষ্টা করে না, তবে নির্জ্জনে দেখা হইলে তাকে সাবধান কবিয়া দেয়—ভুলেও যেন সব গোপনীয় প্রকাশ খবব কবো না, সর্বনাশ তবে আমাদেব একাব হবে না।

বজ্রত আসিয়া এক পাশের বেঞ্চে জহিব আহাম্মদেব পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'এই জহিব, ফেজ্ পরিস না কেন বে?'

জহির কিছুটা জায়গা ছাড়িয়া বজ্রতকে বসিতে দিয়া খুশিভবা মুখে কহিল, 'তোমাং টিকি কই? টিকি বাখোনা কেন, শুনি?'

'তাও তো বটে!' হাসিয়া বজ্রত কহিল। 'এই বেশ ভাল নয় বে, জহিব? আমিও টিকি নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না, তুইও ফেজ্ নিয়ে বাড়াবাড়ি কববি না, হিন্দু আর মুসলমানে তফাৎ কবে কাব সাধ্য। আমরা সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটিয়ে আনলুম বলে!'

জহিব কহিল, ‘আনবই তো, রজত । গরুমিল আর কতদিন থাকবে ।’  
জহিব ছেলেটিকে বজ্রতেব ভাল লাগে । মুসলমান যে কত ভদ্র হইতে  
পাবে, কত মোলায়েম, কত বন্ধুপ্রিয় হইতে পারে, জহিব তাহাব দৃষ্টান্ত ।  
শ্রামবর্ণ, দীর্ঘচোখ, সদাহাস্যবিকশিত বদন । বুদ্ধি এবং সৌকুমার্য্য, এবং  
সর্বোপরি এক বিনয়নম্রতা জহিবেব স্বভাবকে এমন আকর্ষণীয় করিয়াছে  
যে, বজ্রত তাকে একান্ত অন্তবঙ্গ বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করে । ফরিদপুর  
জেলায় জহিরের বাড়ি । ওব বাবা সবকাবো উকিল ছিলেন, এখন অবসব  
গ্রহণ কবিয়াছেন । বাঙলাদেশেব বহু সম্ভ্রান্ত-বংশেব সহিত ওদেব আত্মীয়তা  
এবং কুটুম্বিতা । ওবই এক দূবসম্পর্কের কংকা জাতীয়তাবাদী মুসলমানের  
এক বিশিষ্ট নেতা আবদুব রহমান চৌধুরী । বাঙলা লেজিসলেটিভ্  
কাউন্সিলে ওব একাধিক আত্মীয় সদস্য ; তাদেব কারুর সঙ্গে জহিবেব  
রাজনৈতিক মতবাদ খাপ খায়, কারুর মতবাদকে সে নিন্দা কবে । জহিবেব  
রাজনৈতিক মতবাদেব প্রসাবতাই বজ্রতকে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট কবিয়াছিল ।  
এখন কিন্তু বজ্রত বলে—তুইও বাঙাল, আমিও বাঙাল—ভাবটা এই  
জন্মই, বুঝলি না জহিব ।

তুইটা ক্লাস কবিবাব পব রজত কহিল, ‘ক্লাস পালাবি তো চল, জহির ।  
ম্যাটিনিতে ছবি দেখে আসি, তাবপব বিকেলবেলায় ইডেন গার্ডেন বা  
গঙ্গাব ধাবে বসে তোব ভাবী বউয়েব কথা শুনব—বলবি তো ?’

লজ্জায় কর্ণমূল লাল করিয়া জহির কহিল, ‘তাব চেয়ে ভালো ছেলে  
হয়ে বরঞ্চ আমি ক্লাসই করি, রজত ।’

‘তাতে কি আর বেহেশ্তে যেতে পাববি ? কাব ঘণ্টা এটা খেয়াল  
আছে ? জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবে ।’

জহির শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ‘ওঃ । তবে চল, পালাই । প্রফে-  
সারেব নামটা মনে ছিল না ।’

দুজনেই ক্লাসের বাহির হইয়া আসিল। প্রফেসার সমাদ্বারের ঘণ্টায় ক্লাস-পালানো ওদেব নহুন নয়। অসহিষ্ণুতা ছাড়া এব জ্ঞান ওদেব আব বিশেষ কিছু অপবাদ দেওয়া যায় না। পাসেটেজের ভয় না থাকিলে সমাদ্বাবেক শূন্য বেঞ্চের কাছে লেকচার দিতে হইত। শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশি বকম মাথামাথি থাকায় তাঁর উত্তবোত্তর পদবৃদ্ধি হইতেছে—পড়াইবার দক্ষতা ব জ্ঞান নয়। সমবেব প্রক্সিব কথা রজতেব মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ভাবিল, এটা কমুনিজ্‌মে অপবিহার্য্য—‘কতিগুলিও সমান ক’বে ভাগ ক’বে’ নিতে হবে বৈ কি! আমি যখন পাসেটেজ হারাছি, ও-ও হাবাক্, কাউকে ওব কথা বলে গিয়ে কমুনিজ্‌মেব প্রিন্সিপল্‌ থেকে ঞকে আব ভ্রষ্ট কবি কেন। মনে মনে হাসিয়া নিচে নামিবাব জ্ঞান জহিবের সঙ্গে বজ্রত সিঁড়িব দিকে অগ্রসব হইল।

‘রজতবাবু !’

রজত কিবিয়া তাকাইল। কহিল, ‘দাঁড়া, জহিব, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসচি।’ বলিয়া লেডিজ্‌ কমন্-রুমের সমুখে যেখানে মঞ্জবী দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে অগ্রসর হইল।

‘তখন ও-বকম বীবহ দেখাবাব মানে? গায়ে খুব জোর আছে বলে?’ মঞ্জবী সাভিমান অভিযোগ কবিল।

‘আমি তো আপনাব স্বপক্ষেই তা ভেবেছিলাম। যা বাগ, এবং যেমন হঠাৎ। বলুন, কি কবতে হবে? টিকিট কিসেব? চ্যাবিটি পার্ফর্মেসেব নয় তো?’ বজ্রত কহিল।

‘তাতে দোষটা কি?’

‘কিছু নয়, কিছু নয়। নাচ-টাচ কি? তবে অনন্ত আমি যে একটা কিনব, তা নিশ্চিত।’

‘কিনতে নয়, বেচে দিতে বলছি।’ মঞ্জবী একটু ঝাকা চোখে চাহিয়া কহিল।

বজ্রত কহিল, ‘দেখুন, আমাব বন্ধুবা বলে, আব যাব জগ্গ সাহায্য করতে বল, পকেটে পয়সা না থাকলেই সাহায্য কবতে চেষ্টা করে’ ব্যাপাবটাব প্রতি নৈতিক সহানুভূতি জানাব। কিন্তু অভিজাত-পাড়ার মেয়েরা যে দাতব্য-অভিনয় কবে, তাতে সাহায্য কবতে বলে আমাদের সহানুভূতিব ওপব জুলুম কবো না—ওটা ভাবি কোমল মনোবৃত্তি—’

‘কেন, অগ্নাঘটা কোথায়?’ মঞ্জবীব কণ্ঠ আক্রমণাত্মক।

‘তা বলতে পাবব না। এই জগ্গ বলতে পাবব না যে, সেটা সর্বাংশে আমাব নিজেব মত নয়।—দিন্ না একটা টিকিট?’

এক মুহূর্তকাল দুই চোখ স্তিমিত করিয়া মঞ্জবী ভাবিল। বজ্রতের এই ঐদাসীন্দ্ৰে বাগিয়া উঠা উচিত হইবে কিনা, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পাবিল না। কহিল—‘এটা শখের চ্যাবিট বা ভগুমি নয়। ‘নারী-উদ্ধার-আশ্রম’ সাহায্য পাওখাব উপযুক্ত আপনাবা মনে কববেন কিনা জানিনা, কিন্তু অত্যাচাবীদের হাত থেক দেশেব মেয়েদের বাঁচান, অন্তত আমরা মেয়েবা বর্ন্তব্য মনে কবি। ভেবেছিলাম, এতে অন্তদেবও—’

‘জহিব, শোন্।’ বজ্রত জহিবকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। ‘জহিরেব কাছে এই মুহূর্তেই একটা টিকিট বেচে দিচ্ছি।’

জহিবেব না আসিয়া উপায় ছিল না। লাজুক জহিব এমন বাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে, বজ্রতের প্রায় মায়া হইল কেন সে এমন সহসা বেচাবিক এই অনালপিতা মেয়েটিব কাছে আনিয়া বিব্রতেব একশেষ কবিল। কহিল, ‘ইনি জহিব আহাম্মদ, আমাব প্রিয় বন্ধু।—আব একে তো চিনিসই, জহিব। টিকিট কিনবি? চ্যাবিট পার্ফর্মেসেব টিকিট?—’

মঞ্জবীকে বিব্রত নমস্কাব কবিয়া জহিব ঘাড় নাড়িয়া বজ্রতকে জানাইল—বেশ।

‘বেশ তো বললি। কিসেব জগ্গ চ্যাবিট জানিস তো?’

‘না।’

‘তবু বাজি ? এমন ক্রেতা আর পাবেন না, মিস্ বায় ! জহিব সেই ধরণের মুসলমান নয়, যারা মুসলমান গুণ্ডার হাতে হিন্দু মেয়ের নিগ্রহকে দৃশ্যীয় এবং নিন্দনীয় মনে কবে না ; ও খাঁটি মুসলমান । দিন্ একটা টিকিট ওকে ।’

‘আর আপনি নিজে ?’ মঞ্জরী শুধাইল ।

‘আমিও এমন কোনও পাষণ্ড নই, আমাকেও একটা ।’ মুহু হাসিয়া বজত বলিল । ‘এব পব আব আপনাব অভিযোগ থাকতে পাবে না ।— সর্বনাশ, আড়াইটা । পালিয়ে আয়, জহিব । সিনেমায় যাচ্ছি । নমস্কার ।’

ট্রামে জহিব কহিল, ‘মিস্ বায়েব সঙ্গে তোমাব ভাবটা বিস্তর চলেব চক্ষুশূল ।’

‘কেন ?’

‘ঈর্ষ্যা, তা ছাড়া আব কি ?’

‘ঈর্ষ্যা কেন ? আমবা কথাবার্তা বলি বলে ? তবে তো তোব সম্বন্ধেও লোকে আমাকে ঈর্ষ্যা কবতে পাবে, জহিব ।’ বজত গম্ভীর হইয়া কহিল ।

‘আমি তো মেয়ে নই, বন্ধু । মেয়েদেব নিয়েই পৃথিবীতে ছন্দ ।’ জহির কহিল । ‘কিন্তু যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্যেব মিলন হয়, এটাই প্রাকৃতিক বিধান । তোমাকে অভিনন্দন জানাই ।’

রজত কহিল, ‘তুইও ওদেরই মত একটা উজবুগ । এই জগ্গই বুঝি কিসের চ্যারিটি জিজ্ঞেস না কবেই টিকিট কিনতে রাজি হয়ে গেলি ?’

‘সত্যি বলছ’, জহির প্রশ্ন করিল, ‘তোমাদের মধ্যে কোনও বোঝা-পড়া হয়নি ?’

‘কিছু না’, রজত গম্ভীর স্বরে কহিল । ‘অন্তত আমার দিক থেকে



নয়—এইটা তুইও মনে রাখিস এবং ঘারা কাউকে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলেই একটামাত্র সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, তাদের বলিস।—হ্যাঁ, দুই টিকিট, এস্প্রানেডের।’

## তিন

‘এসো, রজত, এসো।’ সত্যানন্দ মিত্রের গৃহিণী সত্যবতী कहিলেন।

বজ্রত অগ্রসব হইয়া कहিল, ‘কই, কাকাবাবু এগনও বাড়ি কেবেন নি? অফিস-ঘবে দেগলুম না তো।’

‘চা খেয়ে সন্ধ্যার আগেই কোথায় বেরিয়েচেন, শীগ্গিরই ফিরবেন বলে গেছেন। তুমি বস।’ সত্যবতী বড় কোচটায় নিজের চওড়া দেহটাকে বোনও প্রকাবে আঁটাইয়া বসিয়াছিলেন, অতি কষ্টে আডমোডা ভাঙিয়া সিধা হইয়া বসিয়া বজ্রতের প্রতি অতিথি-সংকার দেখাইলেন। कहিলেন, ‘আমাবও বাগ্না শেষ হয়ে এল বলে, বেশি রাত হবে না—ওবে গয়ারাম, বাবুচ্চিকে একবার জিজ্ঞেস কবে আয় তো, পাটার মেটেতে সবটা পেঁয়াজ-বাটা দিয়েচে কিনা—কিছু যদি লক্ষ্মীছাড়াটার মনে থাকবে। পনেরো মিনিট পরেই খানা চাই—শুনলি, ওরে গয়ারাম?’—সত্যবতী বেঘারা গম্ভাবামেব প্রতি হাঁকিতে লাগিলেন।

গয়ারাম ইহাব এক বর্ণও শুনিতে পাইল না। মেম-সাহেবের আদেশ এমনি অবিচ্ছিন্নভাবে আসিতে থাকে যে, সে-বেচারী এ-ছুতায় ও-ছুতায় তাহার সান্নিধ্য প্রতিনিয়ত এড়াইয়া চলে।

সত্যবতী कहিলেন, ‘ঐঃ, লক্ষ্মীছাড়াটা স্বযোগ বুঝে সরে পড়েছে, এদের জ্বালায় যদি একটু সোয়াস্তি পাবে—একটু জিবোতে দিয়েচ, কি এ-তজ্ঞাতেও আব খুঁজে পাবে না।—ওবে ঐঃ, গয়ারাম, শুনচিস? রাগ্নার কত দেরি একবার দেখে আয়—শুনচিস্, হতভাগা—’

রজত কহিল, ‘আমার কিছু তাড়া নেই, কাকীমা। মিছিমিছি আপনি চেষ্টায়ে মরচেন—গয়্যারামের আবামে এতে একটুও ব্যাঘাত হবে না।’ বলিয়া সত্যবতীর পাশেব সোফাটায় বসিয়া পড়িল। মুহূর্তে সোফাব হাতলে খন্দবেব কাপড়ে একটা অসমাপ্ত নক্সা আবিষ্কাব কবিয়া সেটাকে সকৌতূহলে উঠাইয়া কহিল, ‘এটা কি, কাকীমা? টেবিল ক্লথ্।’

সত্যবতী দক্ষিণ হস্তেব দ্বাবা কপালে মুহু আঘাত কবিয়া কহিলেন, ‘টেবিল ক্লথ্। পোড়া কপাল, ওটাতে মেয়ের ব্লাউজ হবে, তুমি আছ কোথায়। একবাব কাণ্ডখানা দেখ তো—চট দিযে তৈরী হবে গায়ে দেবাব ব্লাউজ। কালে কালে আবও কতই দেখব—’

‘কাব ব্লাউজ? মন্দ-ব?’ বজ্রত সবিষ্ময়ে প্রশ্ন করিল।

‘তবে আব বলচি কি, বাবা। কত বোঝালুম, এই গবমে চট পবা কি ভদ্রলোকেব সম্ভব। শীত আসুক, তখন না হয় শখ মেটাস্। কিন্তু কে শুনেচে তোমাব কথা। যা নতুন ফ্যাশান হবে, তাই করা চাই, তা সে উচিতই হোক আব নাই হোক। কিন্তু চটের মধ্যে ফুল তুলিয়ে নিতে এই বুড়িকেই। বাবুজিটাকে যে রান্না বুঝিয়ে দেব, তাব পর্য্যন্ত ফুবসং পেলাম না। এখন খেতে পাব, তবেই হয়। ওরে, ও গয়্যাম, শুনিচিস্—’

খবরটা শুনিয়া রজত মুচকিয়া হাসিল। এই ফ্যাশানদুবস্ত বিলাসী পরিবাবে খন্দবেব প্রথম প্রবেশটা এমনই বিস্ময়েব যে, তাব ভাবি কৌতুক বোধ হইল। সন্দেহ রহিল না যে, মেয়ে-ইস্কুলের ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছাত্রী শ্রী-মন্দালিকা দেবীব ইহা স্বদেশিকতাব চাইতে অমুকবণ-প্রিয়তাবই বড় উদাত্তরণ। তবু স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দেশের লোকেব যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই অন্তর্বাগেব চেউয়ের আন্দোলন যে এই ধনীর বাড়িব দেউড়ী গলাইয়া প্রবেশ কবিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাব যুগপৎ আনন্দ এবং কৌতুক বোধ হইল। কহিল, ‘মন্দ কোথায়? পডচে?’

সত্যবতী কহিলেন, ‘তাছাড়া আব কোন কাজটা আছে আজকাল-  
কার মেয়েদের? পড়া, পড়া আর পড়া। দিন বাস্তব বইয়েব ওপব  
মুখ গুঁজে পড়ে থেকে চোখ ছুটো নষ্ট ক’বে তবে তৃপ্তি।’ বলিয়া কণ্ঠস্বর  
উচ্চগ্রামে তুলিয়া ডাকিলেন—‘মন্দা, ও মন্দা, শুনচিস? তোব বজ্রত-  
দা এসেচে। ওবে, ও গয়্যাবাম, দিদিমণিকে একবাব ডেকে দে দিকিনি—  
গয়্যারাম, বলি, আচিস্ এ-দেশে—’

দেখা গেল, গয়্যাবামেব উপব বজ্রত বিশেষ ভবসা বাথে না। সে  
নিজেই হাঁকিতে লাগিল—‘মন্দ, ও মন্দ মেয়ে, পড়াশুনো বন্ধ কবে এক-  
বাবটি ওপব থেকে নেমে আসুন তো শ্রীমন্দালিকা দেবী—’ দবজাব  
কাছে দাঁড়াইয়া উপবতলায যাইবাব সিঁড়ি দিয়া বজ্রত প্রচণ্ড হাঁক  
পাঠাইতে লাগিল। বজ্রত এ-বাড়ির ছেলের মত, এবং আদব-কায়দা  
তাব কোনও দিনই ধাতে সয় না। অনায়াসেই সে ফ্যাশানবিরুদ্ধ  
চৈচামেচি কবিতে পাবে। কিন্তু তবু মন্দালিকাব কোনও সাড়া  
পাওয়া গেল না।

সত্যবতী হতাশ হইয়া ডাকিলেন, ‘ওরে গয়্যাবাম, গেলি কোথায়?’

‘গয়্যাবামকে পাওয়াব চেয়ে মন্দটাকে ধবে আনাই সহজ হবে, কাকীমা।’  
বজ্রত কহিল। ‘আপনি আব বেচাবিকে মিথো ডাকাডাকি কববেন  
না, শ্রীমতীব চুলের মুঠি ধবে আমিই হাজিব করে দিচ্ছি।’ বলিয়া  
সে বীবেব ভঙ্গিতে মন্দানিকার সন্ধানে বাস্তব হইল। সত্যবতী মৃদু  
একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিয়া আডমোড়া ভাঙিলেন এবং আবাব অধ্যবসায়-  
সহকায়ে ডাকিলেন—‘ওবে, গয়্যাবাম, শুনচিস, বাবুচ্চিকে একবাব ডাক।  
বাতের ব্যাথাটা জোর করেছে, আর এই সুযোগে হতভাগা বাবুচ্চি কি  
দিয়ে কি বেঁধে বসে আছে, ভগবান জানেন—’

বজ্রত হাঁকিতে হাঁকিতে উপবতলায যাইবার সিঁড়িব কাছে অগ্রসর  
হইল। দাবোয়ান ভজন সিং অফিস-ঘরের আলো বন্ধ কবিয়া বাহিবের

বারান্দা দিয়া খড়ম পায়ে 'খটাস্ খটাস্' শব্দে দেউড়ির দিকে নিজ ঘরে যাইবার উজোগ করিতেছিল, রজতের টেচামেচি শুনিয়া কৌতুক করিয়া কহিল—'ক্যায়া হুয়া, হুজুর? ডাকু গিড়া ক্যায়া?'

এ-বাড়ির চাকর-দাসী সকলেই রজতকে পছন্দ করে; এদের সবার সঙ্গেই রজতের আলাপ-আলোচনা, এমন কি কখনও বসিকতা পর্যন্ত চলে। এই সব অধীনস্থদের প্রতি শহবেব ধনী পবিবাবগুলিতে যে ঐদাসীজ্ঞ এবং অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, তাহা বজতকে বড় বাথা দেয়। মানুষ মানুষকে এত দূব, এত অবহেলার কি কবিয়া যে মনে কবিতে পারে, সে ভাবিয়াই পায় না। বজত আঠেশব দেখিয়াছে, গ্রামের গৃহস্থালিতে অধীনস্থদেরও একটা বিশেষ স্থান আছে, তাহাদের সঙ্গে তাহার সম্প্রীতির কথা বজত এখনও বিশ্বত হয় নাই। ভজন সিংকে কহিল—'ডাকু আনেসে ভি তুম্‌হারা ঘবকী লডকী আওয়াজ নহী দেতী, ভজন সিং!... আচ্ছা হায়?'

'হুজুর।'

'আজকাল কিতনা কঁচা দুধ পীতা হায়?'

'দুধ কিধব মিলেগা, হুজুব. গরিব আদমী।'

হাসিয়া রজত অগ্রসর হইল।

'মন্দা! ও মন্দ! কোথায় গেলি, মেয়েটা। খুব তামাশা হচ্ছে, না? পিঠটাকে মায়া কর তো শীগ্‌গির সাড়া দাও।'

উপরতলায় শুইবার কোণেব ঘবটায় অবশেষে মন্দালিকাকে আবিষ্কার করা গেল। স-চিৎকাবে পদা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ কবিতেই বজত আরেকটুকু হইলে মন্দালিকার উপবে ছম্‌ড়ি থাইয়া পড়িত। সামলাইয়া লইয়া কৃত্রিম ক্রোধের ভঙ্গিতে কহিল, 'ডাকচি, শুনতে পাস্ না? গলাটাকে একবারে জখম করে ফেলেচি, আর এইখানে চুপটি করে পাড়িয়ে মজা দেখা হচ্ছে?'

মন্দালিকা খুঁকির যোগ্য স্বরে জবাব দিল—‘বা: রে, পডছিলাম না বুঝি?’

‘পড়লে কি একটা জবাবও দেওয়া যা না। আমরা কি আব কখনো পডি? আমাব আজ এখানে নেমন্তন গো, জানো?’

মন্দালিকা কহিল, ‘বা:, জানিনে বুঝি।’

‘তবে আব পডছিলে কেন?’

‘বা রে, তাতে কি?’

‘তাতে পদ্মার সাইক্লোন, স্তরাং অনধ্যায়। কবে কবে অনধ্যায় হয়, জানিস্? ময়ুসংহিতায় লেখা আছে। তুমি যদি বসে পড়া কবো, তবে আমি কবি কি, শুনি? আমি বুঝি শুধু খেতেই আসি? হস্টেলে বুঝি আব আমাদের বাস্না হয় না? চমৎকাব বাস্না হয়। যা স্বাদ।’

মন্দালিকা সামান্য দুষ্টুমির স্বরে কহিল, ‘খুব স্বাদ?’

‘তা আব নয়, চমৎকাব সব স্বাদ। আলু খাচ্চ, মনে হচ্ছে গাজব। সিম্ খাচ্চ, মনে হচ্ছে পালং শাক। মাছ খাচ্চ, মনে হচ্ছে পাপর ভাজা।’

মন্দালিকা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে অঁচল গুঁজিয়া দিল। কহিল—‘ও:, এমন। তবে আব এলেন কেন। এখানে খেতে যে বড কষ্ট হবে।’

বজ্রত কহিল, ‘উপায় কি, তোব গানের পরীক্ষা নিতে হবে তো। তা কি মহাবাহীকে সাবা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কি কি নতুন গান শিখেচিস, শোনা। তাব উপব পাস-ফেল নির্ভব কবচে।’

মন্দালিকা আপত্তিব ভঙ্গি কবিয়া কহিল, ‘তা বৈ কি।...আমাব গলাটা একটুও আজ ভাল নেই। যা শর্দি হয়েছে—’

বজ্রত হাসিয়া কহিল, ‘একেবারেই ইস্কুলেব মেয়ে! না সাধ্লে অবশ্য গান গাওয়া উচিত নয়, কিন্তু রোজ বোজ একই কারণ দেখালে

সাদ্বে কে রে, বোকা?’ ‘বলিয়া মন্দালিকার একটা হাত ধবিয়া টানিয়া কহিল—‘আয়, বসবাব ঘবে এসে একটু নাকী হুব শুনিযে যা—আবাব হুষ্টুমি—হাঁ, নাকী হুবই আমার পছন্দ—’

মন্দালিকাব প্রথম গানটা সমাপ্ত হওয়া মাত্র সত্যবতী বাতেব ব্যথা উপেক্ষা কবিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, ‘তোমবা বসে গল্পগুজব কব, আমি যাঈ, একবাব হতভাগা বাবুচ্চিটাকে দেখে আসি। বাতেব ব্যথায় নডতে পাবি নে, এই সুযোগে লক্ষ্মীছাড়া আন্ধেক জিনিষ সবিয়ে ফেলে, আব বাকি আন্ধেকে অখাণ্ড বঁাধে। কী যে কবব হতভাগাদেব নিয়ে। ওবে, ও গয়াবাম—’ বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মেদবল্ল কলেববটিকে কোন প্রকাৰে বহন কবিয়া তিনি প্রস্থান কবিলেন, এবং বহুইখানায় যাইবাব হুশ্চেই না কবিয়া বাবান্দাব অগ্ৰপ্রান্তে এক বেতেব চেয়াবে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। অত্যধিক পৰিশ্রমে হাঁপাইতে লাগিলেন।

‘বড যে খন্দব পবাব শখ হয়েছে।’

‘হয়েচৈ তো।’

‘ড্রেসিং টেবিলেব স্নো-ক্রিম্-গুলি কোথাকাব তৈবি শুনি?’

‘গুলি তো ওষুধ।’

‘বেশ, বেশ।—অস্তত, স্বদেশী গান তো গাওয়া উচিত।’ বজ্রত কহিল, ‘তাতে বোঝা যায়, মনটা স্বদেশী কিনা।’

‘নাঃ বে, বিদেশী গান গাইলাম বুঝি?’ মন্দালিকা সপ্রতিবাদে কহিল।

‘একটা শুনে তা কখনও বিচার করা চলে?’ বজ্রত কৃত্রিম গাভীৰ্য্যেব সঙ্গে কহিল। ‘আবও হুঁপাঁচটা শুনি, তবেই যদি এ-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছতে পাবি। নাও, আরেকটা ধরো—’

মুচ্ছিয়া হাসিয়া মন্দালিকা কহিল—‘যত সব আপনাব চালাকি—সক

বুঝতে পারি। আবেকটা কবেই কিন্তু আমি 'পালাব, বলে বাখচি।'

বজ্রত চোখ উঠাইয়া কহিল, 'কেন ঠাকরণ, কি কাজটা আপনার ?'

'বা: বে, কাজ আছে না ? কত কাজ।' বলিয়া মন্দালিকা অর্গ্যানের তলদেশে পদাঘাত কবিশ্য সুব উঠাইল—গ্যাং গ্যাং গ্যাং এবং অচিবে গানটা সমাপ্ত কবিশ্য এক ছোট বাহির হইয়া গেল, অতিশিব অন্তমতির অপেক্ষামাত্র কবিল না।

বজ্রত চিংকাব কবিশ্য কহিল—'দাঁড়া, হোব দুষ্ট্র মিটা বাব সবচি।'

বজ্রত জানে না, মন্দালিকা ওক লজ্জা কবিতে আবস্ত কবিশ্যছে। এটা অত্যন্ত অল্প দিনেব ব্যাপাব। বজ্রতের কাছে মন্দালিকাব কোনও লজ্জাই ছিল না। বোনের মত সহজ স্বাধীনতায় বজ্রতের সঙ্গে সে কখনও কোতুক, কখনও দোবাত্তিয়া এবং কখনও বা অভিমান কবিত। এমন সময় সহসা তাব দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কব-রূপে বদলাইয়া গেল। মন্দালিকা শুনিতে পাইল, ওব মা ওব বাবাকে বলিতেছেন—'বজ্রতকে একবাব বলেই দেখ না, মন্দাব সাক্ষ তো কত হাসি খেলা কবে, অপছন্দ হবে কেন ?' গম্ভীরবাবে সত্যানন্দ কি বলিলেন, সে কি অনুমোদন, না তাব বিপবীত, তাহা মন্দালিকা ঠিক শুনিতে পায নাই ; কিন্তু তখন হইতেই এক বিস্ময়কব পবিবর্ত্তন তাহাব মধ্য দেখা দিল, এবং তাব ফল এই হইল যে, বজ্রতকে আজকাল সে লজ্জা কবিতে আবস্ত কবিশ্যছে।

বাতের আত্মবেব পব সত্যানন্দ বজ্রতকে অফিস-ঘবে লইয়া গেলেন এবং এস্টেট-সংক্রান্ত কতগুলি বিষয় তাব সঙ্গে পবামর্শ কবিশ্য কোটাল-নগবে ম্যানেজাববাবুব কাছে পাঠাইবাব জন্ত কিছু আদেশ-পত্রেব খস্‌ডা তৈরি কবিলেন। বিশেষ কবিশ্য এই কাজেব জন্তই বজ্রতকে আজ তিনি নিমন্ত্ণ কবিশ্যছিলেন। এস্টেটের পরিচালনায় তাব পবামর্শ গ্রহণেব প্রয়োজন হইলেই বাত্রে

রজতের এ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকে, একমাত্র রাতেই সত্যানন্দের সময় হয়। তারপর চিঠিপত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি তাঁব ক্লার্কের হাতে সেগুলি সেই কবাইবার জন্ত বজতের নিকট হস্টেলে পাঠাইয়া দেন। বজত এই বুদ্ধের মহাহুভবতায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। রজত কহিত—‘কাকাবাবু, আপনি যা ভাল বোঝেন, তার চাইতে কি আমি কিছু বেশি বুঝব? আমার পরামর্শ এমন করে নেওয়ার কি প্রয়োজন?’ বুদ্ধ সত্যানন্দ মুহূ হাসিয়া কহিতেন—‘শিখতে হয়, সবই শিখতে হয়, বাবা। না শিখলে চলবে কেন।’

বজত যখন হস্টেলে ফিবিল, তখন বাত দশটা বাজিয়া গেছে। পাঁচতলাব খোলা চত্বৰ্ণায় তখন বীতিমত এক বিতর্ক-সভা বসিয়া গেছে এবং প্রথমত তাব সৰ্বপ্রধান ও সৰ্বাধিক বাজ্য বক্তা সমর ভট্টাচার্য বক্তৃতা দিতেছিল :—‘হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস কবি, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, পোলিটিক্যাল স্টেট্ একটা ধাপ্পাবাজী। সমাজে যাবা প্রকৃত শ্রমিক, ধন যাবা সত্যি সত্যি নিজ হাতে উৎপাদন কবে, শুধু তারাই সমাজ নিয়ন্ত্রণেব অধিকারী। যাতে তাদের মঙ্গল হয়, সমাজ-ব্যবস্থা শুধু তেমনি হওয়া উচিত। তোমাদের স্টেটেব আসল কপটি জান?—ওটা হচ্ছে বুর্জোয়া-সম্প্রদায়েব একটা আণ্ডা, তাদের অত্যাচারেব কলকাটি। তাই আমি শুধুমাত্র সোশ্যালিজম্-এ সন্তুষ্ট নই, আমি অন্ততপক্ষে সিণ্ডিক্যালিজম্ চাই। আমি বলি—’

স্বনন্দ বাধা দিয়া কহিল, ‘স্বাধীতায় যদি সত্যিকাবের আস্থাবান হও, তবে অন্তত সিণ্ডিক্যালিজমের এক-চোখোমিটা তুলে যেয়োনা। সিণ্ডিক্যালিজম্ তো সৰ্বসাধারণেব ওপর শ্রমিক এবং ট্রেড্-য়ুনিয়নের অত্যাচার। গোডামিটা তোমার একটু কম তীব্র হলে অন্তত গিল্



সোশ্যালিজম্ পছন্দ কবতে—কেননা, তাতে পোলিটিক্যাল স্টেট এবং গিল্ড্ দুই-ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান ।’

‘আমবা কাকব পবানীনতা চাই না’ উত্তেজিত হইয়া সমব সচিংকান্বে কহিতে লাগিল। ‘আমবা পবিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। লেনিন্ পর্য্যন্ত বিশ্বাস কবতেন যে, প্রলিটাবিষেটদেব ডিক্টেটব্শিপ্-এব প্রয়োজনটা মিটে গেলেই স্টেট্-প্রথাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে ফেলা হবে। ইতিহাসে এতাবৎ-কাল গবর্ণমেণ্টেব প্রধান কাজ কি হয়ে’চ, জ্ঞান ? মানুষেব পবম্পবেব উপব অণ্ডায় অব্যাহত বাথতে স্টেট্ চিবকাল—’

‘পূর্ণানন্দ কোথায় ?’ বজ্রত অকস্মাৎ পিছন হইতে বজ্রতায় বাধা দিয়া কহিল। ‘বায়ুমণ্ডলে প্রমত্ত ঝঞ্ঝাব সূচনা—বাঁশি না হলে এ-ঝড় থামায় কাব সাধ্য ! ওবে সমব, তোব ওবেটবি একটু থামাবি ?’

‘আমাদেব আদর্শ হচ্ছে—এনার্কিজম্ ।’ সমব ভট্‌চাজ না-দমিয়া কহিতে লাগিল। ‘মানুষ পবম্পবেব সঙ্গে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে শুধু সৌহৃদ্যেব আনন্দে, অনাবিল আত্মীয়তাবোধে মিলিত হবে—মানুষেব আত্ম্যাব স্বাধীনতাকে কোনও গবর্ণমেণ্টেব জববদস্তি, কোনও আইনেব বন্ধন, কোনও কৃত্রিম নিষেধ থকা কবতে পাবে না ; মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হবাব সুযোগ পাবে। প্রিন্স্ ক্রপট্‌কিন্ বলেছেন—’

‘শুনচিস, সমব,’ বজ্রত মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, ‘এত হান্সামা কবে নেমন্তন্ন থেকে বাঁচিয়ে থাবাবগুলি তবে কি আমি শুধুশুধুই নিয়ে এলাম ? তোবা দেখি সবাই নিলোঁভ পুরুষ হয়ে উঠেছিস।’ বলিয়া যে-পুঁটলিটাতে জমিদাবি-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র বাঁধিয়া বগলে চাপিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহাই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে নাড়িয়া দেখাইল। ‘আসবি যদি, তবে তাড়াতাড়ি আয়, বড় ঘুম পেয়েছে, এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়ব।’ বলিয়া বাঁগুলটা আবার নাড়িয়া দেখাইয়া বজ্রত দ্রুত প্রস্থান করিল।

সমর লুকভাবে তাকাইয়া দেখিতেছিল। কহিল—‘দাঁড়া, এই এইটুকু  
সেইরই আসচি। গবর্ণমেন্ট লোককে কতটা অধঃপাতিত কবতে পাবে,  
জানিস্? প্রিন্স্, ক্রপটকিন্ বলেছেন—দিস্ অব্ জাট্ ডেস্পিকেবল্  
মিনিস্টার মাইট্ হ্যাভ্ বিন্ অ্যান্ এক্সেলেন্ট্ ম্যান্ ইফ্ পাওঘাব্ হ্যাভ্  
নট্ বিন্ গিভেন্ টু হিম্—বজ্রত দাঁড়া, এই এলাম, বন্ধ কবিস্ না—কিন্তু  
তোমাদের কংগ্রেসের কাধ্যাবলী আমি কিছুতেই অমুমোদন কবতে পাবি  
না, কিছুতেই নয়। বজ্রত—’

ইহাব কয়দিন পবে বজ্রত আবাব সত্যানন্দেব বাড়ি যাইবাব জন্ত  
বাস্-এ চাপিয়াছে। প্রাথ সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত মূহুরবে পিছনেব আসন  
হইতে ডাক আসিল, ‘বজ্রতবাবু?’

ঘাড ফিবাইয়া দেখিয়া বজ্রত কহিল—‘ওঃ, আপনি। দেখতে পাইনি  
তো আগে। বাড়ি ফিবছেন?’

উত্তবে মঞ্জবী সম্মতি জানাইয়া বজ্রতকে তার আসনেব অপবাক্কে  
অঙ্গিয়া বসিতে আহ্বান কবিল। বজ্রত এ-আমন্ত্রণকে মোটেই কোনও  
সৌভাগ্য মনে কবে না, কিন্তু মঞ্জবীকে তত্ৰাশ কবিতো তাব দ্বিগ্ হইল।  
চলমান বাস্‌টাব গতিতে টলিয়া টলিয়া মঞ্জবাব পাশে যাইয়া বসিয়া পাডয়া  
কহিল, ‘আমাব বাড়ি যদি কলেজ থেকৈ দূৰ্ হতো, তবে এমনি একবাণ  
বই নিয়ে বাস্-এব ঝাঁকুনি গেতে খেতে বোজ্র মজা কবে কলেজে আসতে  
যেতে পাবতুম। কলেজেব গায়েই বাস কবি, কলেজ বাত্ৰাটাকে কিছু  
গৌববজ্রনকষ্ট মনে হয় না।’

‘ব্যঙ্গ কবা হচ্ছে?’ মঞ্জবী চোখ বাঁকা করিয়া কহিল।

‘মোটেই নয়।’ বজ্রত প্রতিবাদ কবিল। ‘কোনও কথাই কি অকপটে  
বলতে পাবব না? সত্যই বলচি, জগতেব সমুখ দিয়ে বই বগলে কলেজে

আসাটা আমি অত্যন্ত গোরবজনক মনে করি। আমি ছাত্র, আমি জ্ঞানের সন্ধানী, এই কথাটা বিশ্বকে জানান কি কম প্রাধাব ?’

‘কোথায় যাচ্ছেন ?’

‘যদি বলি কালীঘাটেব মা কালীকে দেখতে, বিশ্বাস করবেন ?’

‘কিছুমাত্র না।’

‘নাই কবলেন।’ বজ্রত হাসিয়া কহিল। ‘শেষ-গন্তব্য টালিগঞ্জ।’

‘টালিগঞ্জ। কেন ?’ কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মঞ্জরী প্রশ্ন করিল।

‘যদি বলি, দূর দেশ ভ্রমণ করিতে, তবে কি বিশ্বাস করিতে পাববেন ? কিন্তু কথাটা সত্য। একই বকম পিচ-বাঁধান বাস্তা, বেলিং-ঘেবা পার্ক আব ইন্টেব স্তূপ দেখতে দেখতে আমি হাঁপিয়ে উঠি। একটু দম-সংগ্রহ কবে আনবাব জ্ঞান আমাকে মাঝে মাঝেই পাডাগাঁয়ে যেতে হয়। দম্‌দমা, দক্ষিণেশ্বর বা টালিগঞ্জে পল্লী খুঁজে নেওয়া সহজ, এবং পথও দুর্গম নয়।—অমন অবাক হ'ব কি দেখছেন, যে গ্রামা ছিলাম সে গ্রামাই বয়ে গিয়েচি, কিছুই আব উন্নতি হলো না।’

বাস্টা এতক্ষণে ধর্মতলাব মোড়ে আসিয়াছে। স্থানটা আবিষ্কার কবিয়া মঞ্জরী সহসা কহিল—‘বড তেষ্ঠা পেয়েছে। যদি কেউ একটু সববং গাওয়াতো উপকৃত হতাম।’

‘বেশ তো।’ বিব্রতভাবে বজ্রত কহিল।

মঞ্জরী অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলমান বাসটাকে হাঁকডাক কবিয়া থামাইল। কহিল, ‘তবে আসুন।’

অনেকটা পর্যন্ত বজ্রত বিবাক্ত বোধ কবে নাই, বা মঞ্জরীর ব্যবহার তাব কাছে বাড়াবাড়ি বা ক্রেশকব মনে হয় নাই। কিন্তু সাহেবী হোটেলে লিমন্‌স্‌ফায়ান্স পান শেষ কবিয়া বাহিবে আসিয়া মঞ্জরী যখন ফবমাস করিল, ‘চলুন না, নিউ-মার্কেটটা ঘুরে আসি। বিশ্বব জিনিষ কেনবার

আছে।’—তখন বজ্রত সতাই কিছুটা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভাবিল, আচ্ছা মেয়ে তো। উনি যাবেন বাজ্যের লেস, জর্জেট, অর্গেণ্ডি কিনতে, আমাকে গুঁব সঙ্গে গাধা-বোটের মতো খাম্খা ঘুবে মবতে হবে। এ কি আশ্রাব!

কিন্তু যাইতে হইল এবং সম্পূর্ণ দেড় ঘণ্টাকাল মঞ্জরীর নির্ঝাক সাথী হিসাবে দোকান হইতে দোকানান্তরে ওব পছন্দেব যুদ্ধ দেখিয়া বেড়াইতে হইল। অবশেষে কেনা সমাপ্ত কবিয়া মঞ্জরী দুট হাঙ্গিয়া কটাক হানিয়া কহিল, ‘খুব রেগে উঠেচেন তো? একটু দেরি হযে গেল, কি কবব। কিনতে এলে এমন একটু হযই। কিন্তু বিনা পাবিশ্রমিকে খাটাই না। বাড়ি চলুন, ভাল চা খাওয়াব। মা তো কতদিন আপনাব কথা বলেন— একদিনও তো গেলেন না—’

বজ্রত গম্ভীর হইয়া কহিল, ‘আজকে নয়।’

‘তবে কবে বলুন?’

‘অন্য একদিন। আপনাব কেনা সব শেষ হয়েচে তো? নমস্কাব।’

মঞ্জরী মুহু একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ট্রামে চড়িল।

## চার

ইহাব কয়মাস পবেই ভাবতবর্ষেব বাজ্রনৈতিক আকাশে বিষম দুর্ঘ্যোগেব সূত্রপাত হইল।

মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে পঞ্চাশজন অহিংস স্বেচ্ছাসৈনিক লইয়া তাঁহাব ইতিহাস-বিখ্যাত ডাণ্ডী যাত্রা কবিলেন, ভারতবর্ষে আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভাইসরয় লর্ড আরউইন্ ব্যাপাবটাকে সামান্ত মনে করিয়াছিলেন। তাঁর নীতি দেখিয়া মনে হইল, এ-আন্দোলন অতি সহজে থামিয়া যাইবে বলিয়াই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু দেখিতে দেখিতে

দাবানলেব মতন এই স্বাধীনতা-আন্দোলন কুমাবিকা হইতে হিন্দুকুশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে বর্ষা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। আসমুদ্র হিমাচল ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনিতে মুখ হইল। উত্তেজনা, উন্মাদনা, আত্মত্যাগেব স্তমহান্ আডম্বের অবধি বহিল না। সমগ্র জগৎ ভাবতবর্ষেব এই অভিনব যুদ্ধেব দিকে বিস্মিত সম্মত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিল।

আইন-বিবোধিতাব তীব্রতা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইংবেজেব গভর্ণমেণ্ট সজাগ হইয়া উঠিল। আন্দোলন দাবাইয়া দিবাং চেষ্টাব ক্রটি বহিল না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সর্কোণতম হইয়া উঠিল, সংবাদ-পত্রেব স্বাধীনতাব বিশেষ কিছু বজায় বহিল না, আন্দোলনেব সঙ্গে লড়িবাং জন্ত অর্ডিনাম্বেব পব অর্ডিনাম্স প্রবর্তিত হইল। কংগ্রেসেব নতুন কাণ্ডাবলী, গভর্ণমেণ্টেব নতুন দমনাত্ম, নতুন উত্তেজনাং এবং নতুন সংগ্রামেব বিবরণ সমস্ত দেশকে সচকিত কবিয়া বাখিল।

ছাত্র-সমাজে উত্তেজনাং অন্ত নাই। খববেব কাগজে প্রতিদিন নতুন নতুন বোমাধুকব বিবরণ বাহিব হইতেছে। কংগ্রেসেব প্রতি যাদেব বিশেষ কোনও আত্মগত্যা ছিল না, এমন বহু ছাত্র বিক্ষোভেব সৃষ্টি হওয়াং পব কংগ্রেসেব সভা হইল—সমস্ত ভাবতবর্ষ জুড়িয়া এক বিবাট মন্থন শুরু হইয়া গেল।

এই মন্থনেব প্রতিধ্বনিটা কিন্তু সর্কাপেক্ষা তীব্র হইয়া বাজিতে লাগিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সিকস্খ্ ইয়াবেব ছাত্র মনোবজ্ঞন দত্তবায়েব কণ্ঠে। তাং সচবাচরেব জ্বালাময়ী বক্তৃতা বিষ উদ্দীপণ করিতে লাগিল। একমাত্র কণ্ঠ দিয়াই সে যেন সমগ্র তত্ত্বাচ্ছন্ন ছাত্রসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়া তবে ছাডিবে। যেন হাত ধরিয়া সজোবে টানিয়া লইয়া ভীকৃ এবং অনিচ্ছুকদেব জ্বলেব দরজাং নিকট আগাইয়া দিবে, তবে স্তান্ত হইবে। ‘স্বাধীনতা, স্বাধীনতা’, সে সচিংকারে বাবম্বাং উচ্চারণ কবিত্তে

থাকে, 'সবাব উল্লেখ স্বাধীনতা! এজুকেশান্ ক্যান্ ওয়েট, স্বরাজ ক্যান্ নট।' ইতিমধ্যে বজ্রতকে নিবালায় পাইয়া সে তাদেব সেই সমিতিব কথাটা পুনবায় উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু বজ্রত এবাবেও কোনও উৎসাহ দেখায় নাই। ক্রুদ্ধ হইয়া মনোরঞ্জন বলিয়াছে—'চাবদিকে এই অবর্ণনীয় অত্যাচাব, এই অমানুষিক জববদস্তি, এই কুৎসিত বিভংসতা, তবু তোমার বিবেক জাগল না—দিক্।'

স্বাধীনতা-আন্দোলনেব প্রতি একদল মুসলমানেব ঔদাসীণ্য এবং বিরুদ্ধাচাব বজ্রতকে বড় পীড়া দিতেছিল। স্বাধীনতা তেঁা সকলেবই সমান কামা, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতাব প্রশ্ন ওঠে কেন। স্বাধীনতাব জ্ঞাত যখন সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া এমন একটা তীব্র আন্দোলনেব সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তাকে সাহায্য কবা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীবেই কর্তব্য নয় কি? অথচ শক্তিশালী একদল মুসলমান নেতা যে ইহাব বিরুদ্ধাচাবণ কবিতেকে এবং মুসলমান-সম্প্রদায়েব যে একটা অনগণ্য অংশ স্বাধীনতা-আন্দোলনকে হিন্দুব ব্যাপার মনে কবিয়া ঔদাসীণ্য প্রদর্শন কবিতেকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বজ্রত মুসলমান-সম্প্রদায়কে ভালবাসে; তাই তাব আদর্শবাদ বড় আঘাত পাইল। কাজেই বিবিবাব দুপুরে জহির আসিয়া যখন তার ঘবে প্রবেশ কবিল তখন বজ্রত তার স্বভাবেব ব্যতিক্রম কবিয়া জহিরের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইল।

'মুসলমান-সম্প্রদায় এমন ঔদাসীণ্য দেখাচ্ছে কেন, বলতে পাবিস, জহির? দেশটা কি হিন্দুদেব একলার?'

স্বাধীনতা-আন্দোলনে যারা বাধা দেয় এবং স্বাধীনতা বিষয়ে যারা উদাসীন, তাহাদের উভয় দলেবই প্রতি জহিরের বিবাগও প্রচুর, তাব নিজ সম্প্রদায়ের এক বড় অংশের এই বাবহারে সে মর্ম্মাহত ও তাব হিন্দু বন্ধুদের কাছে নিজেকেই প্রায় অপরাধী বোধ করিত। তবু সে কহিল—

‘মুসলমান-সম্প্রদায় হয়তো সন্দেহ করে যে, এই আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থেব অমুকুল নয়, কংগ্রেসেব প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দু স্বার্থ-বৃদ্ধি, এতে মুসলমানের লাভ কিছুই নেই।’

‘বেশ, তাই যদি হয়, তবে মুসলমানেরা দলে দলে এসে কংগ্রেসে যোগ দিক না কেন।’ কংগ্রেস তো ক্লোজ্‌ড্‌ অ্যাসোসিয়েশ্যান্‌ নয়, সভ্য হওয়ার পক্ষে কারুবই বাধা নেই। মুসলমান-সম্প্রদায় যদি মনে করে, কংগ্রেস হিন্দুস্বার্থে চালিত হচ্ছে, তবে দলে দলে এসে কংগ্রেসেব রূপ তাবা বদলে দিক, কংগ্রেসেব নীতিকে তাবা প্রভাবান্বিত করুক। ধর্মের সঙ্গে পলিটিক্‌স্‌ এমন কবে জড়িয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিবোধিতা কবা কি উচিত হচ্ছে, জড়িব?’

‘হচ্ছে না,’ জড়িব বালিশটায় কলুইয়েব ভব বাথিয়া বলিল। ‘কিন্তু সন্দেহেব অবকাশ কি হিন্দুবাঈ সৃষ্টি কবে নি, বন্ধু। তুমি বাগ করো না, স্পষ্ট করে মনের কথা আমাকে বলতে দাও। এতকাল ধবে বাংলা-দেশে মুসলমানেরা কোন্‌ স্থান অধিকার করে ছিল, একবার ভেবে দেখো? সব চেয়ে নিচু স্থান ছিল তাদের জন্ম বাঁধা। তারা শিক্ষা পায় নি, সুযোগ পায় নি, বড় এবং বিকশিত হবার অবকাশ তাদের মধ্যে অল্পজনই পেয়েছে। অথচ শিক্ষা-দীক্ষায়, আভিজাত্য এবং সংস্কৃতিতে, ধনে-দৌলতে সহস্রগুণ অধিক উন্নত হিন্দুসম্প্রদায় তাদের উন্নতির জন্ম কতটুকু সাহায্য করেছে? একটা সমগ্র সম্প্রদায়কে তোমরা হুলে ছিলে, এতকাল ধবে তোমরা তাদের শুধু অবহেলাই কবে এসেচ। চাষা আর বাবুর্জি, লাঠিয়াল আর চাপরান্ধি, এই তো ছিল তাদের বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র। তাই আজ যখন সমগ্র সম্প্রদায়টার মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তখন তোমাদের প্রতি শুধু সন্দেহ নয়, আক্রোশও যদি তীব্র হয়ে উঠে, তবে মুসলমানদের এই আত্মঘাতী ব্যবহারে ছুঁথিত হ’তে পারি, কিন্তু বিস্মিত হ’তে পারি না।

যেমন ইংবেজের উপর তোমাদের বর্তমান আক্রোশটা একটা স্বাভাবিক বাড়াবাড়ি, হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রোশটাও অনেকটা সেরকম...

রজত কতক্ষণ চুপ কবিয়া ভাবিল। তাবপব কহিল—‘অন্ত্যাদেব প্রতি উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এই ঔদাসীন্যই বল আব অত্যাচাবই বল, অত্যন্ত নীচ এবং আত্মঘাতী, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রতি প্রয়োগ কবাব জগ্নই তাব সৃষ্টি হয় নি, হিন্দুসমাজে অমূল্যতদের উপর তা সমান নিষ্পন্নতাব সঙ্গে প্রযুক্ত হযেছে। মুসলমান-সম্প্রদায় যদি এই অন্ত্যাদেব বিরুদ্ধে একটা সামাজিক বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলত, আমি স্বর্কান্তঃকবণে তাদের পক্ষে যোগ দিতাম। কিন্তু যা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলা যায়, তাব জগ্ন মুসলমানেবা এ কি আবশ্য করেছে বল তো? একটা বাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি কবে তাবা যে সমস্ত দেশেব স্বার্থই জলাঞ্জলি দিতে বসেচে। ঘবোয়া-বিবাদ কবে সাবা ঘব পুড়িয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানেব কাজ? আদত লড়াইয়েব কথা! বিশ্বৃত হয়ে যদি আমবা পবস্পবেব সঙ্গে লডতে শুরু কবি, তবে তুইও ঠকবি, আমিও ঠকবো, আমাদেব দুজনেরই হাব হবে।’

‘তা আমি জানি, বন্ধু। জানি বলেই এমন দুঃখ পাই। কিন্তু আমাদেব সম্প্রদায় এখনও বড অশিক্ষিত। অশিক্ষিত বলেই আমাদেব সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থপবতাব নিকট আবেদন কবে’ এতটা স্তবিধা কবতে পাবছেন। নিজস্ব স্বার্থেব জগ্ন মহান্ ইসলামীয় সম্প্রদায়কে তাঁরা ভুল বোঝাচ্ছেন, হিন্দু-বিদ্বেষ খুঁচিয়ে জাগাচ্ছেন—মানুষেব যতগুলি অসভ্য বৃত্তি, মুসলমান-সাধারণেব মধ্যে তা প্রচাব কবে বেড়াচ্ছেন। মুসলমান সমাজেব প্রকৃত মঙ্গল কিসে তা বেমালুম চাপা দিয়ে একমাত্র নিজেদের প্রাধাণ্য বজায় বাখারই চেষ্টা করছেন। অশিক্ষিত না হলে আমাব সম্প্রদায়ের ইতর-সাধারণ এ-কথাটা বুঝত না মনে কব? দেখো না,



তর্কে এঁটে উঠতে না পারলে, অম্নি আমাদের সাম্প্রদায়িক ধুবন্ধরেরা ইসলামেব দোহাই পেড়ে বসেন। যেন ইসলাম কোনও দিন পরাধীনতা অম্মমোদন কবেছে। নিজেদের দুর্বলতা চাপতে গিয়ে তাঁবা বলেন, ‘ইসলাম বিপন্ন।’ যেন ইসলাম এতই দুর্বল। আমার সম্প্রদায় যদি কোনও দিন অধিকতর শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে তুমি ভাবতে পাব, এসব নেতাদেব কখনও তাবা মানবে? একবার ইতিহাসেব পাতাগুলি মনে মনে উন্টে দেখ, ধর্ম্বেব গৌডামি কবে’ গেছে কাবা? তাই তো আমি বলি, যদি মুসলমানদেব বন্ধুত্ব তোদবা চাও, যদি তাদেব ভবিষ্যৎ ভাবতবর্ষে’ উপযুক্ত সিটিজেন্ কবে গড়ে তুলতে চাও, তবে তাদেব মধ্যে শিক্ষাব প্রচলন কবে বেড়াও, তাদেব মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দাও। তাতে বাজনৈতিক প্রচাবেব দশগুণ কাজ হবে..’ বলিয়া জহিব উত্তে-জনায একেবাবে হাঁপাইতে লাগিল।

বজ্রত সসম্মমে এই তরুণ মুসলমানের দিকে চাহিয়া বহিল। এমন সব যুবক যখন মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ কবিয়াছে, তখন হতাশাব কিছুমাত্র কাবণ নাই, অদূব ভবিষ্যতেই ইসলামীয় সম্প্রদায় ভাবতবর্ষে নতুনতর গোববের আসনে উন্নীত হইবে। প্রায় কৃতজ্ঞতাব কণ্ঠে বজ্রত কহিল—‘আজ তুই সত্যি আমার চোখ খুলে দিলি, জহির।’

চাবটাব সময় চা আসিল, খাবাব আসিল, এবং দুই বন্ধু আহাবে প্রবৃত্ত হইল।

চায়েব পব জহিব কহিল, ‘এখন কিন্তু আমার সঙ্গে সিনেমায ঘেতে হবে, বজ্রত। আমি নিমন্ত্রণ কবতে এসেছিলাম, এসে বাজনীতিতে জড়িয়ে গেলাম। বড সর্কনাশা জিনিষ বাজনীতি।’

‘নিঃসন্দেহে।’ বজ্রত হাসিয়া কহিল। ‘কিন্তু হঠাৎ সিনেমা কেন?’  
‘হঠাৎ নয়, আমাদের ঠিকই ছিল।’

‘আমাদের আবার কে রে ?’

‘হাসিনাও আসছে।’ সলজ্জ হাসিয়া জহিব জানাইল। ‘সাড়ে পাঁচটায় সে সিনেমার সামনে পৌঁছবে, তাব আগে আমাদের যাওয়া চাই।’

বজ্রত খুশি হইয়া কহিল—‘তবে নিশ্চয়ই যাব। তোব কা’ছ গল্প শুনে শুনে কতদিন মিস্ জেহানকে আমাব দেখতে ইচ্ছে হয়েচে। শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা কেমন হয়, দেখতে আমাব বড়ই ইচ্ছে।’

হাসিনা জেহান্ জহিবের দূবসম্পর্কের এক মাসিব মে’য়। ওদের বাক্‌দানের কথাটা বজ্রত অনেক দিন হয় জানে। হাসিনা বিটন কলেজে তৃতীয় বার্ষিকে পড়ে। ওবা পর্দা মানে না, প্রয়োজন হইলে অপবিচিত পুরুষের সঙ্গেও কথা কয়; জহিবের এম, এ পবীক্ষা হইয়া গেলেই ওদের বিয়ে হইবে ঠিক আছে—এ সমস্ত খবরই বজ্রতের জানা।

চৌবজি অঞ্চলের এক সিনেমার বাড়ির লাউগে হালকা-নীল খদ্দরের শাড়ি পবা এক তরুণীর সঙ্গে জহির যখন আলাপ করাইয়া দিল, তখন রজ্রত প্রায় চমকিত বোধ কবিল। আভিজাত্যপূর্ণ প্রসন্ন মুখ, স্নিগ্ধ উজ্জলশ্যাম বর্ণ, অতি দীর্ঘ এক জোড়া চোখ, কানে কর্ণভূষণটা জলিতেছে। এমন সুন্দর কবিয়া ফিকা নীলবর্ণের শাড়িটা মেয়েটির সপ্রতিভ সচন্দ্র দেহটি বেষ্টন কবিয়া বহিষ্সাছে যে, প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মেয়েটির প্রতি একটা মধুর ধারণা গড়িয়া ওঠে। সঙ্গে বূড়া এক কাকাকে বাশিয়ার বল-শেভিক বিদ্রোহের সময়কাব এক চিত্র দেখাইতে লইয়া আসিয়াছে, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্যটা যে চাচাজানের কাছে গোপন থাকে নাই, তা বুদ্ধের তৃপ্তি-ভরা দৃষ্টি দেখিয়াই বোঝা গেল।

হাসিনা সহাস্ত্রে রজ্রতকে কহিল, ‘আপনার সমস্ত কথাই আমি জানি। আপনি মোটেই অপবিচিত নন। বরঞ্চ মনে হয় যেন কতদিনের চেনা।’

বজ্রত মূহ হাসিয়া জবাব দিল, ‘জহিব, তোঁব বুঝি এই গুপ্তচরবৃত্তি ? এ-পক্ষের কথা ও-পক্ষে জানান, আব ও-পক্ষের কথা এ-পক্ষকে ?’

সহাস্ত্রে ওবা অভিটাবিয়মে প্রবেশ কবিল।

হাসিনা কহিল, ‘আপনি নাকি মুসলমানদেব খুব ভালবাসেন, রজতবাবু ?’

‘কে বল্লে আপনাকে ?’ বজ্রত কহিল।

‘কেন, জহিরদা বলেছেন।’

‘যদি তাই হয়, তবেই বা বিষয়টা কোথায় ?’

‘এমন তো অনেক হিন্দু আছেন’, একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে হাসিনা কহিল, ‘যাঁরা মুসলমানদেব ঘৃণা কবেন। আমি নিজেও অনেক জানি, কতবাব যে আঘাত পেয়েছি, তা বলগাব নয়।’

বজ্রত কহিল, ‘আছে বৈকি, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্ষ্যবতাব বহু উদাহরণ আছে, কিন্তু তাই বলে সবাই কিছু এমন নয়। তাছাড়া, দেখুন, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খাওয়া-ছোঁয়াব গোঁড়ামি বড় বেশি। সেজন্য কিছু, হয়তো বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ঠোকাঠুকিব জন্ম কিছু, এমনটা হয়। তবে আমরা কি মনে হয়, জানান ? রাজনীতি-ক্ষেত্রে হিন্দুদেব বিপক্ষাচরণটাই মুসলমানদেব প্রতি হিন্দুদেব মন বিরুদ্ধভাবাপন্ন কবে তুলেচে। কিন্তু আমি তো জানি, প্রকৃত মুসলমান কি বকম হয়।’ বলিয়া জহিবের দিকে চাহিতেই জহিব চোখ নিচু কবিয়া কহিল, ‘তুমি বড় বাড়াবাড়ি কব, বজ্রত।’

হস্টেলে ফিবিয়া বজ্রত দেখিল, চত্বরে বিবাট জটীলা বসিয়া গেছে। সঙ্ঘ্যাকালীন খবরের কাগজে আন্দোলন সম্বন্ধে নতুন নতুন সংবাদ বাহিব হইয়াছে। উত্তেজনার আর অন্ত নাই। স্নান এবং অন্ত্রাশ্রিত-

কণ্ঠে নানা বাক্য বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু দেখিয়া রজত বিস্মিত হইল, বাগ্মিতা প্রকাশ করিবার এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে সময় উপস্থিত নাই।

নতুন সংবাদগুলি জানিয়া লইয়া এবং আবও কিছুক্ষণ তর্ক এবং উত্তেজিত উক্তি সকল শুনিবাব পব সে কহিল—‘সমর কোথায় গেল আজ?’

সুনন্দ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যে স্বব লাগাইয়া কহিল—‘দেশেব দুদিনে কি ওদেব সন্ধান পাবে? সোশ্যালিস্ট না ব্যাঙ। যখন দাযিত্ত বইবাব সময় হয়, তখন বড বড বুলি ছেড়ে আদত কর্তব্যটা এডিয়ে যায়। সমব ভটচাজ্কে আমি চিবকালই জানি—ওর সাম্য আব সমাজতন্ত্র হচ্ছে অণ্ণেব তেল আব সাবানেব শ্রীক করা।’

সুনন্দেব বক্তৃতা শেষ হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। একবাব চোখ উঠাইয়া জনতা লক্ষ্য কবিল, কিন্তু বক্তৃতা দিবাব এতবড একটা স্বযোগ উপেক্ষা কবিয়া পকেট হইতে চাবি তুলিয়া তাহা নাড়িতে নাড়িতে নিজের ঘবেব দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

প্রবীৰ বর্দ্ধন হাঁকিয়া কহিল, ‘খববটা কি, সময় ভটচাজ?’

সমব ওখান হইতেই কহিল, ‘আচ্ছা কবে শুনিযে দিযে এলাম জে, এম, সেনগুপ্তকে?’

বজত বিস্মিত হইয়া কহিল—‘কি শুনিযে এলি বে?’

‘বল্লুম, মশায়, আপনাদেব কংগ্রেসেব সঙ্গে আমাদের মোটেই বনিবনা নেই। কিন্তু যখন যুদ্ধটা আবস্ত কবে দিযেচেন, তখন ঝগড়াটা আব কবব না, নামটা লিখে নিন্। আগে স্ববাজটা হোক, তখন কংগ্রেসেব রাইট্ উইং-এব সঙ্গে, মশায়, আমাদের বিবাদটা একদিন বাধবেই, বলে রাখলুম।’ বলিয়া আব বাক্যব্যয় না করিয়া সমব নিজের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

চত্ববেব মিটিঙে আব বাগ্মিতা অবশিষ্ট রহিল না।

## পাঁচ

সন্ধ্যাব পবই হস্টেলে সংবাদ পাওয়া গেল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অগ্ন্যগ্নেব সঙ্গে সমব ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। পবদিন প্রভাতেব খববেব কাগজে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আইন-অমাত্যকাবীদেব সভা ও পুলিশেব লাঠি-চার্জেব সমগ্র বিবরণ বাহিব হইল।

আইন-অমাত্য আন্দোলনেব তীব্রতা ও পুলিশেব দমনকাৰ্য্য তাল ফেলিয়া বদ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই ঘোর উত্তেজনাব মধ্যেও কংগ্রেসেব প্রায় সকল স্বেচ্ছাসেবকই অহিংস বহিল। মহাত্মা গান্ধী মানবাত্ম্যাব নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনেব যে আদর্শ প্রচাব কবিয়াছেন, তাহা হইতে এই বিবাত এবং সংগ্রামে অনভ্যন্ত স্বেচ্ছাসৈনিকেবা ভ্রষ্ট হইল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে তাবা সৰ্ব্বপ্রকাৰে উতাক্ত কবিয়া তুলিল, আইন যত ভাবে ভাঙা যায়, যত ভাবে কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা এবং অবহেলা প্রদর্শন কবা চলে, যত প্রকার বাজদ্রোহিতামূলক ধ্বনি কবা সম্ভব, তাহাব অন্তশীলন চলিতে লাগিল। টিটকাবি, বিদ্রূপ এবং কাবণে-অকাবণে পুলিশকে হয়বাণেব একশেষ হইতে হইল। কোথাও কোথাও টিলটা আশটা আসিয়া পড়িল, পুলিশেব কর্তৃপক্ষ বাগিয়া আগুন হইল। স্বেতাঙ্গ পুলিশ-সার্জেণ্টেবা বাগেব মাথায় এমন সব বাজ কবিয়া বেড়াইল যাহা মোটেই আইনসম্মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া একদিন ইহাঙ্গ কয়জন ছেলেকে পিটাইয়া গেল। এই ব্যাপাবে ছাত্রমহলে বিক্ষোভেব আব অবধি বহিল না।

দেশেব বাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা একটা দুষ্ট-চক্রেব গতিতে আবস্থিত হইতে লাগিল। আইন-অমাত্য আন্দোলন যতই তীব্র হইতে লাগিল, পুলিশেব চণ্ডনীতিও তত কঠোব এবং ব্যাপক হইয়া উঠিল, এবং যেহেতু এই

আন্দোলনেব অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যেব সঙ্গে দেশেব অধিকাংশেরই সহানুভূতি ছিল, সেইজন্য পুলিশেব দমন-কাষ্য নিত্যনূতন বিক্ষোভেব সৃষ্টি কবিল।

অধিকাংশ ছাত্রেব মতন, কংগ্রেসেব উদ্দেশ্যেব প্রতি বজতও গভীর শ্রদ্ধাশ্রিত। কিন্তু কি যে সে কবিত্তে পালে, সে সম্বন্ধে বোনও বিচারেই সে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। এমন সময় সমবেব গ্রেপ্তাবেব সংবাদ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত কবিয়া সজাগ কবিয়া তুলিল। সমবেব নিত্যনৈমিত্তিক বাচালতা দেখিযা কাব সাধ্য বলিতে পারিত, এমন অনাড়ম্ববে, এমন সহজ অবহেলায় সঙ্গে সে কংগ্রেসেব কাণ্য্য কাঁপ দিয়া পড়িবে, হাসিয়া কাণাববণ কবিয়া লইবে। কি অদ্ভুত মনেব জোব এই তর্কবাগীশ অভিনয়প্রিয় যুবকটিব। বজতেব কেবলই মনে পড়িতে লাগিল সমবেব সেই কথাটা—‘আচ্ছা কবে শুনিযে এলাম জে, এম, সেনগুপ্তকে।’ সমবেব জ্ঞাত একটা স্বগভীর শ্রদ্ধায় বজতেব বুক ভবিয়া উঠিল। তাব বাচালতা, তাব আহাব-লোলুপতা, তাব ছ্যাবলামি চন্দ্রবেশ মাত্র। চন্দ্রবেশ খসাইয়া সমব এইবাব নিজেকে প্রকাশ করিযাছে।

ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য কবিত্তে না পারিযা দেশেব অন্যান্য অধিকাংশ লোকেব মত বজত বিদেশী প্রিন্স বর্জ্জন কবিল, নাম-গোপন কবিয়া কংগ্রেসেব ভাণ্ডাবে পাঠাইয়া দিল অর্থ। তবু কিন্তু বজতেব অস্বস্তি দূর হইল না। কেমন একটা নামগোত্রহীন লজ্জা, কেমন একটা অপবাব-বোধ, এক অজানা ভীকৃতাব জ্ঞাত কেমন একটা সঙ্কোচ, কি জানি একটা বিবেকেব দংশন তাব চৈতন্তেব মধ্যে বাবস্থাব আঘাত কবিয়া বেড়াইতে লাগিল, বজতেব মনেব শাস্তি লোপ পাইবাব উপক্রম হইল। নিজেকে রজত কত বুঝাইল, নিজেব নিবাপদ এবং সুখকব অবস্থাব কথা নিজেকে জানাইয়া স্বার্থপরতাটাকে জাগ্রত কবিত্তে চাহিল, তবু একটা আত্মমানি, অসহায় অপমানের একটা বিষাক্ত ছাঁল কেবলই তাকে খোঁচা মাবিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সন্ধ্যাব কিছু আগে পূর্ণানন্দ চুপে চুপে আসিয়া কহিল—‘বজ্রত, তোমাকে একবার যেতেই হবে।’

বজ্রত একটু চুপ থাকিয়া কহিল, ‘আমি এব যোগ্য নই, পূর্ণানন্দ, আমি হতাশ কবব।’

‘একবার তোমাকে যেতেই হবে।’ পূর্ণানন্দ আবেগেব সঙ্গ কহিল।  
‘আমি তাঁদের বলে এসেছি, তাঁরা আশা কবে বসে আছেন।’

‘আমি স্বয়ং গিয়া তাঁদের হতাশ কবে এলে মেটা কি নিছ বেশি মধুব হবে?’

‘তাঁরা ব্যর্থকাম হন কি সফল হন, সে ভাব আমাব নয়, বজ্রত।  
আমাব উপব আদেশ তোমাকে একবার নিয়ে যাওয়াব।’

‘তোদের পন্থা আমি অন্তমোদন কবি না।’

‘তা আমি শুনছি। ওঁদেরও জানিয়েছি।’

‘তবু তাঁরা একবার চেষ্টা কবে দেখতে চান, এই তো?’

‘হ্যাঁ, এই।’

‘যদি আমি বাজি না হই?’

‘না হলে।’

‘যদি পুলিশকে এসে সব জানিয়ে দিই।’

‘সে লোক তুমি নও।’

কুমারটুলি পাব হইয়া বাগবাজারেব কাছাকাছি পূর্ণানন্দ বজ্রতকে লইয়া ট্রাম হইতে নামিল এবং এ-গলি হইতে গ-গলি, এবং তাবপব অন্য গলিব একটা অগু গোলকধাঁধাব মধ্য দিয়া বজ্রতকে টাটাইয়া লইয়া চলিল। কোথা দিয়া, কোনখানে এবং কোন দিকে যাইতেছে, এতদিন কলিকাতায় বাস কবিবাব পবও বজ্রত তাহা ঠাহব কবিয়া উঠিতে পাবিল না; পূর্ণানন্দেব নির্দেশমত দুই দিকেব দুই সাবি কোঠাবাডীব মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ গলির পথে, গ্যাসেব স্তিমিত আলোয় পথ দেখিয়া কেবলই চলিতে

লাগিল। ক্রমে স্রবকির কল, চূণের আড়ত, গরুব গাড়ী মেরামতেব কারখানা—এই সব রজত লক্ষ্য করিল। এই রহস্যজনক অঞ্চলের কোন্‌ গভীর এবং দুর্গম প্রদেশে তাহাদের যাত্রা শেষ হইবে, বজ্রত ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যটা মনে করিয়া বজ্রত কোন প্রশ্নই করিল না।

অবশেষে পূর্ণানন্দ একটা অতি-জীর্ণ আধ-ভাঙা দালানেব সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সমুখের কীটদষ্ট ভগ্নপ্রায় কাঠের দরজাটায় আঙুল দিয়া তিনবাব টোকা দিল। এই ভগ্ন স্তূপে যে মানুষ বাস কবিতে পাবে, পূর্ণানন্দেব উদ্দেশ্যটা না জানিলে বজ্রত তাহা বিশ্বাস কবিতে পাবিত না। একটা অতি পুৰাতন অব্যবহাৰ্য্য দালানকে ভাঙিতে আবস্ত কবিয়া যখন কাজ অৰ্দ্ধ-সমাপ্ত হয়, চূণে, ধূলায়, ভাঙা আস্তব-খসা ইঁটে যখন একটা পাহাড়-স্তূপেব সৃষ্টি হয়, এ বাড়িব অবস্থা সেইরূপ।

পূর্ণানন্দ দরজায় আবাব টোকা মাঝিল। কিন্তু বহুক্ষণ যাবৎ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আবও কয়েক মিনিটকাল অপেক্ষা করিয়া পূর্ণানন্দ যখন পুনৰায় সঙ্কেত কবিবাব উত্তোগ করিতেছিল, তখন ভিতব হইতে অতি ক্ষীণ একটা সাড়া পাওয়া গেল—যেন ই ট এবং স্রবকিব স্তূপেব মধ্য দিয়া কে একজন অতি বৃষ্টি অগ্রসর হইতেছে। শুনিয়া পূর্ণানন্দ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর সামান্য কাল চূপ কবিয়া থাকিয়া ভিতবেব সেই বহুশ্রম শব্দেব উদ্দেশ্যে কহিল—‘আত্মানং বিদ্ধি।’

ক্র্যাচ্। ক্র্যাং। জীর্ণ কাঠ এবং শিথিল কব্জার বিকৃত একটা শব্দ হইল, দরজা খুলিয়া গেল। ইঙ্গিতে বজ্রতকে সামান্য অপেক্ষা কবিতে বলিয়া পূর্ণানন্দ ভিতরে প্রবেশ কবিল এবং একটু পরেই বাহিব হইয়া আসিয়া কহিল—‘এসো, বজ্রত।’ দরজা পুনরায় বন্ধ হইল, এবং ইলেকট্রিক টর্চে পূর্ণানন্দ আলো জ্বালাইলে রজত শিহবিয়া উঠিয়া দেখিল—চতুর্দিকে কেবল স্রবকি, কেবল ভাঙা শ্রাওলাধবা ইঁটের স্তূপ ও চূণ। স্থানটাকে একটা কবের অভ্যস্তর বলিয়া বজ্রতেব মনে হইতে লাগিল। হাসিয়া



পূর্ণানন্দ কহিল—‘হেড্ কোয়ার্টার্স’ কিনা । • একটু সাবধান হতে হয়, ভাই ।’

‘তা তো দেখতেই পাচ্ছি ।’ বজ্রত কহিল । ‘একেবারে গোডেব তলায় এসে ডেবা বেঁধেচিস্ । আমি ভাবতেও পাবিনি, এব ভেতর প্রবেশ কবা যাবে—ও কি, এই সিঁড়ি নিচের দিকে কোথায় যাচ্ছে ?’

‘মাটির নিচে ঘব আছে ।’

‘নিচে ।’ সবিস্ময়ে বজ্রত কহিল ।

‘ওপবে থাকতে না দিলেই’, পূর্ণানন্দ বহুশ্রাব স্বব লাগাইয়া কহিল, ‘নিচে আসতে হয় ।—একটু সাবধান, এবাব দুটো সিঁড়ি ভাঙা । মাটির কিনা, সহজেই ধসে যায়—’

বাত দশটার সময় বজ্রত একা ফিবিয়া আসিল । মনটা অত্যন্ত খাবাপ হইয়া গিয়াছে । লাভ কিছু হইল না, অনর্থক বাদান্তবাদ হইল, ফলহান উচ্ছ্বাসেব সৃষ্টি এবং কয়েকজনকে ভগ্নমনোবথ কবিয়া আসা ছাড়া আব কিছুই হইল না । পূর্ণানন্দেব উপবও সে বিবক্ত হইল ; সে তো বজ্রতের সমস্ত মতামত জানিতই, তবে কেন তাহাব দলেব কাছে এমন কবিয়া লইয়া গেল ? এতে কাব কি লাভ হইল ? দেশেব দ্রুত স্বাধীনতা লাভ হউক, ইহা বজ্রত খুবই চায়, কিন্তু পূর্ণানন্দেব সমিতিব পন্থায় নয়, কংগ্রেসেব পন্থায়ই সে আস্থাবান । স্পষ্ট কবিয়াই বজ্রত নিজেব মত-স্বাতন্ত্র্য বক্ষা কবিয়াছে, বহুশ্রাব প্রবোচনায় নিজেব মত এবং স্বধর্ম বিসর্জন দেয় নাই । পূর্ণানন্দেব দল হয়তো খুবই আশা কবিয়াছিল যুক্তি-প্রয়োগে তাকে স্বদলভুক্ত কবিতে পাবিবে, হতাশ হইয়া কেহ কেহ যে বিবক্ত হইয়াছে বজ্রত ইহাও লক্ষ্য করিয়াছে । তর্কটা দুএকবার কটু হইয়া উঠিয়াছিল । কিন্তু এই অপ্রীতিকবতাব কোনও প্রয়োজনই ছিল না, পূর্ণানন্দেব উচিত ছিল এ সম্বন্ধে ওদেব আগেই স্পষ্ট কবিয়া জানান ।

রক্ত ববঞ্চ কংগ্রেসের স্বৈচ্ছাসৈনিক হইতে পাবে, পুলিশ-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারে, কিন্তু ইহা সে পাবিবে না। ইহাতে যেন যুদ্ধেব গৌরবই বোধ করা যায় না। তাছাড়া দুইটা পটকা ছুটাইয়া কি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য জয় কবা সম্ভব? অবশ্যস্বাবী ব্যর্থতাব পথে ছুটিয়া লাভ কি?

মির্জাপুরেব মোড়ে নামিয়াও কিন্তু বজত হস্টেলে গেল না। মাথাটা অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলেজ স্কোয়ারেব ভিতর ঢুকিয়া নিম্নজ ন কোণায় একটা বেঞ্চ দেখিয়া সে বসিয়া পড়িল।

জাত হিসাবে ইংবে'জব উপর বজতেব কোনও আক্রোশ নাই। ইংবেজ জাতকে ববঞ্চ সে শ্রদ্ধা কবে। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, বাজ-নীতিতে কী অপূর্ণ দান এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাতিব। যে-জাতি আধুনিক ইতিহাসেব সর্বপ্রথম ডেমোক্রেসিব অগ্রদূত, হাউন্স অব্ কমন্স যে-জাতি সৃষ্টি কবিয়াছে, গণ-স্বাধীনতা'ব জন্ম যে-জাতি বাক্যাব মুণ্ড কাটিতে পাবে, সে জাতিব মাহাত্ম্যেব তুলনা নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবেব কী বিস্ময়কর বেকর্ড এই ইংবেজ জাতিব। প্রথম স্টিম্ এঞ্জিন, প্রথম স্টিমাব, প্রথম বাষ্পেব তাঁত উদ্ভাবিত হইয়াছিল এই ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডেব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-রিভোলিউশান্ সমস্ত জগতকে সভ্যতা'ব পথ-প্রদর্শন কবিয়াছে। আইনেব চোখে প্রত্যেকে সমান—যাকে ওবা ব'ল 'কল্ অব্ ল'—এই ইংবেজেব সৃষ্টি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বহুতা'ব স্বাধীনতা, সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা, রাজনৈতিক চিন্তার অপূর্ণ প্রসা'ব, এই ইংবেজ জাতিব গৌরবজনক পবিচয়। এই ইংবেজ জাতই কি লর্ড ক্লাইভকে দিষ্কার দেয় নাই? এই ইংবেজ জাতই কি ভারতবর্ষে অনাচার'ব অপরাধে ওয়ারেন হেস্টিংসকে 'ইম্পিচ' কবে নাই? কিন্তু—বজত দীর্ঘনিশ্বাসেব সঙ্গে শ্ববণ কবিল—সাম্রাজ্যলিপ্সার দরুণ ইংবেজ তার সংস্কৃতি এবং স্বধর্মবিরোধী কম কীর্ত্তিও কবে নাই। জগৎ-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে'র বহু আচরণ এমন বিসদৃশ হইয়াছে যে, প্রকৃত ইংলণ্ডে'র আত্মাকে তাহা ব্যথা দিয়াছে, অপমান করিয়াছে।

লোভ, স্বার্থপরতা—এবা বড় বিক্রী জিনিষ—রক্তত নিজ মনে বলিতে লাগিল। আত্মা দাবিও সঙ্গে দেহেব দাবিও এই দ্বন্দ্ব চিবকালেব। মামুস যেমন বহুস্থানে, বহুক্ষেত্রে বহুবাং দেহেব এবং স্বার্থেব তাড়নায় আত্মাকে নিপীড়িত কবে, তেমনি একটা সমগ্র জাতিব স্বার্থপরতাও তাব আত্মাকে আচ্ছন্ন কবিতো পাবে।

এই জগাই তো বজ্রত মহাশ্মা গান্ধীব সত্যগ্রহকে এত শ্রদ্ধা কবে। গান্ধীজি বলেন—ওবে, ইংবেজেব গায়ে হাত তুলিস না, শুধু নির্ভীক ভাবে নিজ দাবি জানা, ভয় না পেয়ে, বাগ না কবে, দেব কাছে গিয়ে বল—‘আমাদেব যা, তা আমাদেব দাও। তোমবা তা অনায় ভাবে অধিকার কবে থাকবে কেন?’ গান্ধীজি বলেন—ওবা চটে উঠবে, স্বার্থে আঘাত পেয়ে ওবা বেগে যাবে, হেড়ে এসে মাববে তোদেব। তোবা কিন্তু মেবে জবাব দিস না। ওবা যদি মাবে তো মারুক না, দেখবি ওবা নিজেবাই একদিন চম্কে জেগে উঠবে, লজ্জায় আব নিজেদের কাছেই মুখ দেখাতে পাবে না।—প্রকৃত ইংলণ্ড কি কারুব পবাধীনতা সহিতে পারে? এ ইংলণ্ডের স্বধর্ম নয়।—আমাব প্রিয় শেচ্ছাসেবকেবা, লক্ষ্য হানো ইংবেজেব মনেব ওপব, তাব দেহেব ওপব নয়।

‘কে, বজ্রত না?’

বজ্রত চম্কাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, মনোবঞ্জন। মনোরঞ্জন অগ্রসব হইয়া আসিল। কহিল—‘এতো বাস্তবের এখানে? করছ কি?’

‘মাথাটাতে হাওয়া লাগাচ্ছি।’ বজ্রত কহিল।

‘বেশ, বেশ। বাতেব খাওয়াব পব বোজ আমাকে হাঁটতে হয়। ডিসপেন্সিয়ার দাত কি না, তাই ব্যবস্থা হচ্ছে, কি বলে তোমাব, আফ্টাব ডিনাব ওয়াক্ এ মাইল।’—সন্ধ্যাবেলা দেখলুম, পূর্ণানন্দ দাসের সঙ্গে কোথায় যাচ্চ। তা কখন কিবল?’ বলিয়া মনোবঞ্জন আসনের অপরাধে বসিয়া পড়িল।

রজত বিম্বিত হইয়া কহিল, ‘তুমি কি কবে’ দেখলে?’

মনোরঞ্জন কহিল, ‘আমি হারিসন্ বোডের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম, দুই বন্ধুতে হাইকোর্টের ট্রামে চেপে বসলে। বেশ ছেলে পূর্ণানন্দ।’ বলিয়া সহসা কণ্ঠস্বর অত্যন্ত হ্রস্ব কবিয়া মুখটা বজ্রতের কানের কাছে আনিয়া কহিল—‘ওদের সমিতিতে ভজাবাব চেষ্টা কবচে না তো? সত্যি বটে, উদ্দেশ্য আমাদের একই, তবু ওদের সম্বন্ধে খুব ভাল সার্টিফিকেট আমি তোমাকে দিতে পাবব না।—কেবল চেপে-যাওয়া, কেবল কংগ্রেসের পায়ে-পায়ে চলা ওদের বদদোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আগুন নিয়ে যদি খেলবি, তবে এত ভীকর মত চলা কেন বে—’

‘ওসব থাক্, মনোবঞ্জন। আমার মাথাটা একেই খুব গরম হয়ে আছে, আজ আব তর্ক সইতে পাবব না—’

‘থাকবে কি হে, চৌধুরি।’ তোমার উপর আমাদের সমিতির ক্লেইমই যে বেশি। অনেকদিন আগে থাকতেই কি আমি তোমাকে বলে বাখিনি? আচ্ছা, বল, তুমিই বল, স্বাধীনতা কি একটা কম বড় যজ্ঞ? কত তরুণের বক্তে—আচ্ছা, যাক্, আজ আব ওসব কথা ওঠাব না ...’

‘উঠিও না। কিন্তু আমি উঠলুম।—এখনও থাইনি।’ বলিয়া বজ্রত দাঁড়াইয়া পড়িল।

মনোবঞ্জনও দাঁড়াইয়া পড়িল। কহিল—‘ওদেরই ওখানে নিয়ে গিয়েছিল তো? আমাদের সমিতিকে খুব গাল দিলে, না?—কিন্তু যখন আত্মত্যাগের সময় আসবে, বুকের রক্ত কাবা বেশি দেয়, তা তুমি দেখো। চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। কি বললে টল্লে ওরা?—’

রজত নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। যাহাকে সে চিরদিন বাতুল বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা সে তাহার উপর সন্দিহান হইয়া উঠিল। মনোবঞ্জন কে? ওর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি? কি সংবাদ, ও

কেন, সে বজ্রতেব কাছ হইতে বাহির কবিয়া লইতে চায় ? রজত শিহবিয়া উঠিল ।

সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিতে উঠিতে রজত শুনিল, পূর্ণানন্দ বাঁশি বাজাইতেছে । ইতিমধ্যেই কখন সে ফিবিয়া আসিয়াছে । নিজ ঘবেব দিকে একান্ত ক্লান্তভাবে অগ্রসব হইতে হইতে বজ্রত ভাবিতে লাগিল—এতটা আশুন অন্তবে পুষ্টিয়া পূর্ণানন্দ এমন স্মিষ্ট বাঁশি বাজায় কি প্রকারে ? বাঁশিব স্ববে যে-স্বপ্ন, যে-আশাকে সে রূপ দেয়, তাব জ্ঞা হাতে সে বজ্র ধবে কেন ? রজত বাবস্থাব নিজ মনে বলিতে লাগিল—না, না, এ পূর্ণানন্দের পথ নয়—অসহিষ্ণুতায় কোনও লাভ হয় না—ওতে শুধু ক্ষতি হয়—

## ছয়

পবদিন বেলা দশটায় পুলিশেব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আসিয়া হানা দিল । পূর্ণানন্দের ঘব তন্নতন্ন কবিয়া থানাতল্লাসী হইল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল ন । তা সত্ত্বেও পুলিশ যাইবাব সময় তাকে সঙ্গে কবিয়া লইয়া গেল । পূর্ণানন্দ আব হস্টেলে ফিবিয়া আসিল না ।

মনোবজ্রন দত্তবায় সম্বন্ধে যে-সন্দেহটা বজ্রতেব মনে কাল বাহি হইতে চাপিয়া বসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আব কোনও সংশয় রহিল না । ব্যাখ্যায়, বিবক্তিতে এবং অস্বাচ্ছন্দ্যে বজ্রতেব মন পূর্ণ হইয়া গেল ।

ইহাব পব হইতে বজ্রতের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগ না দিয়া তাব পক্ষে আব উপায় নাই, সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই যে বিক্ষোভ চলিয়াছে, ইহাব মধ্যে সে-ই কি কেবল স্ববিব হইয়া বসিয়া থাকিবে ? সৰ্ব্বক্ষণ নিজেকে তাব অপবাদী মত

মনে হইতে লাগিল—কেমন যেন ভীক বলিয়া বোধ হইল। পূর্ণানন্দদেব সমিতিব প্রেসিডেন্টেব মুখেব উপব সে জোব গলায় বলিয়া আসিয়াছিল—  
‘এ আমাব ভীকতা নহ। আমি যে-আদর্শকে বিশ্বাস কবি, শুধু তাব জগুই যুদ্ধ কবতে পাবি, আত্মোৎসর্গ কবতে পাবি—মিথ্যে আমাকে উত্তেজিত কববাব চেষ্টা কবচেন।’ কিন্তু কোন্ দিকে কতটুকু আত্মত্যাগ সে দেখাইয়াছে? আদর্শ কি তাব কিছু আছে? দেশবাপী এই মন্থনেব মধ্যে সে উদাসীন দর্শক চাড়া আব কি? তাব যৌবনার আবামপ্রিয় খাঁচাব পাখি?—দুর্গম পথে চলিতে সে কি ভয় পাব?

কী সাধকতা স্বপ্ন থাকিবাব? ঐশ্বর্য্যে-বিলাসে, সঙ্গীতে-বাসনে জীবনটো কাটাইয়া দেওবাব অসহ্য গতাত্তরগতিকতায় তাব মন কি তৃপ্ত হইতে পাবিবে? কি যেন তাব মন এবাস্ত ভাব চাহিতেছে, কি একটা দুঃস্বাদ ক্ষুধা তার অন্তবেব দুর্গম প্রান্তে বাসবাব নাড়া দিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাগকে পবিপূর্ণভাবে জানিতে না পাবাব অস্বস্তিতে সে শাস্ত পাইতেছে না। এ কিসেব অভাব-বোধ? প্রেম? মৃত্যু? আত্মোৎসর্গ? সংহাবোন্মাদনা? বজ্রতেব মনে একটু শাস্তিও অবশিষ্ট বহিল না।

আন্ততোষ বিল্ডিংসেব প্রবেশ-মুখে দোতলাব প্যাসেজ মনোবজ্ঞানেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মনোবজ্ঞান মুখে গভীর দুঃখ এবং সমবেদনা মাথিয়া জিহ্বাতে খেদোজিস্মূচক শব্দ কবিতে কবিতে নিকটবর্তী হইল। কহিল,  
‘দেখলে কাণ্ডটা? শেষে এমন কবে’ ধবা পড়ে গেলি! নিজেব দোষে নিজেকে নষ্ট কবলে বৈ তো নয়। আশুন নিষে খেলছিস, একটু ঢেকে ঢুকে খেলতে হয়—না তো সব তাতেই গোয়ার্ত্ত্ব মি! ওদেব সমিতিব দোষই ঐ!’—বলিয়া কণ্ঠস্বব অসম্ভব প্রকাব নিচু কবিয়া কহিল—‘এক মিনিটের পরিচয়ে যাব তাব কাছে সব গোপন কথা ফাঁস কবে দেবে—

হয়তো পিস্তলই একটা বাগতে দিলে। বল তো, এ কি বিবেচনার কাজ ! তোমাকেও একটা গছিয়ে দিতে চাইলে না ?’

বজ্রতের ইচ্ছা হইতেছিল একটা ঘুষিতে মনোবজ্রনের বাঁকা নাকটাকে মুখেব সঙ্গে সমতল কবিয়া দেয়, চেষ্টা কবিয়া নিজেসে নিবৃত্ত কবিল। কহিল, ‘মনোবজ্রন, বিষ্ণুতে যদি তুমি আমাব কাছে কখনো আস, তোমাব সঙ্গে আমি যে-ব্যবহাৰটা করবো, সেটা কোন মতেই অহিংস অসহযোগ হবে না। সেই কারণে আমাব কাছ থেকে দূবে থাকা তোমাব পক্ষে দূব-দর্শিতা হবে। কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করো।’

‘এব মানে কি ?’ মনোবজ্রন বিস্ময়েব স্ববে কহিল।

‘মানে তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু তোমাব সঙ্গে কথা কইতে আমি ঘৃণা বোধ কর।’

‘না না, বজ্রত, তুমি কোনও ভ্রম-ধারণাব বশবর্তী হয়ে বন্ধুব উপব অবিচাব করছ। আমি বলছিলাম যে, ঈশদেব সমিতির উচিত নয় নতুন যে কোনও ‘বন্ধুটিকে একটা পিস্তল গছিয়ে দেওয়া। প্রথমে তাকে বেশ করবে—’

‘মনোবজ্রন।’

‘বল।’

‘স্পাই কাকে বলে জান ?’

‘স্পাই। সে কি ? এই প্রশ্নে তাব কথা ওঠে কি হবে ? স্পাই !’ এক নিমেষে মনোবজ্রনের মুখ ও চোখেব চেহাৰা বদলাইয়া গেল। তাত্-লাইয়া কহিল—‘স্পাই ! হ্যা, তা জানি বৈকি। আমাদের সব সময়ে সাবধান থাকতে হয়, যাতে—’

‘প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না পায়।’ তীব্র ব্যঙ্গের স্ববে বজ্রত কহিল। ‘স্পাইয়ের ব্যবসায়িক লোকে ঘৃণা মনে করে। তবু সে ব্যবসারও কিছু সাফাই আছে। কিন্তু স্পাইয়েব চেয়ে শতগুণ জঘন্য যার কাজ, মানুষের

এবং ভগবানের কাছে যাব একটু মাত্রও কৈফিয়ৎ নেই, যে মানুষনামধারী নীতিজ্ঞানহীন একটা বগ্ন পশুমাত্র, তাকে কি বলে জ্ঞান ?’

‘কি ?’ মনোবঞ্জন যন্ত্রচালিতেব মত কহিল।

‘এজেন্ট প্রভোকেটব।’

বজ্রত উত্তেজিতভাবে আসিয়া আশুতোষ বিল্ডিংস্-এব ব্যাল্কনিতে দাঁড়াইল। কলেজ স্ট্রীট দিয়া মেয়েদের এক প্রোসেসসান্ কংগ্রেস-পতাকা উড়াইয়া, ‘বন্দে মাতবম্’ ধ্বনি কবিয়া উত্তর দিকে অগ্রসব হইতেছে। আশেপাশে চতুর্দিকে পুলিশ, কিন্তু এই মেয়ে-বাহিনীর তাতে একটু ভ্রক্ষেপমাত্র নাই। যেন তাবা যুদ্ধযাত্রা কবিয়াছে, গোলাগুলিব ভয়ে বিচলিত হইবাব নয়।

রজ্রত দেখিল, দশ বাবো বংসরের মেয়ে হইতে কুড়ি বাইশ ও ততো-ধিক বয়সেব কত তরুণী খন্দবেব শাড়িব আঁচল কোমবে জড়াইয়া, মাথা উঁচু কবিয়া অকুতোভয়ে অগ্রসব হইয়াছে। বর্ণে তাহাদেব স্বাজাতি কতাব সঙ্গীত, হাতে ত্রি-বর্ণ বঞ্জিত পতাকা।

সহসা একটা লজ্জাব তবঙ্গ বজ্রতব প্রতি শিবায এবং প্রতি বন্ধু-বিন্দুতে ছুটিয়া গেল, মজ্জাব মধ্যে পধ্যন্ত তাহা প্রবাহিত হইয়া চলিল। ছি, ছি, বজ্রত না পুরুষ। সে না শক্তিমান বলিয়া গর্ষ বোধ কবে। অথচ এই মেয়েবা আজ তাহাকে স্পষ্টই বাঙ্গ কবিয়া আগাইয়া গেল, দিক্কাব দিয়া গেল। ওবা দুর্বল, ওবা কোমল, ওবাও আজ মাতিয়া উঠিয়াছে, ওরাও আত্মত্যাগেব জগ্ন অগ্রসব হইয়াছে, আব পুরুষ হইয়া বজ্রতই শুধু দাঁড়াইয়া বহিবে। এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া সে শুধু ঢেউ গণিতেছে। এই কি তাব পুরুষ। এই কি তাব আদর্শবাদ। এই কি জীবনে পদ্মাব আশীর্বাদেব পরিণতি।

সহসা রজ্রতেব চোখেব সমুখের রাস্তা, জনতা, অট্টালিকাশ্রেণী সমস্তই



বিলুপ্ত হইয়া গেল, মাছুষ এবং যানবাহনের শব্দকোলাহল শ্রবণ হইতে বিদূষিত হইল। দেখিল, চতুর্দিকে জল, শুধু জল। জলেব ফণা বিস্তার কবিয়া, ফেনিল আবর্ত রচিয়া, বুদ্ধদ উডাইয়া, হিংস্র তবঙ্গভঞ্জে পদ্মা আসিয়া শ্রামল মাটিতে ভীম পবাক্রমে আঘাত কবিতোছে। দিগন্তব্যাপী চিংকাব কবিয়া কহিতেছে—ভাঙ্। ভাঙ্। ভাঙ্। পদ্মাব জলোচ্ছাসেব সঙ্কে সঙ্কে বজ্রত খবখব কবিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নিচ হইতে বহুজনেব মিলিত চিংকাবে বজ্রত চমকিয়া সশ্বিং পাইল। দেখিল, এক যুবকবাহিনী কংগ্রেসেব পতাকা লইয়া স্ফুটত নির্ঘোষে নগবীকে আহ্বান কবিতো কবিতো অগ্রসব হইতেছে। ‘জয়, ভাবত-মাতাব জয়। বন্দে মাতবম্।’

তাহাদেব কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বজ্রতও চিংকাব কবিয়া উঠিল—‘জয়, ভাবত-মাতাব জয়। বন্দে মাতবম্।’ এবং উন্মত্তেব মত ছুটিতে ছুটিতে কবিভব্ এবং সিঁড়িব সাবি অতিক্রম কবিয়া স্বেচ্ছাসেবকদেব দলে যাইয়া মিশিল।

ইতিমধ্যেই বিরাট জনতায় দেশবন্ধু পাকেব বিস্তৃত মাঠ অর্ধেক ভবিয়া গিয়াছে। দলে দলে নতুন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও নতুন জনমণ্ডলী আসিয়া সমুদ্রে নদী-স্রোতের মতন মিলাইতেই লাগিল। সভা-সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু আইন-ভাঙাই যাদেব উদ্দেশ্য, তাবা এই নিষেধ মানিবে কেন। দেখিতে দেখিতে শ্রামল প্রাস্তব জনসমুদ্রে রূপান্তবিত হইল। কোলাহল, উত্তেজনা ও উন্মাদনাব অবধি নাই, অথচ প্রতিক্ষণে ইহাদেব প্রকোপ বদ্ধিত হইতেছে।

রজতদেব বাহিনী যখন এই ভিড়ের মধ্যে আসিয়া মিলাইল, তখন সভার কার্যাবস্বেব উপক্রম হইয়াছে। এই অগণিত জনমণ্ডলীব প্রাস্তভাগে

দাঁড়াইয়া বজ্রত সভার প্রায় কিছুই দেখিতে পাইল না। কে বক্তা, কি বক্তৃতা, কি ব্যবস্থা, সবই তার দৃষ্টির অগোচরে রহিল। রজতের কাছে তাহাদেব কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। দশেব ভাগেব সঙ্গে নিজ ভাগ্য সে গ্রথিত কবিয়াছে, দেশের স্বাধীনতাব জন্ত আত্মত্যাগ কবিত্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভীকৃতাব বেদীতে আদর্শবাদকে সে বিসর্জন দেয় নাই—এই অমুভূতিগুলিই তাব পক্ষে যথেষ্ট। কোনও অন্তশোচনা, কোনও মানসিক অশান্তি, কোনও অক্ষমতাবোধ, কোনও প্রকাশহীন লঙ্কার অশ্রান্ত পীড়ন আব অবশিষ্ট নাই। সে যেন মুক্তি পাইয়াছে, নিজের কাছে আব নিজেকে অপবাদী মনে হইতেছে না। এক গভীর স্বস্তিতে বজ্রতের দেহ-মন হাল্কা এবং তাজা হইয়া উঠিল।

এমন সময় বজ্রতের কর্ণে যন্ত্র-বন্ধিত এক উচ্চ নির্ঘোষ প্রবেশ কবিল। কিন্তু পবক্ষণেই চঠাৎ তাহা থামিয়া গেল। এক মিনিটকাল কোনও সাড়াশব্দই শোনা গেল না, এই অসংখ্য জনমণ্ডলী একেবাবে মুক বহিল,—যেন কি একটা ব্যাপাব যবনিকাব অন্তবালে সংঘটিত হইতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্তু তাহাব তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অতিশয় গভীর। বজ্রত ব্যাপাবটায় মনোযোগ দিবাব পূর্বেই এষ্ট বিবটি জনতায় সহস্র বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। একটা ঠেলাঠেল, একটা অস্বাভাবিক আলোড়নেব সৃষ্টি হইল, এবং অতল্লকালেব মধ্যে শ্রোতাণা শৃঙ্খলাহীন জনতায় পবিবর্তিত হইয়া চিহ্নিবিহ্নি মেঘেব মতন সমস্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিল। স্বেচ্ছাসবকদেব অভয়দান-বাণী শোনা গেল, শোনা গেল তাহাদেব স্বাদেশিকতাচ্যুত ধ্রুনি, কিন্তু এবই সঙ্গে উথিত হইল ভয়-বিকৃত কণ্ঠেব শব্দ, চোখে পড়িল পলায়নর জনতাব ভীত ত্রস্ত মুক্তি—সব কিছু এক মুহূর্তে লণ্ডণ্ড হইয়া গেল। প্রথমে বজ্রত ইহাব তাৎপর্যই হৃদয়ঙ্গম কবিত্তে পাবিল না—এমনই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তারপবই বুঝিল, পুলিশ সভা এবং জনতাকে বে-আইনী

ঘোষণা ক'বিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ কবিত্তে আবদ্ধ ক'বিয়া'ছ। ভীত অসহায় জনতা পালাইবার জ্ঞান বাগ, অথচ জনতাই জনতাকে বাধা দিত'ছে, হলস্থূল বাড়িয়া গেছে।

পুলিশ-বাহিনী জনতা বিতাড়ন কবিত্তে কবিত্তে অগ্রসর হইয়া আসিত'ছিল। কিন্তু বজ্র'তব সেদিকে ভ্রাম্যমাণ নাই, তাকাইয়া ত কাঁইয়া সে শুধুই দেখিতে লাগিল, কি অনম সাত'সে নিবন্ধ অহিংসা-পন্থী কৃশকায় কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকরা দ্বিধা হইয়া দাঁড়াইয়া আ'ছ।

বজ্রত স্বেচ্ছাসেবক নয়। মাথায় ওব গান্ধীটুপি নাই, হাত ওব ত্রিবর্ণ পশা'কা নাই—কংগ্রেস'ব তালিকাভুক্ত সদস্য বজ্র'ত নয়। কিন্তু নাই বা হইল। কংগ্রেস'ব আদর্শ'ব সঙ্গ বজ্র'ত'ব আদর্শ'ব তো কোনও পার্থক্য নাই। ভাব'ব'বর্ধন চিৎস্থান আত্মিক শক্তির দ্বারা দেশ'ব স্বাধীনতা অজ্ঞানে সে বিগম'সী। সে দেশ'গে ভাব'বাস, সে দেশ'ব স্বাধীনতা চান, দেশ'বাসী'ব ক্লাণ সে নিয়ত বামনা ক'বে। এই কথাটা'ই স্পষ্ট ক'বিয়ে, দীপ্তকণ্ঠ জানাই'বার জ্ঞান সে আসি'যা'ছ এট'গানে। স্বাধীনতা-আন্দোলন'ব সঙ্গে 'ব'ব প্রত্যক্ষ সংস্পৃ'ভূতি ডানাইতে না পারি'বা তা'ব আদর্শ'বানী মন অস্থির বেদনায় ছট'ট' ক'বি। য'বিত'ছিল— 'তাই সে আসি'যা'ছ নিজ'ব বাথ-স'জ্জি'ব। তাক'ব ঈদ্রিতে, পদ্মা'ব অজ্ঞানে। যাহা ম'হৎ, যাহা বৃ'হৎ, তাহাকে শ্রদ্ধা নিবদন কবিত্তে না পারি'বে বজ্র'ত শাস্তি পায় না। তাই স্বেচ্ছাসেবক'ব নির্ধার সঙ্গে স্বস্থানে দাঁড়াই'য়া দাঁড়াই'য়া সে কহিত্তে লাগিল—'ভ'বত-না'ত্র'ব জয়। বন্দে মাত'বম্।'

'হটো, হট য়াও।'—পিছন হইতে জু'কুমে'ব ব'গ্ধ ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। বজ্র'ত নড়িল না, তাকাই'য়া দেখিল না। মনে মনে

কহিল—স্বচ্ছাসেবকদেব যা ভাগ্য, আমারও তাই হোক। পালাইয়া গেলে আমার মন আমাকে ক্ষমা কবিলে না, আমার আত্মা আমাকে ক্ষমা কবিলে না, বাঁচা আমার পক্ষে আব সম্ভব হইবে না।—আমাকে এই-খানে আমার জীবনধারণের জন্তই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, একটুও নড়া আমার পক্ষে আত্মহত্যার সমান হইবে।

সহসা অনতিদূবে অশ্বখুবের শব্দ হইল। বজ্রত তাকাইয়া দেখিল, বেটন-কবধৃত এক পুলিশের সার্জেন্ট তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছে। মুখে তাব আইনের মধ্যাদা বক্ষা কবাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অস্ত্রবল অমোঘ। সৈদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বজ্রত মনে মনে কহিল—‘এসো, বন্ধু, এসো। আমার বাঁচবাব জন্ত যে তোমাকে দরকাব।’

এক, দুই, তিন। ঘোড়ার মুখটা শবীরের বাছ হইতে আব দূবে নাই। পিঠের উপর বজ্রত তাব ছায়াটাকেও যেন টেব পাইল। অশ্বের উত্তেজনাচঞ্চল নিঃশ্বাস ঘাড় স্পর্শ কবিল। এইবাব, এইবাব—

‘স্টপ্‌।’

‘লেট্‌ গো।’

‘ইউ কান্ট্‌, ইউ কান্ট্‌। অ্যাবেস্ট্‌ হিম্‌ ইফ্‌ ইউ উড্‌, বাট্‌ ইউ কান্ট্‌ স্টাইক্‌ হিম্‌—’

‘ওঃ, কাম্‌ অন্‌, মিস্‌—’

‘ইউ কান্ট্‌, ইউ কান্ট্‌। ল’ ডাসন্ট্‌ এলাউ ইউ ছাট্‌।’

চকিতে বজ্রত ফিবিয়া তাকাইল। দেখিল, অগ্নিশিখার মত একটি তরুণী বাঙালি মেয়ে ঘোড়ার মুখের লোহাব কড়াটা দক্ষিণ হস্তে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধবিয়া কহিতেছে—‘ইউ কান্ট্‌, ইউ কান্ট্‌।’ চক্ষে তার বিদ্যুৎলেখ, মুখে তার অগ্নির দীপ্তি, কণ্ঠে আদেশ। যেন মাটি ফুঁড়িয়া কম্পমান এক শবীরী অগ্নিশিখা সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, মর্ত্যেব

মাটিতে যেন অদৃশ্যলোক হইতে এক জ্যোতির্ময়ী মমতা উদ্ভিত হইয়াছে। কমলাবন্ডেব খন্দেব পাড়ি পরা, আঁচলটা দেশসেবিকাব ভঙ্গিতে কোমবে জড়ান, অবিগলিত কেশজ্ঞান বাতাসে বিক্ষিপ্ত, স্বগৌর মুখমণ্ডলে সূর্য্যালোক গভীর দীপ্তি লইয়া প্রতিকলিত হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে বজ্রত যে সমগ্রতাব দৃশ্য দেখিল, তাহা মানবী নয়, তেজোদীপ্তি।

নাবীব নিকট বাধা পাইয়াই হোক, বা নিজেব কাজের অগাধতা হৃদয়ঙ্গম কবিয়াই হোক, সার্জেট ঘোড়াব মুখ ফিরাইয়া অন্তরিকে ধাবমান হইল।

‘এমন কবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মাঝেতে হয়, তা কি জানেন না।’ মেয়েটি বিশ্বাসেব স্বব কণ্ঠে মিশাইয়া বজ্রতক সম্বোধন কবিল।

‘তা জানি।’ বজ্রত কহিল।

‘তবু দাঁড়িয়েছিলেন। আপনি তো স্বেচ্ছাসেবক নন।’

‘স্বেচ্ছাসেবকেব নিদর্শন যদি গাফীটুপি হয়, তবে নই। নইলে স্বেচ্ছাসেবক নয় কেন?’

মেয়েটি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—‘কই, আপনাকে তো কখনও দেখিনি।’

‘আপনি কি সব স্বেচ্ছাসেবকেই চেনেন?’ বজ্রত কহিল।

মেয়েটি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ‘না, তা নয়, তা ঠিক নয়, তবু, মানে—যদি আপনি—আমি আব দাঁড়াতে পারি না—’ এবং আশঙ্কাজনিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া সচিংকাবে কহিয়া উঠিল—‘স্বলোচনা, স্বলোচনা, মন্দিবা—বা দিকে চেয়ে দেখ। ছুটে যা, জোবে ছোট্—পিঠ পেতে গিয়ে দাঁড়া—’

‘তুমিও এসো, স্মিত্রা-দি।’ একটি মেয়ে চোঁচাইয়া কহিল।

‘কেন আপনাবা আমাদের এমন কবে আডাল কবে দাঁড়াচ্ছেন?’ বজ্রত সহসা প্রশ্ন কবিয়া বসিল। ‘এতে আমাদের অপমান হচ্ছে না?’

মেয়েটি প্রশ্বাসোত্তত হইয়াছিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—‘অপমান কেন?’

‘আপনি আমাদের অপবিচিতা,’ বজ্রত কহিল, ‘কিন্তু যুদ্ধেব উন্মাদনা এবং ব্রতসাবনের দীপ্তিতে আপনি এমন অদ্ভুতরূপে প্রকাশ পেয়েছেন যে, অপবিচয়ের কুণ্ঠা আপনার কাছে না কবলেও চলে। দেখুন, মেয়েবা আমাদের লালুনার হাত থেকে বাঁচালে আমাদের পৌরুষ তাতে উজ্জল হয় ওঠে না, এবং যাদের কাছে থেকে আপনারা আমাদের আড়াল কবছেন, তাদের কাছে এ-জগা আনাদের সম্মানও বর্ধিত হয় না।’

‘আইনেব নামে যাবা অবৈধতাব আশ্রয় নিচ্ছে, তাবা কোন্ গোববের কান্দটা কবচে?’

‘তা দেখবাব ভাব তাদের, আমাদের নয়।’

‘কিন্তু আমরাও শাস্ত্র আওতাচ্ছিন্ন না, আমরা অহিংস যুদ্ধ কব’চ।’ মেয়েটি দৃঢ়স্বরে কহিল।

‘আমাদের যুদ্ধ, যুদ্ধ নয়। তা সত্যাগ্রহ।’

‘বেশ, তব আপনি দাঁড়িয়ে মাঝখানে’ মেয়েটি কহিল, ‘যাবা মাঝ পাওয়া পছন্দ কব না, আমরা তাদের সাহায্য দাঁট।’ বলিয়া আব বাক্যব্যয় না করিয়া দাবান্নি শিখাব মত হুৎগাংগিতে সে ভিত্তের দরক ছুটিয়া গেল, এবং পলকে অদৃশ্য হইল।

বজ্রত সমস্তম বিষ্ময়ে হতভম্ব হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া বহিল—নড়িল না, অগ্রসব হইয়া একবার এই বহুমুখী তকণীব অদ্ভুত কায়াবলী প্রত্যক্ষ কবিতে চেষ্টা কবিল না। সমস্ত ঘটনাটা একটা অলৌক স্বপ্ন বলিয়া তাহাব নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মনে হইল, হয়তো এমন একটা ঘটনা কোনও দিন মনে মনে বচনা করিয়াছিল, কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে বাস্তব এবং কল্পনার সীমাবেধা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে টেব পায় নাই। মিছিল-

কাবীদেব দল যোগ দেওয়া, দেশাশ্রমে ক' উচ্চব্রহ্ম কবিতা কবিতা কলেজ স্ট্রীট হইতে দেশবন্ধু পার্ক পর্য্যন্ত নিজেই প্রায় অজ্ঞাতসাবে চলিয়া আসা, পুলিশ সার্জেন্টের আক্রমণ, ঘোড়ার নাকের নিঃশ্বাস—সবই যেন বজ্রতের কাছে সহসা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

স্মৃতিহা ! স্মৃতিহা ! স্বপ্নের মতো স্বপ্ন ! কোন উপলক্ষে পড়িয়াছি এই নাম ? এই চবিত্তিটি কে সৃষ্টি করিয়াছে ? কেমন কবিয়া বজ্রত আসিয়া উপস্থিত হইল দেশবন্ধু পার্কের এই শ্রামল ঘাসের উপর ? এইখান দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত স্বপ্ন কখন দেখিতে আবশ্য করিল ?

হস্টেলের প্রায় পাঁচাশিটি আসিয়া তবে বজ্রত ঘের পাটল সে বাস-এ বসিয়া আছে। সে সন্ধ্যা হইয়া সন্ধ্যা হইয়া উঠিল। কিন্তু তারপর সন্ধ্যা সমুখের বেঞ্চিতে দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিল—মনে হইল, আবাব বুঝি স্বপ্ন দেখা শুরু হইবে।

দেখিল, একদল ককণী মেয়েব মাঝখানে সভাস্থবদনে বসিয়া আছে স্মৃতিহা—কৌতুক-গল্প মনোহর হইয়া আছে। মুক্তি হাব বদলাইয়া গিয়াছে, অসমসাহসিকা, তেজোদম্বা, স্বর্গ-স্বর্গা, অগ্নিশিখার মত মেয়ে আর নয়, এ হাব অত্যন্ত। বোদ্ধা বদল স্মৃতিহাব মনোহর উঠিয়াছে জোয়াংসা, বাষ্টিলাসী উদ্ভগহান লোনা, ককণীমূর্তিতে সে প্রকাশিত হইয়াছে। স্মৃতিহা স্মৃতিহাব বাবনানে এই পরিবর্তন যেমন বিষ্ময়কর, তেমনি অদ্ভুত। কল্যাণে যেমন ইচ্ছাযত্ন অদল-বদল কবিয়া লওয়া যায়, ইহাও রূপও তেমনি নমনীয়। স্মৃতিহাস্ময়ী, বুদ্ধিপ্রদীপ-নমনা, কৌতুকপরাগণা এই মেয়েটি আবাব বজ্রতকে চমক লাগাইয়া দিল।

একবার মাত্র বজ্রতের বিষ্ময়াপন্ন দৃষ্টিব সঙ্গে মেয়েটির দৃষ্টিপাত হইয়া-

ছিল ; কোনও অস্বাভাবিক অনাবশ্যক দ্রুততাব সঙ্গে সে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লয় নাই । পরিচয়েব কোনও চিহ্ন তাহাতে ছিল না, অপরিচয়েরও নয়—এ যেন চৈত্র-জ্যোৎস্নার অপক্ষপাত চাহনি । বজ্রত জীবনে এই প্রথম নিজেকে বিব্রত বোধ কবিল । সুমিত্রাব সঙ্গিনীবা উপস্থিত না থাকিলে বজ্রত তাব ক্ষণিক পূর্বের কটতার জগ্ন এই অদ্ভুত মেয়েটির কাছে যাইয়া অনায়াসে ক্ষমা চাহিতে পাবিত ।

বাস্ কলুটোলাব মোড়ে আসিয়াছে । স্বপ্নগ্রস্তের মত টলিতে টলিতে বজ্রত নামিয়া পড়িল’।

সাবাটা বাত বজ্রত ঘুমাইতে পাবিল না । সুমিত্রা ! সুমিত্রা ! কোথা হইতে উদ্ভিত হইলে সুমিত্রা এমন অকস্মাৎ, এমন বহুশ্রমবুঝ রূপে ? চৈতন্যেব মধ্যে এ কী বিচিত্র স্বপ্নেব সূত্রপাত হইল । কোন মহাকাব্যেব ছন্দোবদ্ধ স্ববাক্যত বহুশ্রলোক হইতে ছিট্কাইয়া আসিয়া পড়িল এমন মধুর নাম ! সুমিত্রা ! সুমিত্রা ! মনেব মধ্যে এ কী অবর্ণনীয় অন্ত-ভূতিব স্পন্দন শুরু হইল । এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি মতিভ্রম ?—উত্তর-চরিতের ভাষায় বজ্রত মনেব কাছে শুধুই গুঞ্জন কবিতা প্রশ্ন কবিতে লাগিল । চৈত্রজ্যোৎস্না বাতে বাজাব চিত্রশালায় যাব দেখা পাওয়াব কথা ছিল, আজ কি জনসমুদ্রেব বিক্ষুব্ধ আলোডনেব মধ্য হইতে, ক্ষোভ-তিস্ত্র লগ্নে, সংগ্রাম-কট পট-ভূমিকায় তাব আবির্ভাব হইল ? নিশ্চয়, নিশ্চয়, এতে আব সন্দেহ করিয়া ফল নাই । প্রতি জন্মে, প্রতি জন্মান্তরে চৈতন্যেব মধ্যে সে অস্পষ্ট ছায়াব মত আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছে, প্রতিবাব সে ধরা পড়িয়াছে চঞ্চল পবনে, বজনীগন্ধাব গন্ধে, চন্দ্রালোকেব জাদুমন্ত্রে তার যবনিকা উড়িয়া গিয়াছে ।

সুমিত্রা ! সুমিত্রা ! কোথায় পাইয়াছে সে অমন নাম, কোথায়



পাইয়াছে অমন দুটি চোখ, অমন পবিত্রনশীল অপূর্ব মুখমণ্ডল, অমন অগ্নিশিখাব মত তেজোদৃপ্ত, ভঙ্গিশীল দেহবল্লরী ।

মেয়েদেব সঙ্গে মিশিবাব বহু স্রোযোগ বজ্রতেব হইয়াছে । কত মেয়ে তাব সঙ্গে অমৃতবল্লভা বাড়াইবাব জগু কত আগ্রহ দেখাইয়াছে । বিস্তর বজ্রতেব মনে কোনও দিনই কোনও দাগ পড়ে নাই । এক এক সময় তার মনে হইত, হয়ত জীবনে কোনও দিনই তাব নাবীসাহচর্য্যেব প্রয়োজন হইবে না । এমন কি কখনও কখনও মেয়েদেব প্রতি সে গভীর বিতৃষ্ণা বোধ কবিত । নাবীব চাইতে পুরুষ বন্ধু তাব কাছে চিবকালই বেশি প্রিয় , পুরুষদেব মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নাই—পুরুষদেব সে বিশ্বাস কবে, ভালবাসে ।

কিন্তু তাব ‘এমোশানেব’ বাজ্যে আজ এ কী অন্তবিপ্লবেব সাড়া পড়িয়াছে । অজ্ঞাতকুলশীলা, অপবিচিত্রা, অজানা এই মেয়েটি কী অসম্ভাব্য জোব লইবা মনেব মধ্যে একেবারে তুডমুড কবিয়া আসিয়া পড়িল । যেন পদ্মাব জোয়াব, অকস্মাৎ দুর্নিবাব আবেগে অজানা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তটেব উপর আচ্ছাদিয়া পড়িল—ভঙ্গুব মাটিব তাহাকে আটকাইয়া বাধিবাব ক্ষমতা নাই । এই অদ্ভুত হৃদয়াবেগেব নিকট বজ্রত নিজেকে একান্ত ভঙ্গুব বলিয়া বোধ কবিল । স্মিত্রা । স্মিত্রা । কোথা হইতে এমন অকস্মাৎ উদিত হইলে তুমি ।

একটা অথগু স্বপ্নেব মধ্যে কয়টা দিন কাটিয়া গেল , অবিশ্বাস্ত স্বব এবং অবর্ণনীয় বণ্ডেব ঝলমলানিতে বজ্রত বহির্জগৎ বিস্মৃত হইল ।

এই পাগ্লামি দমন কবিতে বজ্রতেব বেশ কয়দিন লাগিল । ইঠাং-প্রেমে পড়া কলেজ-জীবনেব একটা অপবিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ । ইহাব হাস্যকরতায় রঞ্জত চিবকালই কৌতুক বোধ করিয়াছে । দলবল লইয়া

এই তরলতার উপর ব্যাপকভাবে হাত এবং বাজ কত যে বর্ষণ করিয়াছে, তা'র ইয়ত্তা নাই। তাই এই অবিচ্ছিন্ন বঙ্কিন দিনগুলি ব্যাপিয়া মনে মনে যতই সে ইন্দ্রধনু বঁচনা করিয়া থাকুক, বর্ণনাভীন, গন্তব্যভীন, অন্তিমভীন পথ যতই না অভিসাবে চলুক, সামান্য চাপল্যও সে দেখায় নাই। স্বমিত্রের সঙ্কানে মিটিং-এ যাওয়াটাকে সে অপবাদ মনে করিয়া ছ, প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজেই মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় ইচ্ছা-সংকল্প একাধিক বাজনৈতিক সভায় যোগ দিওঁ পাবে নাই।

অবশ্যই একটু অস্বস্তি লাভ করিবাব পথ সে মনে মনে খুব একেচোট করিয়া লইল। অচ্ছা, সত্য সত্যই সে যদি প্রেমে পড়ে তবে কি করিবে? কবিতা লিখিবে? মনেট। প্রেমে পড়িয়া যুগ-যুগান্তরে বহুলোক এই চতুর্দশপদী কাবিতা লিখিয়াছে। তবে যাবা হৃদয়বাহন এত অল্প পরিসরেই মধ্য অটাইতে পাবে না, তাদের কথা স্বতন্ত্র। প্রেমের স্ততি যে অল্প পরিসরেই মধ্য হাত কবিত্তে হইবে, কবিগুরুবা তেমন কোনও নির্দেশ দেন নাই। সেরেনেড্! প্রেমসীব জানালায় তলায় কাঁটাগোলাপের বন দাঁড়াইয়া দ্বিপ্রহর বাত্রে শ্রাব-বিহ্বল প্রেমিকেই স্ততি গান। তা সম্ভব নয়, পদ মিলাইবে বজ্রত কেমন করিয়া। তবে, প্রেম নাকি অসামান্যমন করাইতে পারে। অন্তত, গল্প-কবিতা লেখা চলেতে পারে। এক পাতা গল্প লিখিয়া লাইনগুলি ইচ্ছামত অসমানভাবে সাজাইয়া দিলেই হইল। আর কি কি পাগলামি কবে লোকে? বেশ কি সে-সকল আবশ্য করবে? প্রেম একটা অদ্ভুত ব্যাধি বটে, মানুষকে আচ্ছা বাদব-নাচ নাচাইয়া লয়।

তবে এটা নিশ্চিত, বজ্রত অপবিচিত্রতার খোঁজে ঘূবিয়া বেড়াইবে না। যে অপবিচয়ের মধ্য স্বমিত্র গোপন ছিল, সেইখানেই সে থাকিবে। বজ্রতের মনেই এক অজ্ঞাত কোণে এক অদ্ভুত আবেগের ক্ষীণ একটু

স্মৃতি অবশিষ্ট থাকিয়া তাব অহঙ্কারকে চিবকাল নমিত করিয়া বাগ্ধিবে। জীবনের কত মুহূর্ত্ত বিচারাভাব মত ক্ষণস্থায়ী পত অদ্ভুত আবগ, কত অপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি, অনাস্বাদিতপূর্ণ পুলকানন্দ বহন করিয়া আনে, যাব চিবস্তায়িত্ব আশা কণাট বাতুলতা, কিন্তু যাত্রা মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেও মন সাহ দেয় না। মহাকাশের অন্তর্গত পথে মাতুষ্যেব যাত্রা, সে-পথেব চিননতুন পরিবর্তন এবং নিত্য নব আবিষ্কার ও আনন্দব মন্দ, এগুলা পূর্ণাঙ্গীন কৌশলচালনা চলিয়াছে। স্মৃতিব জগৎ মন বর্গ একটুকান স্বপ্ন বচনা করিয়া থাকে, কেন সে লঙ্ঘিত হইবে? পথ-চলাব ইতিহাসে এতো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু স্বপ্নকে স্বপ্নেব চাইতে বেশি মূল্য দেয় যেন না দেখে—হাস্যকর ও সমাহতের মধ্যে যে ক্ষণ অস্পষ্ট বাজাটি বর্তমান সেটা যেন সে কখনও লক্ষ্য না করে, তবেই হইল—বজ্রত মনে মনে ভাবিল।

## সাত

সাত দিন পবে বজ্রত গেল সত্যানন্দবাবুব বা ডাঙে তপ্পুব আর্গবেব নিমন্ত্রণে। স্পষ্ট দেখিতে পাঁহল, তাব পদেব সাঙ্গ দোখা মন্দালিকা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। কপট শাসন কাঁধা বজ্রত কাঁহল, ‘অমন কবে হাসিগুলি গলে ফেলা হইছে কেন?’ প্রকাশভাবে হাসতে কেউ মানা কবছে না। কিন্তু কাঁধগা কি শুনি?’

মন্দালিকা কোনও বাচনিক জবাব দিল না; তাব হাসিটা ববকু আবও উদ্ধত হইয়া উঠিল।

বজ্রত কহিল, ‘পদেব পবাটা কারুণ্য একচেটিয়া নয়, সেটা যাব নাম ভালো আর যাব নাম মন্দ, সবাইই মনে রাখা উচিত।’

মন্দালিকা প্রতিবাদস্বরূপ কহিল, ‘বা: বে, তাই বুঝি বল্লুম?’

‘নিশ্চয়ই বল্লে। আকাব এবং ইঙ্গিত ভাষাবই অন্তর্গত—সিঁড়িখানেনব সেক্ষানে স্পষ্ট কবেই তা লেখা আছে।’ বজ্রত ঈষৎ কৌতুকেব স্বরে কহিল। ‘দেখতো, মন্দ, কি চমৎকাব হয়েছে এই পাঞ্জাবিটা।’ কেবল আমার ধোপা ছাড়া আব সবাই এব প্রশংসা করে। তুইও করবি, যদি না তোকে ওপবেব ছেঁড়া বোতামটা শেলাই করে দিতে বলি। কিন্তু আমি বলব।’

মন্দালিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ‘দাঁড়ান, আমার সবগুলিই কাপড় শেলাই কবাব সূচ। আগে একটা চটেব সূচ আনিযে নিই—’

‘খাম্, আব চালাকি কবতে হবে না।’ বজ্রত কহিল। ‘সূচ দিয়ে মাকডশার জাল ফুঁডতে আমিও পাবি। এ-পাঞ্জাবি ফুঁডতে ঢেব বেশি কুতিত্বের দবকাব।’ বলিয়া হাসিয়া পাঞ্জাবি দুই প্রাস্তভাগ ঈষৎ টানিয়া ছাড়িয়া দিয়া পাঞ্জাবি জল কৃত্রিম গর্গ প্রকাশপূরক সে সত্যাবতীৰ সঙ্কানে প্রস্থান কবিল।

সত্যাবতী কহিলেন, ‘কী অসহ্য গরম পড়েচে, এ আব সওয়া যায় না। আঃ—এই পাখাটা ঘেন চলেও না ছাই। ওবে, ও গয়্যাম—’

বজ্রত আগাইয়া আসিয়া কহিল, ‘পাখাব বেগুলেটাবটা আমিই টেনে দিচ্ছি।’

‘তা দাও, তুমিই দাও, বাবা। এ-গরম কখনও মানুষেব দেহে সয়। আব এবি মধ্যে তোমবা শুরু কবেচ কি, শুনি? দিবিা খুসিমুখে চট পবতে শুরু কবলে।’ অবাক্ কাণ্ড। এ-কাপড় একদণ্ডও সও কি কবে? ঐ যাঃ, মাছেব চপ্পুলি এবাব ভাজতে বলতে হবে যে। ওরে, ও গয়্যারাম।—শখ কবে এক আধ দিন পব তো পর, বেশি কিনে যেন পয়সা জলে ফেলো না। এমন মোটা কাপড় কি ভদ্রলোকেব চামড়ায় চলে! ও হলো গিয়ে তোমার—স্বদেশী জিনিষ কেনা ভাল, কিন্তু নিজেকে ঝাঁচিয়ে তবে সব কিছু। আদবে যত্নে বড় হয়ে এ কি কাবো পোষায়। ঈস্,

পাঞ্জাবিটার দিকে চোখ পড়চে আব গা কাঁটা দিরে উঠচে । ওবে, ও গয়্যাবাম, বাইবে বসে বসে—’

বজ্রত মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, ‘আপনাব জন্মদিন না কবে কাকীমা ? এই মাসেই, আমাব মনে আছে ।’

খুসি হইয়া সত্যবতী কহিলেন, ‘দেখো একবাব ছেলেব কাণ্ড ! মাসটাও মনে কবে’ বসে আছে । আজ হলো গিয়ে মাসেব এগাবো দিন, তেইশে হবে আব কদিন হ’ল ? হ্যাঁ, তেইশে । খুকি—ও মন্দা, কেথায় গেলি, শুনিচিস্—’

মন্দালিকা বেশ পবিবর্তন কবিত্তে গিয়াছিল, ঘবে আসিয়া ঢুকিল । নীল বড়োব চমৎকাব একটা খদ্দবেব শাড়ি পবা, গায়ে ঐ বড়োব খদ্দবেব ব্লাউস্ । এই সামান্য সাজে তাকে এমন সুন্দব দেখা গেল যে, বজ্রত এবং সত্যবতী একই সময়ে তাব দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল ।

বজ্রত সহাস্ত্রে কহিল, ‘অল্পকবণ কাকে বলে নে, মন্দা ? তুই যা কবেচিস তাকেই তো ?’

মিটিমিটি হাসিয়া মন্দালিকা কহিল, ‘আব নিজে ?’

সত্যবতী কহিলেন, ‘বলি, আরম্ভ কবলি কি তোরা । কাণ্ডটা কি শুনি ? যা দিয়ে দবজাব পদা হতে পাবে, অনায়াসে তাকে গায়ে তুলচিস ।’ স্থিঠাকুব কি তোদেব কাছে হাব মান্ ।’

মন্দালিকা কোতুক কবিয়া কহিল, ‘হ্যাঁ, মানলই তো । খদ্দব ভেদ কবে বোদ ঢুকতেই পাববে না ।’

সত্যবতী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ‘মেয়েব কথাব ছিঁরি দেখলে তো, বজ্রত । এর পব তো জ্বলেও যেতে চাইবি ।’

মন্দালিকা না-দমিয়া কহিল, ‘তবে তো বজ্রতদাও চাইবেন ।’

‘হ্যাঁ, চাইবেন, তোকে বলেচে । বজ্রত-দার কি অভাবটা পড়েচে

শুনি যে, জেলে না গেলে চলচে না। জেলে যাবে। যত অলস্বপ্নে কথা।  
রজতদার আব কাজ নেই—’

বজত শুধু কহিল, ‘ভাবচি আপনাব জন্মদিনে এইবার খুব হালফ্যাশানেব  
একটা উপহাব দেব, কাকীমা। খুব হালফ্যাশানেব...’

সত্যবতী কহিলেন, ‘খবরদার বজত, এবাব যদি তুমি বেশি টাকা  
নষ্ট করবে তবে কিছুতেই আমি উপহাব নেব না। আগব বাবেব  
সেই—’

‘এবার বড জোর দু’তিন টাকা নষ্ট কববো—তাব এক কাণাকডিও  
বেশি নয়।’ রজত ভালোমামুষেব মত কহিল।

শুনিয়া সত্যবতী আশস্ত এবং খুশি হইলেন। ঈষৎ কৌতুক কবিয়া  
প্রশ্ন কবিলেন, ‘কিস্ত দু’তিন টাকায় কোন্ হাল ফ্যাশানেব জিনিষ পাচ্ছ ?’  
রজত কহিল, ‘কেন, খন্দবেব শাড়ি।’

শুনিয়া সত্যবতী প্রায় চিংকাব কবিয়া উঠিলেন। মর্মান্তিক ভীতিব  
সঙ্গে কহিলেন, ‘ওবে সর্বনাশ। অ্যা, বলচ কি তুমি ? কথা শোনো, এমন  
শত্রুতাটি আমাব সঙ্গে ক’বো না, বজত—বুড়িকে আব এ-শাস্তি দিও না,  
বাবা।—ওরে গয়াবাম, শুনিচিস্—ঐ ষাঃ, চপ্‌গুলি এখন না ভাজলে—  
কদ্দিন্ পবে তবে তো লোকে সতবন্ধিও পবতে আবস্ত কববে—’ বলিয়া  
বাতকে উপেক্ষা কবিয়া সভয়ে তিনি বোধ কবি বা চপেব উদ্দেশ্যেই দ্রুত  
প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে সোফাটায় উপুড হইয়া পড়িয়া মন্দালিকা অদমা  
হাসিতে লুটোপুটি খাইতে আরম্ভ কবিয়া দিয়াছে। খন্দবেব ভয়ে মায়েব  
মুখমণ্ডলের ঘে চেহাবা হইয়াছিল তাহা যতই তাব মনে পড়িতে লাগিল,  
হাসিব তোড়ে ততই সে ফাটিয়া পড়িবাব উপক্রম হইল। সেই হাসিব  
বেগ দমন কবিয়া যখন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাব দুই চোখ  
দিয়া কান্না গুড়াইয়া পড়িতেছে—এমন তীব্র তাব হাসি।

সাবাটা দুপূব রজত মন্দালিকার সঙ্গে ক্যারম্ খেলিয়া কাটাইল। বেচাবি মন্দালিকা যতই হবে, ততই সে পালাইতে চায়। কিন্তু বজ্রতও নাছোড়বান্দা। অবশেষে মন্দালিকা হু অনন্তর ভাবে অসংখ্যবাব হাবাইয়া দিয়া সে কহিল—‘ঘাঃ, এইবাব পালা। এই বকম ভাবে জগতেব সমস্ত মেয়ে পুরুষেব কাছে হেবে যায়!’

মন্দালিকা কহিল, ‘ঈস্, তাই না, আবও কিছু।’

‘হাঁ, তাই,’ বজ্রত কহিল। ‘একশো বার তাই। তোএবা কি পার, জানো?’

‘কি শুনি?’

‘ঘবকল্লা কবতে, চা বানাতে। অতএব যাও, চায়েব জোগাড় করো। শুধু মাত্র—কি ব’ল চায়েব বিজ্ঞাপনে—এই পাবিবারিক পানীয় পান করে এবাব আমি পালাব।’

‘আর চা যদি না করি?’

‘পিঠে তাল পড়বে।’

‘তবু যদি সয়ে থাকি?’

‘তবে বুঝব, তুমি প্রকৃতই বঙ্গললনা—কিল খেয়ে নীরবে হজম কবতে পাব।’

সত্যবতীর ইচ্ছা ছিল, চায়েব সময় সাডম্বে উপস্থিত থাকিয়া খন্দরের অপকারিতা সম্বন্ধে এক নিবন্ধ আওড়াইবেন। কিন্তু বিকাল হইবাব পূর্বেই বজ্রত চুপে চুপে মন্দালিকাকে দিয়া চা প্রস্তুত কবাইয়া থাইয়া চম্পট দিল।

দুপূবেব প্রশস্ত নিজ্রার পব নিচে নামিয়া কাণ্ড দেখিয়া তো সত্যবতী মেয়েব উপব খজাহস্ত। কিন্তু মন্দাও দমিবাব মেয়ে নয়। কহিল, ‘বাঃ রে, আমি কি কবব? আমাকে বল্লেন চা করতে, আমি বলব—না,

আমি কববো না ? চা না খেয়ে তো যায় নি ; তবে আমি শুধু শুধু গাল খেয়ে মরচি কেন ?’

‘গাল খেয়ে মরচি কেন ।’ সত্যবতী রাগতস্ববে কহিলেন । ‘ওব না আছে মা, না আছে বাপ । একটু আদব-যত্ন পেতে চাষ, তা কি পাবাব জো আছে । নাঃ, ঘাট হয়েছে, জন্মেব শিক্ষা হয়েছে । এই বংশেব ইতিহাসে কেউ যা করেনি, আমি তাই করতে গেলুম ; মেয়েকে ইস্কুলে পড়িয়ে এখন তাব উপযুক্ত ফল ভোগ করচি—’

মন্দা রুষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া কহিল, ‘কেবলই চেষ্টাচাচ্চ । কেন, হয়েছে কি ? কোন্ মহাভাবতটা অশুদ্ধ হয়েছে ?’

সত্যবতী নেপথ্যবাসী সমস্ত অশব্দী জীবদের সাক্ষ্য মানিয়া সশব্দে আক্ষেপ জানাইয়া কহিলেন—‘শোন, একবার মেয়েব কথাটা সবাই শোন । বল্লে, কোন্ মহাভাবত অশুদ্ধ হয়েছে । ওবে হাবা মেয়ে, চা কি একটা খাবাব ? এই যে আমি বাতাব শব্দী নিয়ে উনানেব আঁচে পুড়ে দুপূব পর্য্যন্ত সব ভাজলুম, গজা বানালুম পাঙ্কয়া কবলুম, এ সব কাব জন্তে ? বলে কিনা, চা কবে’ দিয়েচি । চা দিয়ে হয় কি ? খাবাব গেলাব সাহায্য করে বৈ তো—ওরে, ও গয়াবাম, শুনচিস্ মুখপোড়া—এই যে সমস্ত খাবাব ফেলা গেল—’

‘হ্যা, ফেলা গেল, না আবও কিছু । সব আমি একলাই শেষ কবতে পাবি ।’ বলিয়া মন্দালিকা সকৌতুকে সত্যবতীব এত পরিশ্রমেব মিষ্টি-গুলিব দিকে অগ্রসর হইল ।

সত্যকথা বলিতে কি, মন্দালিকা নিজেও বড় হতাশ বোধ কবিতে-ছিল । এই হতাশা জটিল মনস্তত্ত্বেব অন্তর্গত, কেননা তার ব্যাখ্যা সহজ নয় । ঘটনাটা এই প্রকার :—চা খাইতে খাইতে বজ্রত কহিয়া-ছিল—‘এই মন্দ, এখন গান গাইবি তো ?’ মন্দা জবাব দেয়—‘দৈস, কিছুতেই না ।’ বজ্রত একটু ভাবিয়া কহিয়াছিল, ‘আচ্ছা, আজ



থাক, আৰু একটু বেকুবো।’ আব পীড়াপীড়ি না কৰিয়াই বজ্জত উঠিয়া গিয়াছিল।

পুনৰায় অমুৰুন্ধ হইলেও হয়তো মন্দা গাহিত না, কিন্তু যে অমুৰোধ আসিল না, তাৰ জন্ত এক গভীৰ আক্ষেপে এই কিশোৰী অন্তত মনোবেদনা বোধ কবিতো লাগিল। বজ্জতদাব এমন কি তাডা যে, গান শুনিবার জন্ত একটুও জববদস্তি কবিবে না। এমন রাগ ধৰিতেছে বজ্জতদাব উপৰ। ঈশ্, কত না কাজ।—

মিষ্টি এবং মায়েব বকুনি একসঙ্গে শেষ কৰিয়া মন্দালিকা উপবে উঠিয়া আসিল। দোতলাৰ ছোট ব্যাল্কনিতে দাঁড়াইয়া খাম্খা হৃদয় পথেব দিকে চাহিয়া বহিল। বড ক্লান্ত বোধ হইল, ঠিক কবিল, চুল আজ আব বাঁধিবে না।

মা বিশেষ কৰিয়া তাবই জন্ত খাবাব তৈৰি কৰিয়া বাগিয়াছেন, এই কথা বজ্জতদাকে জানাইলে সে সম্ভবত অপেক্ষা কবিত। কিন্তু মায়েব এই মহৎ প্ৰচেষ্টাব কথা মন্দাবও সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত ছিল, এমন কি, জিনিষগুলি না দেখিয়া কেবলমাত্ৰ বৰ্ণনা শুনিলে ইহাব প্ৰাচুৰ্য প্ৰত্যয় কৰা মুশ্বিল হইত। ‘বাঃ বে, আমাব দোষ কি। আমি বুঝি কিছু জানতাম। না থেয়েছে, বয়ে গেছে।’—মন্দালিকা মনে মনে বাবদ্বাব বলিল। কিন্তু তবু স্বস্তি পাইল না।

নিজেব উপব বাগিয়া মন্দালিকা পডাব ঘৰে প্ৰবেশ কবিল। দিন-পঞ্জিকাৰ অঙ্কগুলিব উপব শুভ্ৰ সৰু তৰ্জ্জনী স্থাপন কৰিয়া আগামৌকল্য সোমবাব হইতে পৰবৰ্ত্তী ববিবাব পৰ্য্যন্ত সংখ্যাগুলি গণিয়া দেখিল। অতঃপৰ চেচাবটায় যাইয়া বসিয়া পডিয়া টেবিলে বুকিয়া সশব্দে শুক কবিল—‘অস্তি কস্মিন্শ্চিৎ বনোদ্দেশে দীৰ্ঘবাবো নাম—’

## আট

সত্যানন্দবাবু বাডি হইতে বাহির হইয়া বজ্রত দক্ষিণ দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু সত্যানন্দের বাড়ির সমস্ত বিলাস-উপকরণ এবং আবাম-আয়োজনপূর্ণ কান্ধব মধ্যে অকস্মাৎ বজ্রতের অস্বস্তি বোধ হইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিকেব ঐশ্বর্য্যেব আড়ম্বরগুলি, কোচ, চেয়ার, ছবি, আলোর ঝাড়, বিচিত্র রঙিন-পর্দার গুঠন সহসা যেন নিঃশ্বাসেব পথে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন ভগবানের দেওয়া বাতাসের প্রবাহ আটকাইবার জন্ত উঠারা ষড়যন্ত্র কবিয়াছে। ইহাব প্রতি-ক্রিয়া স্বরূপ পৃথিবীর উদাব বিস্তৃতির মধ্যে পালাইয়া মুক্তি পাইবাব জন্ত একটা দুর্দ্দমনীয় আকাজক্ষা রজ্রতকে পাইয়া বসিল। ইচ্ছা হইল, একটা ছুট দিয়া এই ধূলিধূমসমাকীর্ণ, ইষ্টক-স্তূপ-কণ্টকিত নগরীর খণ্ডিত আকাশের অভিশাপ হইতে পালাইয়া যাইয়া শস্ত্রসুগন্ধি উন্মুক্তির মধ্য হইতে প্রাণপূর্ণ একটা নিঃশ্বাস লইয়া আসে; পদ্মাব রূপালী জলবাশিব মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তৃপ্তিস্বপ্ন সলিল আলোড়িত করিয়া তোলে। প্রকৃতির মধ্যে ছুটিয়া যাইবাব এই প্রবৃত্তি রজ্রতকে কখনও কখনও এমনি হঠাৎ নাচাইয়া তোলে, পূর্বমুহূর্ত্তেও একটু নোটিশ দেয না।

সত্যানন্দবাবু বাডি হইতে বাহির হইয়া সতাই পদ্মায় পৌছান গেল না, কিন্তু বাহিবেব খোলা আকাশের তলায় আসিয়া বজ্রোপসাগর হইতে উড়িয়া-আসা দক্ষিণ-বাতাসেব সংস্পর্শে বজ্রতের নিঃশ্বাস বন্ধ-হওয়া ভাবটা দূর হইল। স্থির করিল, ট্রাম বাস্তায় পৌছিযা যে-কোনও একদিকেব গাড়িতে চাপিয়া বসিবে, এবং টার্মিনাস্ হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে যে-কোনও একদিকেব গ্রামেব দিকে যাত্রা কবিবে। অপবিচিত্র বাজ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিবার এক অভূত মাদকতা চিরকালই বজ্রতকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। কতদিন এমনি অজানা পথে চলিতে চলিতে সে ভাবিয়াছে—একদিন পথ

ভুল করি না কেন, অপবিচিত জনপদে, অরণ্যসকুল প্রান্তরে, অস্থলীন ধানক্ষেতেব মধ্যে শুধুমাত্র তাবাব আলোয় পথ চলিতে চলিতে অবশেষে হয়তো এক কৃষকেব মৃদু-আলো-জ্বালা কুটিবদ্বাবে যাইয়া আঘাত করিব। নয়তো উন্মুক্ত প্রান্তরেব এক বাঙা পলাশগাছেব তলায় ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িব—জোনাকি জ্বলিবে, নিভিবে, বিবিধ পতঙ্গ বিচিত্রস্বরে সাবাবাত ধবিয়া অতি কাছাকাছি গুঞ্জন কবিতে থাকিবে, প্রহবে প্রহবে কালপুরুষ স্থান বদলাইয়া চলিবে। কাঁচাবানেব গন্ধ লইয়া আসিবে বাতাস, সুদূর লোকালয় হইতে কুকুৰব ক্ষীণ ডাক শোনা যাইবে—কী অপূৰ্ণ হয় সত্যসত্যই যদি একদিন এমন ঘটনা ঘটে। সেই—‘বিজন ভূঁয়ে ছিলেম শুয়ে মেঠো-ফুলেব পাশাপাশি।’ শুধু কবিতায় নয়, এমন অভিজ্ঞতা শৈশবে তাহাব বহুবাব হইয়াছে, তখন প্রকৃতিব সাথে তাব সংযোগ স্রগভীৰ ছিল—ধবণীব নিজ ভস্মেব তত্ত্বাবধানই সে বড হইয়া উঠিয়াছে।

কে এই মেয়েটি। এদিক গ্যাডক্‌স্-স্কোয়াবেব কোণা, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, তাবপৰই বাস্তাব উপব আগাইয়া-আসা বাবান্দাব উপব অলস বৈকালেব ধূসৰ আলোয় দ্ববন্ধ-অম্পষ্ট একটা তরুণী-মূৰ্ত্তি দাঁড়াইয়া। দেখিযা সচচিত্ত বজ্রত বাস্তাব মধ্যখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজেব প্রাঘ অগোচবে একটা কথা মূদ্রিত ওষ্ঠ ঠেলিয়া বাহিব হইয়া আসিল—স্মিত্রা। কিন্তু এও কি সম্ভব? কেমন কবিয়া আসিবে স্মিত্রা। স্বপ্ন হইতে কেমন কবিয়া এখানে আসিবা সে উদ্ভিত হইবে? মনেব মধ্যে এ কী অবিশ্বাস্য মাতলামি শুরু হইল। জগতে স্মিত্রা বলিয়া তবে কি সত্যই একজন আছে।

স্বপ্নগ্রস্তেব মত বজ্রত অগ্রসৰ হইয়া বাড়িটাব নিকটবৰ্ত্তী হইল। সন্নেহেব আর অবকাশ নাই। বেলিঙেব উপব বা হাতেব কল্পই ভব

কবিয়া হাতেব পাতার গাল হেলাইয়া সত্যসত্যই স্মিত্রা পার্কেব ক্রীড়ারত শিশুদের দিকে চাহিয়া আছে। এলোথোপাটা পড়িয়াছে হেলিয়া, শুভ্র লম্বা আঙুলেব ডগাগুলি কেশজালেব মধ্যে গোঁজা, দীর্ঘ আঁখিপল্লব এবং ঈষৎ কুঞ্চিত ক্র-যুগলেব তলায় প্রত্যাষেব বোদ্রহীন আলোব মতো উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন পার্কেব শিশুদের ছাড়াইয়া বহুযোজন দূবে চলিয়া গিয়াছে।

এত সুন্দর। এমন অপূর্ব সুন্দর, এমন তুলনাহীন সুন্দর স্মিত্রা। মুগ্ধ হইয়া বজ্রত ভাবিতে লাগিল—এ তো রূপকথাব অতিকোমল বাজকণ্ঠ। নয়, এ নারী স্বমহিমাতে প্রদীপ্ত, মননশক্তিধারা আত্মস্থ, স্বকীয়তায় অনন্য। পূর্বজন্মের কোন্ প্রদীপালোকিত অন্ধকাৰে ইহাব সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আমাব ?

‘দেখুন, শুনচেন, আমি একটু কথা বলতে চাই।’ বজ্রত উপর দিকে মুখ তুলিয়া ঈষৎ উচ্চস্ববে ডাকিয়া কহিল।

বজ্রত ছাড়া অন্য কেউ অপবিচিত। কোনও মহিলাকে এমন ভাবে আহ্বান করিতে পাবিত কিনা সন্দেহ। বজ্রতেব দ্বাবা কিছুই অসম্ভব নয়, যাহা সে অগ্ৰাঘ বলিয়া মনে না কবে, অনায়াসেই তাহা সে করিতে পারে—ভদ্রসমাজে সেটা সচল কি অচল তাহা তাব বিচার না কবিলেও চলে। বজ্রত কহিত—এ-অভ্যাস পদ্মাব কাছে পেয়েছি, পদ্মা আদব-কায়দাব ধাব ধাবে না। কিন্তু বাস্তা হইতে এমন করিয়া একজন অপবিচিতাকে ডাকিতে পদ্মাও হৃদতে সঙ্কোচ বোধ কবিত।

‘আমি একটু কথা বলতে চাই, শুনচেন।’ বজ্রত আবাব হাঁকিয়া কহিল।

এইবাব স্মিত্রা বিস্মিত হইয়া নিচের দিকে তাকাইল এবং রজ্রতকে দেখিতে পাইল। অর্দ্ধমেকেণ্ডকাল একটা বিব্রত অবিশ্বাস তাব স্রগৌব

মুখমণ্ডলেব উপর হাঙ্কা মেঘছায়াব মতো অঁচঞ্চল হইয়া বহিল, দীর্ঘ অঁগিপল্লব দুটি হইল অধিকতর উর্দ্ধাশিত, দুই চোখ সতর্ক প্রহরীর মতো এক মুহূর্তেই জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল, ঠোঁটেব বেথা কঠিনতর হইল—  
তাবপব সহসা স্মিত প্রসন্নতায় স্মিত্ত্বার সাবাটা মুখ প্রাবিত হইয়া গেল।

শ্রাণ্ডেলেব দ্রুত আঘাতে সচকিত গুঞ্জবণ উঠিল সিঁড়িতে। চুড়িবালাব নিকুণ দেওবালেব গায়ে প্রতিধ্বনিত হইল, অবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হইয়া বাতাসে গন্ধেব স্পর্শ বিতবণ কবিয়া ত্রস্ত আঙুলেব লীলায়িত তৎপবতায় খোঁপায়, বাঁধা পড়িল। সমুখের দবজাব এক পাট্ খুলিয়া দাঁড়াইয়া স্মিত্ত্বা কহিল, ‘আসুন। ভেতবে আসুন।’

‘আপনাকে খুবই বিস্মিত কবচি, কেমন?’ বজ্রত বৈক্ষিয়ং হিসাবে কহিল। ‘ভদ্র-সমাজেব আইন অনুসাবে আমাব আচরণ নিবতিশয় গঠিত, এতে অপনাব মতো আমাবও সন্দেহ নেই।—কিন্তু আমাকে কি আপনি চিনতে পার্চেন?’

স্মিত্ত্বা মৃদুসবে কহিল, ‘হ্যাঁ।’

‘বাঁচালেন,’ বজ্রত একটুগানি হাসিয়া কহিল। ‘নইলে অভদ্রতাটা আমাব অধিকতর বিসদৃশ দেখাত। কিন্তু দেখুন, পদ্মাব পাড়ে আমাব বাড়ি, আমাব কাছ থেকে ড্রয়িং-রমেব আদর-কাহদা আশা না কবলেই আমাব উপর সুরিচাব কথা হবে।’

স্মিত্ত্বা বিব্রত হইয়া কহিল, ‘ওঃ, আপনাব বাড়ি পদ্মাব পাড়ে বুঝি?’

‘পদ্মাব বুকে বললেও হয়,’ বজ্রত কহিল। ‘আমাদেব আদিম বাড়ি পদ্মাব জুঠবে।—কিন্তু বংশ-পরিচয় দিতে আসি নি। আপনাব কাছে সেদিন কিঞ্চিং অপবাদ কবেছিলাম, এবং তাব জন্ত কিছু দুঃখ-প্রকাশ করাব ইচ্ছাও হয়েছিল, কিন্তু অবকাশ হয়নি। পথ-চলতে

হঠাৎ আপনাব দেখা পেলাম আজ ; তাই সেদিনেব অপবাদটা স্বীকার কবে অগ্নায়েব লাঘব করতে চাই। কিন্তু কেবলই সন্দেহ হচ্ছে, একটা দোষ স্থালন কবতে এসে অগ্নিদিকে দোষেব মাত্রা বাড়িয়ে ফেললাম না তো ?’

হুমিত্রা বিস্মিত হইয়া কহিল, ‘কোন্ অপবাদের কথা বলচেন ? আব অগ্নি কোন্ দিকেই বা তাব মাত্রা বাড়িয়ে ফেলবেন ? বহ্নন এই চেয়াবটাতে ।’

না-বসিয়াই বজ্রত কহিল, ‘অপরাধ অকৃতজ্ঞতা—যাব বড় দোষ আব নেই। নিজেকে বিপন্ন কবে আপনি যখন আমাকে মাব খাওয়াব হাত থেকে সেদিন বাঁচালেন, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না কবে আমি পৌরুষ প্রদর্শন করলাম। বল্লম—মাব খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে আপনি আমাদের অপমান কবেছেন। সেদিনেব সেই কটতাব ভল্ল আমি লজ্জিত। অকৃতজ্ঞতা পুরুষেব আদিম স্বভাব, জানেন তো ?’ বলিয়া বজ্রত হাসিয়া ফেলিল।

হুমিত্রাও ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ‘না, জানিনে তো ।’

‘তবেই তো মুগ্ধিলে ফেললেন—কৈফিয়ংটা ঠিক টিকলো না দেখচি। কিন্তু অপবাদ স্বীকার কবতে আসায় অপবাদের মাত্রা বাড়েনি তো ?—’

‘নিশ্চয়ই বেড়েছে। পদ্মাব পাড়ে বাড়ি বলে আদব-কাযদা মানেন না—কথাটা এমন গর্বিতভাবে বলেছিলেন যে, আমি প্রথমটায় সত্যি বলে বিশ্বাস কবেছিলাম। কিন্তু এই ক্ষমা-চাওয়াব বাডাবাড়িটা তো পদ্মাব মত শোনাচ্ছে না।—চেয়াবটায় বহ্নন, কিন্তু ক্ষমা-টমাব কথা থাকুক। পদ্মাব সঙ্গে এসব খাপ খায় না ।’

‘সত্যিই নয়’, বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বজ্রত কাছের চেয়াবটায় বসিয়া পড়িল। কহিল, ‘সত্যি, ক্ষমা-টমা চাওয়া আমার ধাতে পোষায়

না। তবে ইচ্ছার ওপৰ অত্যাচাৰ কবাই নাকি সভ্যতা—আব আমাকে অসভ্য বলে কিছুতেই তা আমি সহ্য করবো না।’

স্বমিত্ৰা স্মিত হাসিয়া কহিল, ‘না, সে ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বজ্রতবাবু, তা আমি বলব না।’ বলিয়া সে নিজেও হলুদ-বঙেব খন্দবে মোড়া ছোট কোচটায় বসিয়া পড়িল।

বজ্রতবাবু। বিষ্ময়ে প্রথমটায় বজ্রতব মুখ দিয়া কথাই বাচিব হইল না। বজ্রতবাবু। স্পষ্ট কবিয়া স্বমিত্ৰা বজ্রতবাবু উচ্চারণ কবিল। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কাৰও বুঝি এত বিষ্ময়কৰ নহে। বজ্রত প্রায় আকাশ হইতে পড়িয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবিয়া বসিল, ‘আশ্চর্য। আমাব নামটা জানলেন কি করে?’

ইহাব সবাসবি কোনও জবাব না দিয়া স্বমিত্ৰাও প্রশ্ন কবিল, ‘আপনি আমাব নাম জানেন?’

‘জানি।’

‘জানলেন কি কবে?’

‘ডাকতে শুনেচি।’

‘আমিও ঠিক তেমনি কবেই জানি।’

বজ্রতব বিষ্ময় তাহাত কিছুমাত্র কমিল না। সে অবাক হইয়া ‘ভাবিতে লাগিল, স্বমিত্ৰাব সন্নিহানে কে কবে তাব নাম ধৰিয়া ডাকিয়াছে? সেদিনেব পূৰ্বে কি স্বমিত্ৰা কখনও তাকে দেখিয়াছে? কেমন করিয়া সে শুনিল বজ্রতব নাম?’

‘আপনাকে অনেকেই চেনে, শুধু আমিই চিনতাম না।’ স্বমিত্ৰা কহিল। ‘মাঠেব মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিন যখন আপনি মাৰ খাওয়াব জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—ইখানে স্বমিত্ৰা সামান্য কৌতুকেব হাসি হাসিল—‘তখন আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদলেব একাধিক ছেলে আপনাকে সেখানে দেখে বিস্ময় বোধ কবেছিল। আপনি নাকি মস্ত বড়লোক, মস্ত জমিদার !

এসব সদৃশ্যের জগৎ ওদেব স্থিবিবিশ্বাস ছিল যে, আপনি যে-কোনও সং-কার্য্যেব একান্ত অযোগ্য—’

‘চমৎকার ধাবণা তো ।’ বজ্রত সকৌতুকে কহিল ।

‘হ্যা, খুব উচ্চ ধাবণা,’ মুহূ হাসিয়া স্মিত্রা কহিল । ‘তাই মাবেব প্রতি আপনাব সেই লোলুপতা দেখে এক নিমেষে ওদেব দৃষ্টি-ভঙ্গি গেল বদলে । এমন মস্তব্য ওবা কবতে লাগল যা আপনাকে যদি বলি, আমাব মুখেও চাটুবাদেব মতো শোনাবে । কিন্তু প্রশংসাব কথা আমি আব ব্যাখ্যা ক’বে শোনাতে পাবব না । ..আমাদেব নিজেদেব বাড়িতেও আপনাব একজন অ্যাড্‌ম্যাবাব আছে—আমাব সন্ত-দা । সন্ত-দা আমাব পিস্তুত ভাই , যুনিভাসিটিতে পড়ে, আপনাব এক ক্লাস নিচে । আপনাব সঙ্গে ওর পবিচয় নেই—কিন্তু তাতে ওব আট্‌কায় না । সন্ত-দাও সেদিন সঙ্গে ছিল ।’

‘উনি বাড়ি আছেন ? দেখলে হয়তো আমি চিনতে পারি ।’ বজ্রত শুধাইল ।

‘বাড়ি নেই, তবে এক্সুনি আসবে । আপনি একটু বসুন না ।’

সন্ত-দা আসিবাব আগেই বজ্রত অনেক খবব জানিতে পাবিল । স্মিত্রাব বাবা স্টেইট্‌সেটেল্‌মেণ্টে সবকাবী চাকুবি কবিতেন । তিন বৎসব পূর্বে তাঁব মৃত্যু হইলে স্মিত্রা ও তাব মা বলিকাতায় আসে । পুরুষের মধ্যে বাড়িতে এক স্মিত্রার পিস্তুত ভাই সন্তোষ । স্মিত্রাব মা দিবাবাত্রিব অধিকাংশ সময় সঙ্ঘাতিক লইয়া থাকেন—যে-জগতে তাব আশা কবিবাব আর কিছু নাই, সে-জগৎ হইতে দৃষ্টি অপসাবিত করিয়া তিনি এক অজানা জগতের জগৎ পথ-হাত্‌ডাইয়া মরিতে’ছেন । ‘সঙ্ঘা-পূজোষ বিশ্বাস আমার বড়ই ক্লীণ,’ স্মিত্রা কহিল, ‘কিন্তু মায়েব সঙ্গে সব সময়েই আমি সাথ দিই, সন্ত-দার মতো তুর্ক করি নে । এই অন্তুত খেলা নিয়ে মা যদি



একটু আনন্দ পান, তবে পাক না।’ তাবপব কহিল—‘সন্ত-দা পড়ে ফিলজফি, আব বড বড তর্ক কবে। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না, এবং ওর গুরুদেব মতোই সহজকে ঘোলাটে কবে’ তোলে, এবং যুক্তি-জাল যখন আব কোনও স্থি-সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পাবে না, তখন মিস্টিসিজ্‌ম্-এব মধ্যো আশ্রয় নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ কবে।—আব আমি ? কলেজেই পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি। আমাব ধৈর্য বড কম। কিছু গুণগোল হলে পড়ায় আব মন বসাতে পারি নে—তা সে-গুণগোল যে-প্রকাবেবই হোক।—ঐ বুঝি সন্ত-দা এল।—শুনচো, সন্ত-দা, মেগে যাও, কে এসেচেন। তুমি কল্পনাই কবতে পাববে না—’

সন্তোষ ভিতবে প্রবেশ কবিয়া সবিষ্ময়ে চোঁচাইয়া উঠিল—‘বজ্রতবাবু !’  
স্মিত্রা কোতুক কবিয়া কহিল, ‘চবকাকে অবজ্ঞা কবতে না ? একবাব চবকাব ক্ষমতাটা দেখলে। আলাদীনেব আশ্চয়া-প্রদীপ।’

‘চবকা।’ িষ্ময়েব সঙ্গে সন্তোষ কহিল। ‘চবকা কি কবল ?’

‘কেন, বজ্রতবাবুকে এনে হাজিব কবল।’ এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে বজ্রত টেব পাইল দর্শন এবং বাজনীতি এ-বাডিকে সংগ্রাম-ক্ষত্র বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে। সন্ত-দাব দর্শন এবং স্মিত্রাব বাজনীতি পবম্পবকে ক্ষমা কবে না—সুগভীর ব্যঙ্গ করিয়া পবম্পবকে বাতিল করিতে চেষ্টা কবে।

এমন সময় সিঁড়িব কাছ হইতে অনুচ্চ আহ্বান আসিল—‘স্মিত্রা, কোথা গেলি, মা। আমাব ঘিয়েব বাতিগুলি এবাব জ্বলে দে। দেশ-লাইটা কোথায় বাখলাম খুঁজে পাচ্ছি নে।—’

‘যাচ্ছি মা,’ সাড়া দিয়া স্মিত্রা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ‘একটু বসুন,’ বজ্রতের দিকে ফিবিয়া কহিল, ‘আমি এখুনি আসচি। মার এখন আবতি হবে কিনা, পঞ্চপ্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে আসি।’ বলিয়া একটু শ্মিত হাসিয়া দবজা দিয়া বাহিব হইয়া গেল।

কিন্তু পবম্পবেই ফিবিয়া আসিল, সঙ্গে তপঃকৃশা এক বৃদ্ধা

ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিকে প্রাণপণে সংহত করিয়া ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ইনি কে, বজ্রের বৃষ্টিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না, সকল জপ ও আরাধনার জ্যোতি যেন এই বৃদ্ধাব মুখমণ্ডল ঘিরিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন প্রশান্ত সমাহিত সেই মুখ যে, দেখিলে সন্দেহ থাকে না, মনের মধ্যে অসীম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছেন। স্মৃতিভার ব্যক্তিভেদ উদ্ভব কোথা হইতে হইয়াছে, এবার রজত তাহা সহজেই আবিষ্কার করিল।

স্মৃতিভা মায়েব পিঠ হাত দিয়া আলগোছে বেঠেন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। কহিল, ‘রজতবাবু, আমাব মা।—মা, এর কথা তোমাকে দেশবন্ধু পার্কেব মিটিং থেকে ফিবে এসে বলেছিলাম না?—মাব-খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলে কি বাগ।—আচ্ছা কবে ধম্কে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—মাব খেতে আমার খুব ভাল লাগে। বলেছিলেন না, রজতবাবু?—এইখানে একটু বসো মা—এক্ষুণি আমি প্রদীপ জেলে দেব—’

বৃদ্ধা কহিলে, ‘বাঃ, বড় সুন্দর ছেলটি তো—চমৎকাব ছেলে।’ থাক্, বাবা, থাক্—চিবজীবী হয় থাক। তোমার নাম কি বলে, বজ্রত?’

‘আজ্ঞে, হ্যাঁ।’

‘বাড়ি কোথা বাবা?’

‘বিক্রমপুরে। গ্রাম—কোটালনগব।’

‘কোটালনগব।’ বৃদ্ধা যেন উৎসুক হইয়া উঠিলেন। ‘দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি যে-গ্রাম পত্তন কবে গিয়েচেন, সেই কোটালনগব নয় তো?’

‘দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি আমাব বাবা।’ বজ্রত অপূর্ব্ব এক গর্ক যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল।

‘দুর্গাপ্রসন্নবাবু বলে।’ বৃদ্ধাব মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ‘তাই তো বলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাব খেতে চাওয়া এ তো যাব তাব কর্ম নয়।—আমাবাও ও-অঞ্চলেবই লোক, বজ্রত। বেতবন গ্রামে আমার স্বস্তববাড়ি ছিল। তোমাব বাবার নাম ওদিকেব লোক কে না জানে।’

পিতাব এই প্রশংসায় বজ্রতের যেন কাগ্না আসিবার উপক্রম হইল। এক মুহূর্ত্তে ইহাদেব এমন পরমাত্মীয় মনে হইল যে, তাঁরা বলিবাব নয়। মনে হইল, এমন স্বজন আব তাহাব কেহ নাই। তাই উঠিয়া যাইবাব প্রাক্কালে বুঝা যখন বজ্রতকে একদিন খাওয়াব নিমন্ত্ৰণ কবিবাব জ্ঞাত হুমিত্রাকে বলিয়া গেলেন, তখন বজ্রত কিছুই বিশ্বাস্য বোধ কবিল না—মনে হইল, ইহা তাব পাওনা, নিমন্ত্ৰণ না পাঠলেই সে বিন্মিত হইত।

হুমিত্রা কহিল, ‘কালকে সোমবাব। এই সোমবাবেব পবেব সোমবার বিকেলে এসে চা খান। এত সব মিটিং আর কাজ আছে যে, তাব আগে হযেই উঠবে না।’

বজ্রত কহিল, ‘বেশ। যদি ততদিন বেঁচে থাকি।’

হুমিত্রা হাসিয়া কহিল, ‘যদি ততদিনে জেলে না যাই, তবে নিশ্চয়ই চা পাবেন।—আব আমি না থাকলেও তুমি অস্তত এ-ভদ্রতাটুকু করতে পাবে, নয় সন্তু-দা?’

সন্তু কহিল, ‘কিন্তু ফিলজফিক্যালি বলতে গেলে, তোমাদেব এই জেলে-যাওয়াব ইডিয়োলজি—’

‘একটা মায়া, কেমন?’ বলিয়া হাসিতে হাসিতে হুমিত্রা বজ্রতকে দবজা খুলিয়া দিল।

## নয়

আববো্যাপক্লাসেব এক বজ্রনীব মধ্য দিয়া হাঁটিয়া বজ্রত হফ্টেলে ফিবিয়া আসিল। শহরে এত ট্রাম, এত বাস, গাড়িব অস্ত নাই—কিন্তু সে-সবেব কথা তাঁব মনেও পড়িল না। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এক আনন্দেব উন্মাদনায় প্রায় নৃত্য করিতে করিতে নিজেব অজ্ঞাতেই বজ্রত স্বদীর্ঘ পথ অতিক্রম কবিয়া

আসিল। হুমিত্রা! হুমিত্রা! কোথায় ছিলে এত দিন, হুমিত্রা! মনে হয়, জগজ্জগাস্তব ধবিয়া তোমার সঙ্গে আমার পবিচয়—কালের মহাপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমি সংখ্যাতীত ভগ্নে তোমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার অচেনা নও, তুমি পবমাত্মীয়।

মনেব মধ্যে বজ্রত বাবস্বাব সঙ্ঘ্যাবেলাব স্মৃতি টানিয়া আনিল। ভাবিতে লাগিল—কী সঙ্ঘোচ-জড়তাহীন সুন্দর হুমিত্রাব ব্যবহার। কুষ্ঠা নাই, ভীকতা নাই, স্ত্রী-স্বলভ অতি-কোমলতাব ছন্দিত বিলাস নাই। পুরুষেব ব্যবহারেব মতো তাহা অকুষ্ঠ, বৌদ্ধেব মত তাহা সুস্পষ্ট। অথচ তাব মধ্যে ব্যক্তিত্বেব কি দুর্দমনীয় আকর্ষণ, তেজোদৃপ্ত দেহবল্লবীতে কী সুনিবিড় জীবন-প্রাচুর্য্য, মুখ-মণ্ডলে মনম-শক্তিব কী অভাবনীয় বিকাশ। জ্যোৎস্নাব মতো যে নাবী বহুশ্রময়ী, নশ্ব-সহচরীরূপে তাকে পুরুষ কল্পনা কবে, যে-নাবী বৌদ্ধেব মতো সুস্পষ্ট ও বিদ্যাতের মতো সহজ, সে নশ্ব-সহচরী নহে, সে বন্ধু—সচিব, সখী—চৈতন্যেব মধ্যে সে প্রেমাপ্লুত প্রদ্বাব আসন অধিকাব কবিয়া বসে। তাব সঙ্গে প্রেমে পড়িতে ভয় হয়, অথচ নিঃশঙ্কে নিবেদন না কবিয়া উপায় থাকে না।

মোহগ্রস্তেব মত কয়টা দিন বজ্রতেব কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, সে টেবও পাইল না। কিন্তু ইহা সে নিশ্চিত টেব পাইল যে, এ-আবেগ তাব সাময়িক নহে, এমন আবেগ তাব জীবনে পূর্বে কখনও আসে নাই; হয়তো এমন আব কখনও আসিবে না। এক অদ্ভুত বস-সঞ্চাবে বজ্রতেব সমস্ত অস্তিত্ব স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে বজ্রত হুমিত্রার সম্বন্ধে আবও খবর জানিয়াছে। দেখিল, প্রায় সকল ছেলেই হুমিত্রার নাম জানে, অনেকেই তাকে চেনে। হুমিত্রাব সংগঠন-ক্ষমতা, হুমিত্রার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, হুমিত্রাব অমিত সাহসের কাহিনী লোকমুখে বহুল প্রচারিত। রজতের বিষয় হইতে লাগিল এই ভাবিয়া যে, এমন মেয়েব নাম এতকাল কি কবিয়া তাহার অজ্ঞাত ছিল।

বাজনীতি হইতে দুবে থাকাই বোন হয় ইহাব কাঁবণ। কিন্তু আবিষ্কাবেব আনন্দও কম নহে।

একটা অদ্ভুত গর্ষে বজ্রতবে বুক ভবিয়া ওঠে। এত বিখ্যাত, এত শ্রদ্ধিত দেশ-কস্মিনী সুমিত্রা। অথচ একটুও আত্মগবিমা নাই—একবাবও সে নিজেব কাঁয়াবলীব সামান্যতম উল্লেখ কবে নাই। শুধু-মাত্র বাড়িব ডুযিং-কমে যদি বজ্রত তাহাকে দেখিয়া আসিত, তবে সুমিত্রাকে সে একজন প্রথব-বুদ্ধিশালিনী মেয়ে মনে কবিত মাত্র, কিন্তু বুদ্ধিব সঙ্গে তেজ, দীপ্তিব সঙ্গে দাহ, হাসিব সঙ্গে শক্তি, অমূল্যবাব সঙ্গে কর্তব্যবোধ কি সহজ স্বাক্ষন্দ্যে সে নিজেব মধ্যো মিলাইয়া বাখিয়াছে, তাহার পবিচয়ও বজ্রত পাইয়াছে।

সুমিত্রা। কোথায় ছিলে তুমি এতকাল, সুমিত্রা। দৃষ্টি তোমাকে চাহিয়া আসিয়াছে, চৈতন্য তোমাকে ধ্যান কবিয়াছে, কল্পনা তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে। সত্যই কি আমাব জীবনে তোমাব আবির্ভাব হইল ?

এলবার্ট হলে ছাত্রদেব এক আধা-ববোষা মিটিং ভিতবে ভিতবে বহলভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ছাত্র-সমাজেব ইতিকর্তব্যা নির্দাবণেব মিটিং ইগাই প্রথম নয়, তবে বিক্ষোভ যখন বর্দ্ধিততম, তখন পুনবায় একযোগে একটা সংহত-বিবেচনাব প্রয়োজন মনে হওয়ায়ই সভা আহূত হইয়াছিল।

সাদাবণত বজ্রত বড একটা মিটিং-টিটিঙে যায় না, তাব পক্ষে এ-সভায় যোগদানেব বিশেষ কিছু সার্থকতা আছে কিনা তাহাও সে ঠিক কবিতে পাবিল না। অবশেষে মিটিং-এব দিন দুপুব বেলায় কৌতুহল আব দমন কবিতে না পাবিয়া যখন এলবার্ট হলেব সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিয়া আসিল, তখন মিটিং প্রায় শেষ হইবাব উপক্রম।

হলে প্রবেশ কবিয়াই কিন্তু বজ্রত চম্কাইয়া উঠিল। দেখিল, মঞ্চের উপর স্থিৰ-বিদ্যুতের মত দৃশ্যভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে ইংরেজিতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছে। মেয়েটি আব কেহই নহে, সে স্মিত্রা।

অত্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণ, কথাগুলি স্পষ্ট সতেজ। বর্ণস্বর কখনও কোমল, কখনও উদ্দীপ্ত, কখনও আকৃতিতে পূর্ণ, কখনও শ্লেষ-বর্ষণে নিষ্মম। যেন আগুনই শিখা—কখনও জলিয়া ওঠে, কখনও স্তিমিত হয়, কখনও সবুজ আলোয় চতুর্দিক স্নিগ্ধ কবে এবং পবনমুহূর্তে রুদ্ধ দাহে ঝলসিয়া ওঠে।

মিটিং শেষ হইল। অসম্ভব হাঁহুতালি এবং অজস্র চিৎকারে হল্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। একদল ছেলে যাইয়া স্মিত্রাকে ঘিাবসা দাঁড়াইল— বক্তৃতা-ক্লান্ত স্মিত্রা বজ্রতের দৃষ্টিব আড়াল হইয়া গেল।

স্মিত্রা ব্যস্ত শর্মিণী, স্মিত্রা বহুজনের উপদেশ-দাত্রী, স্বেচ্ছা-সেবিকাদলেব নাযিকা। স্মিত্রাব সাঙ্গ অনেকের অনেক কিছু প্রয়োজন, অনেকের সঙ্গে অনেক কাজে তাকে খাটিতে এবং মাথা ঘামাইতে হয়, পারীষিক পবিত্রমে তাব কাতব হইলে চলে না। কিন্তু কাজ কবিতে হয় বলিয়া তাহাকে মুখ-গস্ত্রীক কবিয়া চলিতে হয় না—হাসিয়া কাজ কবিতে সে জানে, বজ্রত শীঘ্র তাহারও পবিচয় পাইল।

গুণগ্রাহী সহকর্মী ও সহকর্মিণী দ্বাবা স্মিত্রাকে পবিবেষ্টিত দেখিয়া বজ্রত নিচে যাইবাব উত্থোগ করিল। তাহাব প্রায় আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন সে ঐ দলেব একজন হইতে পাবিল না, সামান্য দর্শকেব মতই কেন তাহাকে এমন দূর হইতে বিদায় লইতে হইতেছে।

সিঁড়ি দিয়া নিচতলায় নামিবাব পব বহুজনের মিলিত কোলাহল বজ্রতের কর্ণগোচব হইল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দলবেষ্টিত স্মিত্রাও

এদিকে অগ্রসব হইয়া আসিতেছে। একাদিক ছেঁলে এবং একাধিক মেয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাব স্মিত্রা দ্রুত কিন্তু সহজ ভাবেই দিতেছে—কিছুই তাব অস্ববিধা হইতেছে না। চলিতে চলিতেই নানা পরামর্শ হইতেছে, কষ্টবা-বটন চলিয়াছে, এমন কি হাসি-কৌতুকেব পর্য্যন্ত অভাব নাই।

‘—তোমাব আব কিছু কবতে হবে না, সত্য-দা’—রজত স্মিত্রাকে বলিতে শুনিব, ‘তোমাকে শুধু বিছা সাগব আব বিপণেব ছেলেদের দেখতে হবে, তোমাব মত নিশ্চিত আব কেউ তা দেব দলে টানতে পাবে না। ওদেব সন্দেশ-বসগোলা খাওয়াও না তো?—ইন্দুবাবু, আপনাব খদ্দব-ফেবি আব নয়, এবাব সবকারী অতিথিশালায় অতিথি হতে হবে, আপনাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দবকাব।—কিন্তু, বাঞ্ছন, তোমাব বিশ্রামেব সময় এখনও আসে নি, তোমাকে—আচ্ছা, অজিতবাবু, আপনি তো সাবা সপ্তাহেব পি-কটিং কবার লোক ঠিক কবে’ বেগেছিলেন তবে কম পড়ল কেন? ও বজ্রহাবু!—নমস্কাব—ভালো আছেন?—’

বজ্র চম্কাইয়া উঠিয়া কহিল—‘নমস্কাব, ভালো। বজ্রতাটা খুব চমৎকাব—’

‘সত্য-দা, স্কটশ আব বেথুনব জগ্ন কাফে কাকে ঠিক কবা যায়, বল তো?’ ইতিমধ্যে পাঁচ পা আগাইয়া গিয়া স্মিত্রা কহিল, ‘অনস্তবাবু, আপনাব ইচ্ছলে এখন ক’টা তাঁত চলচে?—মাত্র।—কাপডেব চাহিদা মেটাতে না পাবলে লোকে বিদেশী পবেবে, এতে আব আশ্চর্য্য কি। বুধ-বাবেব মিটিংটা শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই হোক, কেমন?’ রজতকে পিছনে ফেলিয়া ওবা নিচে নামিতে লাগিল।

দলেব একটি ছেলে ছুটু মি কবিয়া কহিল, ‘স্মিত্রা-দি, বন্ধিমচন্দ্রেব যুগে তোমাব অগ্র একটা নাম ছিল।’

বিস্মিত হইয়া স্মিত্রা কহিল, ‘বন্ধিমচন্দ্রেব যুগে। কি নাম ছিল?’  
‘দেবী চৌধুরাণী।’

স্মিত্রা হাসিয়া ছেলেটিকে কৃত্রিম শাসন কবিবার ভঙ্গি করিল। তাবপব কহিল, ‘তোমার ভাইয়ের গবেষণাটা একবাব দেখ, সত্য-দা—যেন দেবী চৌধুরাণী এবং বঙ্কিমচন্দ্র একই সময়ে কলকাতা শহরে বাস কবতেন। তবে তোমার ভাইটি যে সত্যিকাবেব একটি ডাকাত, এতে সন্দেহ নেই। গবর্ণমেন্ট যে কি করে ওকে বাইবে বাথচে আমি তো ভেবেই পাইনে।—ঐ দেখো একটা খালি বাস্ যাচ্ছে—এই বোথ্কে—ডাকো না, পুরুষ মানুষ হয়ে যদি চোঁচাতেই না পাববে, তবে কিসেব—’ বজ্রতব দৃষ্টিব সমুখ হইতে দলবল অদৃশ্য হইল।

এইবাব বজ্রত স্পষ্ট দেখিতে পাইল, স্মিত্রাব কাছ হইতে সে বত দ্বে। স্মিত্রাব নিজ-জনেব অন্তর্গত সৈ নয়, কর্তব্যেব ক্ষেত্রে যাবা স্মিত্রাব নিকটতম, তাবাই তাহার আত্মীয়। বজ্রত শুধুমাত্র পবিচিত, তাহাব সঙ্গে বাক্য আদান-প্রদানেব অবকাশ স্মিত্রাব নাই—জীবনেব বৃহত্তম ক্ষেত্রে রজ্রতকে সে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যাইতে পাবে।

কাহাবও উদাসীণ বজ্রতকে এমন করিয়া পূর্বে কখনও আঘাত কবে নাই।

সোমবাবেব চা-খাওয়াব নিমন্ত্রণেব কথাটা বজ্রতব মনে আছে সত্য, কিন্তু ওদের হয়ত মনে নাই—বজ্রত ভাবিতে লাগিল। না থাকিবাবই কথা। চায়েব নিমন্ত্রণ স্মিত্রাব কাছে নিশ্চয়ই তুচ্ছ ব্যাপাব। বজ্রত ঠিক করিল, চায়েব নিমন্ত্রণ সে বক্ষা কবিবে না,—অন্তত একটা মধুব সন্ধ্যার সম্পদ তাব থাকুক, স্মিত্রাব কর্তব্যেব বাধা হইয়া বজ্রত তাব বিবক্তি কুড়াইবে না। চায়েব নিমন্ত্রণটা ও-পক্ষ হইতেও যে কেহ স্ববণ কবাইয়া দিবে না, ক্রমে এ-সম্বন্ধেও সে নিঃসন্দেহ হইল। কিন্তু পবেব শুক্রবাব আশুতোষ-বিক্টিংস্‌এব কবিডরে সন্তোষ সহসা আগাইয়া আসিয়া একটা চিঠি বাহির করিয়া তাব হাতে দিয়া যখন কহিল, ‘স্মিত্রাব



চিঠি ।’ তখন জীবনের প্রথম প্রেম-পত্রের ম’তাই সে-চিঠি বজ্রতকে ঝঙ্কত কবিতা তুলিল । অথচ কিছুমাত্র কবিত্ব, কিছুমাত্র ভাষা-চাতুর্য্য তাহাতে ছিল না । সাদাসিধা দুইটি মাত্র লাইন—‘এখনও জেলে যাইনি । সোমবারে চা খেতে নিশ্চয় আসবেন ।—সুমিত্রা’—তবু বজ্রতের মনে হইল, সঙ্গাগবা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটও কোন দিন এমন গৌরবে গৌরবান্বিত হয় নাই ।

চায়েব এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা বজ্রতের পক্ষে অসম্ভব ।

## দশ

বজ্রতাটা চমৎকাব হযেছিল, কেমন ?’

‘সে-কথা আজ আব মনে নেই ।’—বজ্রত কহিল ।

‘নিশ্চয়ই আছে, তবু প্রশংসায় কার্পণ্য কববেন ।’ বলিয়া সুমিত্রা স্মিত-মুখে চায়েব পটেব ঢাকনা উঠাইয়া চামচ দিয়া নাড়িতে লাগিল । কহিল, ‘আচ্ছা, সস্ত-দা, চা-পানব কোনও দার্শনিক কাবণ বাংলাতে পাব ?’

সন্তোষ দমিবাব পাত্র নয় । সে গম্ভীর স্ববে কহিল, ‘এব গৈবিক বর্ণে মানুষ আধ্যাত্মিকতাব স্বাদ পায় । একই কাবণে আমাদের আধ্যাত্মিক দেশেই চায়েব প্রথম সৃষ্টি ।’

. হাসিব একটা হিল্লোল উঠিল, এবং সুমিত্রা সকৌতুকে প্রশ্ন কবিল, ‘গাঁজাও কি সাধুরা এই জগ্গই খায় ? ধোঁয়াতে তো স্পিবিট্ ওয়াল্ড্-এব আভাস আসে ।’

বজ্রত কহিল, ‘আমি নিতান্তই জড-জগতেব বাসিন্দা, কাজেই সন্দেশ-গুলিব প্রতিই আমি বেশি আকৃষ্ট ।’ বলিয়া আস্ত একটা সন্দেশ মুখে পুবিয়া গাল ফুলাইল এবং গালেব ফুলা কমিয়া আসিবাব পর কহিল—উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি একজন অসম্ভব বকম খাইয়ে লোক । আমার এক বৃদ্ধপ্রপিতামহ একবাবে বসে একটা গোটা পাঁটা খেয়ে

ফেলতে পারতেন, এক' অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ একবাবে পাঁচ হাঁড়ি দই সাঁঝ করিতে পারতেন, এক—'

'অতিতরুণ প্রপৌত্র,' চা ঢালিতে ঢালিতে স্মিত্রা সহাস্ত্রে কহিল, 'লাঠি খেয়ে লাঠি হজম করিতে পাবে—ক' চামচ চিনি দেব?—আপনাব চা তো কখনও তৈবি করিনি। সস্ত-দা, তুমি কি ঠিক কবেচ স্থূল খাবাবগুলি কিছুতেই ছোঁবে না? আমার সন্দেহ হচ্ছে বাসি সন্দেশ শস্তায় বিনে এনে খাওয়া এড়াবার জ্ঞান দার্শনিকতাব ভাঙ কবচো—'

সস্ত কৃত্রিম-ক্রোধে কহিল, 'দাও, তবে সবগুলিকে এখুনি ঘমপুবে পাঠিয়ে দিই।'

স্মিত্রা নিজেব জ্ঞাও চা ঢালিয়া বইল। পেয়ালার এক চুমুক দিয়া কহিল, 'দর্শন দিবে কাব কি উপকান হচ্ছে, আপনিত বলুন, বজ্র-বাবু। বিশ্বব বহুশ্রেব কোনও কিছুবই কি তোমবা কূল-কিনাবা কবতে পেবেচ, সস্ত-দা? কোন্ দার্শনিক বুক হাত দিবে জোব ববে' বলতে পাবে, তার ব্যাখ্যাই প্রকৃত তত্ত্ব?—'

সস্তোষ কহিল, 'সন্ধানই যদি না কবি তবে আন্টিমেট রিয়ালিটিতে পৌছব কি কবে?'

স্মিত্রা ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, 'সন্ধান কবো, না কবো, আন্টিমেট রিয়ালিটিতে না পৌছে কোনওই উপায় নেই। ভগবান আছেন কিনা, জানিনে। যদি থাকেন, তবে এই জগৎ বা বিশ্বের অগ্নাগ্ন অমৃত বিশ্বয় এজ্ঞা নিশ্চয়ই সৃষ্টি কবেন নি যাতে দার্শনিকেবা তাঁব সমস্ত বহুশ, তাঁর সমস্ত হাত-সাফাই ধবে ফেলতে পাবে। যা দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ, যা বা তোমার হাতের কাছে, ববঞ্চ তাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই তাঁব পক্ষে বেশি আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবীর উৎসবশালা সাজাবার ভাব পাওচ, ইথরের জগতের খোজ কেন? মাতৃষের সমাজকে সুন্দরতব কবে' গড়ে তোল, পৃথিবীকে সভ্যতর স্থান, আনন্দকব জায়গা করে'

গড়ে তোল—মাছুষ-কীটের পক্ষে তবেই যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সহজ বুদ্ধির পবিচয় দেওয়া হবে। তোমাব ফিলসফি আব আমার পলিটিক্‌সে এইখানেই তফাৎ—’

সম্ভাষ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, ‘তোমাবা তুচ্ছ জিনিষে সন্তুষ্ট, আব বিশ্বের জ্ঞানব বাজ্যা আমাদব—’

‘অনধিকার চর্চা।’ স্মিত্রা হাসিয়া বাক্যপূরণ কবিল এবং প্রসঙ্গান্তর উপাটয়া হান্ধা শ্রবে কহিল,—‘আচ্ছা, বক্তব্যাব, আপনি নাকি একবাব কোন্‌ মিনেমাব সামনে একটা গুণ্ডাকে আচ্ছা কব’ পিটিয়েছিলেন, আবেক বাব নিউমার্কটে একটা মাতাল গোবাসৈন্যক—নিউমার্কটেই নো, না সন্তুদা? আপনার শব্দীর দেখাল হো পালোয়ান বল মন হয় না। কিন্তু সন্তুদাব খবব কখনও মিথ্যে হ’লে পাবে না।’

বক্তৃত্ত সবিস্ময়ে কহিল, ‘এ-সব সংবাদ সংগ্রহ হোলো কোথা থেকে?’

স্মিত্রা কহিল, ‘এগুলি সন্তুদাব বিশেষ ‘স্কুপ্‌’।’ বলিয়া সম্ভাষের দিকে ঈষৎ ফিবিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল। এতক্ষণে বেচাবি সন্তুদা অমুতাপ কবিয়া মবিতে লাগিল, কেন দুদিন পূর্বে রক্তত সম্বন্ধে ঐ সংবাদ দুইটি সে অতটা উচ্ছাস-সহকাবে স্মিত্রাকে জানাইতে গিয়াছিল।

রক্তত সন্তোষে কহিল, ‘এ-সব খবব আব একটু বটিত হলে আমি অনায়াসেই প্রসিক্‌তি লাভ কবতে পাবি বটে, কিন্তু আপনার ভগ্নী যেমন অবিশ্বাসের চোবা-হাসি হাসচেন, সন্তুদাব, তাতে এমন কি সত্যি হলেও ঘটনাগুলিকে নিজস্ব বলে দাবি কবতে ভবসা পেতাম না।’

সম্ভাষ খুশি হইয়া স্মিত্রাব দিকে চাহিয়া কহিল, ‘হলো?’

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গেলে স্মিত্রা বক্তৃত্তকে কহিল, ‘মাকে এইবার খবব দেয়ে আসি। পূজাব ঘবে আছেন। আপনার বাবাব নাম শোনবাব

পর আপনার উপব মা বড়ই প্রসন্ন হয়ে উঠেচেন—ও কি, যাচ্চ কোথায়, সন্ত-দা ?’

সন্তোষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, ‘একবার বাইরে তাকিয়ে আকাশের চেহাৰাখানা চেয়ে দেখ। হঠাৎ এত সব মেঘ কোথা থেকে উপস্থিত হলো।—ছেলে-পড়াতে যেতে বিলম্ব ঘটাবে দেখতে পাচ্ছি। সবু, বোন, এত কষ্টেব চাকবিটা শেষে মেঘেই না খতম্ কবে দেয়—’

বাইবে তাকাইয়া আব সন্দেহ বইল না। নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে আকাশেব যে পবিত্তন হইয়া গেছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মধুব। সাউদ্রব ঘনঘটায় সমস্ত গগন ছাইয়া গিয়াছে ; ঝড় এবং বৃষ্টি আসিল বলিয়া। কৃষ্ণচূড়াব শাখায় শাখায় পড়িয়াছে আলোডন, ধূলিজাল উৎ-ক্ষিপ্ত হইয়া সঙ্ঘাকাশ ধূসর কবিয়া তুলিয়াছে। আকাশেব এক প্রান্তে একটা শাণিত ঝলক বাবদ্যাব উঁকি মাবিয়া অন্তর্দান হইতে লাগিল। নব-বর্ষাব এ-রূপেব তুলনা নাই—অত্যন্ত অবসিকের মনকেও ইহা নাড়া দিয়া তবে ছাড়ে।

স্মিত্রা কহিল—‘আজ না হয় না-ই গেলে পড়াতে, সন্ত-দা। ছেলেটা একদিন না হয় বক্ষা পাক্।’

‘নাই গেলাম।’ সন্তোষ দারুণ বিস্ময়েব ভঙ্গিতে কহিল। ‘চাকবিটা আমাকে কতটা চেষ্টা কবে রক্ষা কবতে হচ্ছে, জানিস্ ? বায় বাগ্ হবেব বাড়ি, একবার যদি টেব পায় আমাবই ভগ্নী তাঁব মনিবেব বিরুদ্ধে এমন শত্রুতাটা কবে বেডাচ্ছে, তবে কি আমার চাকরি অমনিতেই থাকবে ? তাব ওপর আবার কামাই। সৰ্কনাশ। তুই বোস্, আমিই মামীমাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।...নমস্কাব বজ্রতবাবু—চাকবিগত-প্রাণ ক্ষীণকায় বাঙালি-সন্তানেব ক্রটি ধববেন না।—’

বজ্রতের এইবার বলা উচিত ছিল—‘চলুন, আমিও উঠি।’ কিন্তু সে কিছুই বলিল না। উঠিবাব কোন লক্ষণ না দেখাইয়া সে যেমন ছিল,

তেমনি বসিয়া বহিল। মনে মনে কহিল—ভজ্তাব খাতিবে এমন দুর্লভ সময়টুকু থেকে নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত কবতে পাবব না। এমন মুহূর্ত্ত জীবনে বেশি বাব আসে না—

সন্তোষকে দবজা খুলিয়া দিয়া এবং পুনবায় বন্ধ কবিয়া স্মিত্রা বসিবাব যবে বজ্তেব কাছে ফিবিয়া আসিল। বহিল, ‘চমৎকাব হয়েচে সন্ধ্যাটা। বৃষ্টি আমাব বড ভালো লাগে।—গ্রামফোনে একটা বাজ্‌নাব স্বব বাজাব?’

বজ্ত কহিল, ‘বেশ। কিন্তু তাব আগে আমাব বোধ হয় একটা কথা বলে নেওয়া উচিত।’

স্মিত্রা চোখ উঠাইয়া চাহিল।

বজ্ত ক্ষণকাল নিশ্চুপ থাকিয়া কহিল, ‘প্রসঙ্গটা এ-সময় না-ঠাাতে হলেই ভালো ছিল, কিন্তু দুই কাবণে আব দেবি কবা উচিত হবে না। প্রথম কাবণ এই যে, বগবাব এমন দুর্লভ স্তযোগ জীবনে আব কবে পাব জানি না। দ্বিতীয়ত, কথাটা স্পষ্ট হবে আপনাকে না জানিয়ে আপনাব আতিথ্য ভোগ কবা আমাব পক্ষে অন্তর্চিত হবে।...’

এইবাব স্মিত্রা ভাবি বিস্মিত হইল। কহিল, ‘আমি কিছুই বুঝতে পাবচিনে।’

বজ্ত কহিল, ‘আমি আপনাব প্রেমে পড়েছি। অবস্থাস্থ বকম প্রেমে পড়েছি—’

স্মিত্রা প্রায় চম্‌কাইয়া উঠিল। অবিশ্বাসেব দৃষ্টিতে চাতিয়া সামান্য তিবস্কাবেব স্ববে কহিল, ‘এ কি কথা।’ এ সব কি, বজ্তবাবু?’

বজ্ত কহিল, ‘সত্যসত্যই যদি প্রেমে পড়ে থাকি, তবে সেটা না-জানিয়ে আপনাব সঙ্গ উপভোগ কবা কি আমাব উচিত হতো? এ তো এমন মনোবৃত্তি নয়, ইচ্ছা কবলেই যাব গলা টিপে শেষ কবে দেওয়া যায়। কাজেই অকপটে আমার মনোভাব আপনাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া

উচিত। ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে অনায়াসেই দূর হয়ে যেতে বলতে পাবেন।’

‘বজ্রতবাবু!—’

‘আমার দিক থেকে এ-সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, স্মিত্রা স্মিত্রা। এ হৃদযাবরণের গতিশেষ কবাব আমার পক্ষে অসম্ভব। মনকে আপনার কাছে প্রকাশ না-কবে আমার উপায় ছিল না। এইবাব ভেবে দেখুন, বব দেবেন, না, শাপ দেবেন। দাই দেন, বাগ কববো না। পবেব ইচ্ছাব ওপর জুলুম কবাব আমার স্বভাব নয়।—আমি কি চলে যাব?—’

স্মিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়ভাবে কহিল, ‘এ সব কি ছোলমা-ভুগি আবস্ত কবেচেন—এ কি আপনার উচিত হচ্ছে? ক’দিন আপনার সঙ্গে আমার পবিচয়? না, না, ছি। আপনি বস্তন, এষ্ট প্রকৃতিস্থ হোন—আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসি।’

বজ্রত অন্তশোচনাহীন কাণ্ড কহিল, ‘দেখুন, স্মিত্রাদেবী, আচম্কা প্রেমে পড়া আমার স্বভাব নয়। এমন কি, সাধাবণেব চাইতে সংযম-বোধ বা ভাব্যতা-জ্ঞান আমার হয়তো একটু বেশিই হবে—অন্তত কম নয়—’

স্মিত্রা বজ্রতের দীপ্ত যুগের দিকে একবাব চাহিল। ধীরে কহিল, ‘কিন্তু হঠাৎ এ কি আবস্ত কবলেন?’

বজ্রত কহিল, ‘আপনাকে দেখা অবধি এই যে রাতে আমি ঘুমোতে পাবি না, জেগে জেগে সর্কক্ষণ আপনাকে স্বপ্ন দেখি, সারাক্ষণ আপনার কাছে ছুটে আসতে ইচ্ছে হয়, .এ ব্যাধিব নাম বলতে পাবেন? এই যে, সাবাবিখে আপনাকেই একমাত্র—’

স্মিত্রা বাধা দিয়া কহিল, ‘একবার ভেবে দেখুন তো, ক’দিন আমাদের চেনা—না, না, বজ্রতবাবু, এ মোটেই শোভন হচ্ছে না। যে কাবণেই

হোক, আজ আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, আকস্মিককে—’

বজ্রত বহিল, ‘কে বললে আপনাকে আকস্মিক, কে বললে সামান্য ক’দিন ? এব পেছনে কত জন্মজন্মানুব পড়ে ব্যাচ, জানেন না কি ? ’

স্মিত্রা সংক্ষেপে কহিল—‘এ আলোচনা এখন থাক।’

বজ্রত বহিল, ‘স্মিত্রা অসহজ ভাষাটি কি ভদ্রতা ? মাসের মনটা কি এতই গেম যে, কতগুলি ক্রম নিয়ম চাপিয়ে তার নড়াচড়ার গতি বেঁধে দিতে হবে ? পাবচয় আমাদের অনেক দিনের নয়, শুধু এই অপবাধে কি আমরা জনগণকে অগাধ বনে প্রতিপন্ন করতে পার ?’

‘দেখুন,’ স্মিত্রা গম্ভীর হইয়া কহিল, ‘হৃদয় খেলা নিয়ে যাব কাল কাটাতে চাই, আম হৃদয়ের দলে নই—আপনি যদি আমাকে আর কিছু বেশি দিন জানতেন, তবে এ-ও আপনার অজানা থাকতো না। দেশের এই ঘোব দুর্দিনে ‘-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কি মাংসাব সময় ? কত মানুষের ব্যক্তিগত তুচ্ছ গুণ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ হবে’ তবে আমাদের আদর্শে পৌঁছতে হবে। এ যদি না কবি, তবে আপনার-আমার সঙ্গে ইতিব-সাধাংগেব তফাৎ কি ? না, না, বজ্রতবাবু, আসুন এখন একটু গান শোনা যাক।’ যেন কিছুই হয় নাই, উত্তেজনার কোনও কাণই নাই, এমনি সহজ স্বরে কথাগুলি বলিয়া স্মিত্রা ক্ষমা-স্বন্দব দৃষ্টিতে বজ্রতের দিকে চাহিল।

ইহাব পব অগ্র কাহারও মুখ তুলিবাব সাহস থাকিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু বজ্রত নিজে একটুও অপবাদী বোধ কবিল না, একটুও লজ্জিত হইল না। মুখটা পূর্বেব মতই উর্দ্ধাযিত কবিয়া সে কহিল—‘আমাকে প্রত্যাখ্যান কবতে পার, স্মিত্রা, কিন্তু আমার হৃদয়বেগেব আন্তরিকতায় অবিশ্বাস কবতে পারবে না। চাপল্য বলে একে অবহেলা কবতে পারবে না। একে তুমি ইচ্ছে হলে অভদ্রতাও বলতে পার, কিন্তু শহরে ভদ্রতা আমি শিখিও নি, শিখতে পারবও না।—তোমাকে চেয়েছি বলে তোমাব

ব্রত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব, এ-আস্রাব তো কবি নি, স্মিত্রা ।  
যদি বল, অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কবে থাকব—’

‘ছি। আজ কি হয়েছে আপনাব, বলুন তো ? আস্রন, মাথায় জল  
দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা কববেন । তখন নিজেবই হাসি পাবে ।’ প্রায় হাঙ্কা গলায়  
স্মিত্রা কহিল ।

‘আমার প্রার্থনা কি অসম্ভব ?’

‘হ্যাঁ । কিন্তু আব ও-কথা নয় । আব একটু চা আনি ?’

‘আমি এবাব উঠব ।’ বলিয়া বজ্রত উঠিয়া দাঁড়াইল ।

স্মিত্রা শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল, ‘ক্ষপেচেন ! বাইবে একবাব চেয়ে দেখুন,  
কি অসম্ভব বৃষ্টি হচ্ছে । এব মধ্যে কোথায় যাবেন ?’

‘বৃষ্টিকে আমি ভয় পাই না ।’

‘ভয় আপনি কাউকেই পান না, তা আমি জানি । কিন্তু ছি, এ  
কি ছেলেমানুষি, বলুন তো । শুধু ঐ এক উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি আমাব  
কাছে আসবেন, তা’ছাড়া আব কি কোনও সম্পর্কই হতে পাবে না ? না,  
না, বজ্রতবানু, আপনি ভয়ানক মাথা-পাগ্লা লোক । দেখুন তো, কী  
কাণ্ড । এই ঐর্ষ্য এক পাগলামি কবলেন—শেষ হতে না হতেই  
আবার এক নতুন ক্ষাপামি দেখাবাব জ্ঞাত মেতে উঠেচেন ।’ তাবপব  
হাসিয়া কহিল—‘প্রথমটা তবু নিবাপদ ছিল, দংশনেব কোন আশঙ্কা ছিল  
না । কিন্তু বৃষ্টি কি আমাব মতো সহজে বেহাই দেবে ।—ও কি হচ্ছে—না,  
কিছুতেই বেতে পাববেন না, কিছুতেই নয়—এই জলে ভিজে কিছুতেই  
আমি আপনাকে যেতে দেব না—’ বলিয়া টলায়মান বজ্রতেব পিছনে  
ছুটিয়া আসিয়া স্মিত্রা সদর-দবজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল । কহিল—‘যান  
দেখি এবার ।’

‘কে, বাবা বজ্রত ? বাইরে যে ভারি বৃষ্টি পডচে, এব মধ্যে যাবে কি  
কবে ?’



বজ্রত চম্কাইয়া তাকাইয়া দেখিল, সিঁড়ি দিয়া ক্ষৌমবস্ত্রপবিহিতা স্মিত্রাব বৃদ্ধা মা সত্ত্ব পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া অতিথি-সংকাবেব জগ্না নিচে নামিয়া আসিতেছেন।

‘ভেতবে চলুন।’—স্মিত্রা ঈষৎ হাসিয়া কহিল।

বিনা বাক্যবায়ে বজ্রত ঘবেব ভিতব পুনঃপ্রবেশ করিল।

গভীর বাত্মি পর্যাস্ত অশ্রাস্ত দাবায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, একবাবও থামিল না। স্মিত্রাব মা তুর্ঘ্যোগেব মধ্যে কিছুতেই বজ্রতকে চাডিয়া দিলেন না।

স্মিত্রা তুর্ধ্বমি কবিয়া কহিল, ‘ওঁল হস্টেলে নিশ্চয়ই থিচুড়ি হয়েচে, তাই থাকতে চাইচেন না। ভয় নেই, আমিও বাঁধতে জানি, চল্লুম আমিও থিচুড়ি চড়াতে। কিন্তু ওঁকে যেন পালাতে দিও না, সম্বদা। আমাব ওপব ভয়ানক চটে আছেন, সুরোগ পেলেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে জন্দ কববেন।’

সম্ব কহিল, ‘যাও বংসে, নির্ভয়ে থিচুড়ি কব গে। আজ একটা বিবাত তর্ক জমান হবে।’

‘তা আব হবে না,’ স্মিত্রা, কহিল। ‘বজ্রতবাবু যেমন দাঁতে দাঁত চেপে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়ে বসে আছেন, একটু পবেই কথাব প্লাবন ছুটিয়ে দেবেন।’

বজ্রত ততাত হইয়া কহিল, ‘আপনি কি সত্যি আমাকে না বাগিয়ে চাড়বেন না?’

‘একদিনে ত’বাব বাগলে স্বাস্থ্য থাবাপ হবে।’ বলিয়া মৃত তুর্ধ্ব হাসিয়া স্মিত্রা ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেল।

সন্তোষ শুইল স্মিত্রাব ঘবে, স্মিত্রা মাব সঙ্গে যাইয়া শুইল। সন্তোষেব বিছানায় শুইয়া বজ্রত সাবাটা বাত প্রায় জাগিয়া কাটাইল। কী অদ্ভুত

মেয়ে স্মিত্রা ! কী অসীম তার ব্যক্তিত্ব, কি অপরিণীত তার ক্ষমা ! বিশ্রী ঘটনাকে নিজ মহিমায় সে কী সহজ করিয়া লইল ! নিজেব আচরণের বিভৎসতা রজত এতক্ষণে টের পাইল । তার রুট অসৌজন্য কী অসীম ক্ষমায় উপেক্ষা করিয়া যে স্মিত্রা একান্ত সহৃদয়তাব সঙ্গে বজ্রের প্রাত অতিথিকৃত্য করিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে নিজেব প্রতি লজ্জায় এবং স্মিত্রাব প্রতি স্বগভীর শ্রদ্ধায় বজ্রতেব মন আগ্রুত হইয়া গেল । মনে মনে রজত কেবলই বলিতে লাগিল—মস্ত বড় আদর্শেব জগৎ যে জীবনটাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছে, মন-দেওয়া নেওয়াব তুচ্ছ অধিকারকবতায় তাহাকে আমি ভাঙিতে গেলাম বোন দুঃসাহসে ।

কিন্তু বাত যতই বাড়িল পবাজয়েব স্তম্ভীকৃত লজ্জা বজ্রতকে যেন পাইয়া বসিল । মন-বলাইতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিবিয়া আসিবাব অগোবব তাহাক জীবন ভবিয়া বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে । স্মিত্রার সহৃদয়তা ককণা ছাড়া আব কি ! এই সহৃদয়তা স্মিত্রাব ব্যক্তিত্বেব কাছে তাব নিজেব ব্যক্তিত্বেব একান্ত পবাজয়েব অবিসংবাদী নিদর্শন । উত্তেজনাব অতিশয়ে বিচানা হইতে বাব বাগ উঠিয়া বজ্রত যাব এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত অস্থিবভাবে ইটাইটি করিল ।

পবদিন ঘুম ভাঙিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বজ্রত দেখিল, প্রভাতেব অজস্র সোনালী আনো খোলা জানালা দিয়া ঘবেব ভিতবে ঢুকিয়াছে । শুনিতে পাইল, দবজাব বাতিবে কে একজন অতিশয় মূহু টোকা দিতেছে । বজ্রত তাড়াতাড়ি দবজা খুলিল ।

‘ইচ্ছে কবেই ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম ।’ সহাস্তে স্মিত্রা কহিল । ‘মুখ ধুয়ে নিন্, চা হয়ে গেছে—’

চায়েব টেবিলে পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে স্মিত্রা কহিল—‘আচ্ছা, সন্তুদা, ক্রীতদাসদেব মর্যো যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাকে কি তুমি অভিপ্রেত বিবাহ বলতে পার ? অপমানেব ঘানিতে সে-মিলন কি কখনও

হৃন্দর হয়ে উঠতে পারতো? হতাশায়, বেদনায়, পরাধীনতায়, অকরণ অপমানে মাথুষেব যা হৃন্দরতম রুত্তি, কী মর্যাদিত্তিক ভাবে তা নিপীড়িত হতো এ-সব মাথুষ-পণ্যদের মধ্যে ।—’

সজ্ঞ কহিল, ‘কিস্ত জীব-প্রকৃতিব কথা বলতে গেলে, সর্বক্ষেত্রেই বিবাহকে একটা স্বাভাবিক—’

‘অত্যন্ত অস্বাভাবিক করণ দুর্গটনা ।’ বলিয়া স্মিত্রা গম্ভীৰভাবে চায়ে চিনি মিশাইতে লাগিল ।

বজত কহিল, ‘আপনি কখনও পদ্মা দেখেছেন, সন্তোষবাবু ?’

‘হ্যা, একবার দেখাচি ।’

‘পদ্মায় যখন ঝড় ঘ’ঠ, তখন তা’র আব কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না । মাত্লামি ক’র’, পাত্লামি ক’র’, বে-পবোয়া নিষ্ঠুরতার সে তাণ্ডব কবতে থাকে ।—কিস্ত সেটাও পদ্মাব সত্য রূপ নয় ।—’

সন্তোষ বিস্মিত হইয়া কহিল, ‘এ কথাব তাংপয়া ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না । মানে, আপনি কি বলতে চান্, কাল বাত্রেব ঝড়ে পদ্মায় সে বকম কিছু—’

‘হ্যা, ঠিক তাই ।—আমাব হয়ে গেচে, আমি আজ উঠি । নমস্কাব ।’ বলিয়া বজত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আব কোনও দিকে না চাহিয়া ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেল ।

স্মিত্রা নিশ্চেষ্ট হুঙ্ক হইয়া বহিল, নড়িল না, আগাইয়া দিতে গেল না ।

## এগারো

ইহাব তিন দিন পবে থববেব কাগজেব এক কোণায় এই সংবাদটুকু বাহিব হইল :—

বিক্রমপুবেব স্বনামধন্য জমিদাব স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুৰিব পুত্র বজত-প্রসন্ন চৌধুৰি গতকল্য চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কল্‌ক পিকেটিং এবং

সাধারণ জনতাকে বে-আইনী কাজে প্রবোচিত কবিবাব অভিযোগে নয় মাস বিনাশ্রম কাবাদেও দণ্ডিত হইয়াছেন। বাংলাব জমিদারদেব মধ্যে সম্ভবত ইনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলেন।

জেলের ভিতবে প্রবেশ কবা মাত্র বহু পবিচিত বন্ধু আসিয়া বজ্রতেব চতুর্দিকে ভিড কবিয়া দাঁড়াইল। জীবনেব এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার প্রথম মুহূর্তে এতগুলি চেনা মুখ দেখিয়া বজ্রত সত্যই আশ্চর্য বোধ কবিল। মনে হইল, আশ্রয়দেব মধ্যেই আসিয়াছে, জেল কিছু ভয়ঙ্কর জায়গা নয়।

বন্ধুদের কেহ কহিল—‘বজ্রত, এসেছিঁস, ভাল কবেচিঁস। তোকে ছাড়া কিছুতেই আড্ডা জমছিল না।’ কেহ কহিল—‘শাওয়া-বদলাতে এলি? জয়গাটাব স্বাস্থ্য চমৎকাব।’ অগ্ৰজন বলিল, ‘আব ঘ্যাট্ খেয়ে মুখও বদলাতে পাববি—ঘ্যাট্ দি গ্রেট্।’ ঘ্যাট্‌এব নামে একদিন কবিতা লিখব্।’

এমন সময় পিছন হইতে লোহাব মত শক্ত এক জোড়া হাত বজ্রতেব কাঁধ ধবিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। চমকিয়া ফিবিয়া সে দেখিল—সমব। উল্লাসে বজ্রতেব অন্তর ভবিয়া উঠিল।

সমব তাব প্রথমত বসন্তীন তীব্রকণ্ঠে বজ্রতােব ভঙ্গিতে শুরু কবিল, ‘কেমন, বলতাম কি না নোমাদেব যে, কংগ্রেস একটা আশু বুজ্জিয়া প্রতিষ্ঠান। ক্যাপিটালিস্টদেব একটা নিল্‌জ্জ আখ্‌ডা। নইলে এই বকম হোপলেস্‌ ধনিক কখনও কংগ্রেসেব জন্তু জেলে আসতে পাবে?’ বলিয়া গম্ভীরভাবে বজ্রতকে টানিয়া একান্তে লইয়া গেল। কহিল—‘বাঁচলাম, বজ্রত। পেট্রোনাইজ্‌ না-কবতে পেবে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম—’

বজ্রত কহিল, ‘কিন্তু এখানে কি পেট্রোনাইজ্‌ কববি?’

‘কেন’, সমর অম্লান বদনে কহিল, ‘তোরা এলাউয়েলটা তো আছে।’

‘আব আমি কি খাব?’

‘সে ভাবনা আমার নয়।’ আমার পেট ভরা চাই তো, না, চাই না? অদ্ভুত লোক যা হোক!—ভাতাব টাকা কি রকম ছোটলোকের মত কমিয়ে দিয়েচে, দেখেচিস্ তো? হাড় কিপ্টে। জানিস্ আগে ভাতাব হাবেব কোনও কড়াকড়িই ছিল না। শুনতে পাই, আমার খাওয়াব বহব দেখেই নাকি প্রেণ্টিন ভড্কে গেছে।’

বজ্রত হাসিয়া কহিল, ‘তা চেহারাখানাব বাড়তি দেখেই টেব পেয়েচি! সাবাদিন নিষ্কর্ষাব মতন বসে বসে কি কবিস্? দিন কাটান্, কি কবে? এখনও তেমনি বকব-বকব কবিস্?’

সমব সগর্বে কহিল, ‘কবিনা আবাব।’ নিশ্চয় কবি। বকে’ বকে’ জেল-কর্তৃপক্ষেব মাথা খাবাপ কবাবাব উপক্রম কবেচি—এ-রকম অতিংস অস্ত্র আব ছুটি নেই। তবে ‘স্বপাব’ ভয় দেখিয়েচে, এত বেশি বকলে ‘সেলে’ ঢুকিয়ে দেবে।—তা দিক না, ‘সেলে’ব দেওয়ালগুলিকেই অতিষ্ঠ কবে’ তুলব। যাকে বলে শব্দব্রজ।’

কয়েক দিনেব মন্যেই বজ্রত জেলের জীবনের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মানাইয়া লইল। বাহিবেব মুক্ত আকাশ, মুক্ত আলোব জগ্ন মন কখনও কখনও আকুল হইয়া উঠে সত্য, শাস্ত্র-প্রাস্তবেব উদাব বিস্মৃতিব জগ্ন একটা স্তৌত্র বৃত্তাঙ্গ কখনও কখনও চঞ্চল কবিয়া তোলে, তবু এতগুলি শিক্ষিত স্তম্ভ মনের সাহচর্য্য সত্যই লোভনীয়। কত উঁচু বিষয়ে তাবা তর্ক কবে—বাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন—কত মধুব কণ্ঠে কবিতা পাঠ হয়, কত মনীষীর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা চলে, কত কৌতুক-পবিত্রাসে বন্দী-জীবনের দুঃখ তারা হাঙ্কা কবিয়া লইতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সব চাইতে বেশি বজ্রতকে যাহা এই বন্দী-দশাব মধ্যে বহন

করিয়া লইতেছে তাহা এই :—দেশের জন্ত জেলে যাইবার যে সাহস সে কিছুতেই এতদিন সংগ্রহ করিতে পাবে নাই, শ্রমিত্রার জন্ত ভালোবাসা সেই সংলাহস তাহাকে দিয়াছে। এইবাব শ্রমিত্রার কাছে আব সে পবাজয়েব লজ্জা বোধ করিবে না। তুচ্ছ মন-দেওয়া-নেওয়ার উর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা যে রজতের আছে, তাহা শ্রমিত্রা এইবার নিশ্চয়ই বুঝিবে। আবাব যদি কখনও তাব সঙ্গে বজ্রতেব দেখা হয়, তবে বজ্রত সগোববে মাথাটা উঁচু কবিয়া দাঁড়াইতে পাবিবে, বাক্য-হীন ভাষায় বলিতে পাবিবে—‘আমি ভীক নই, নেকদণ্ডহীন নই। আমার শ্রেম চপলতা মাত্র ছিল না। ত্যাগ করিবাব ক্ষমতা আমাবও আছে।’

সপ্তাহখানেক পবে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। একদিন ওয়ার্ডার আসিয়া খবব দিল—একজন মহিলা তাব সঙ্গে দেখা করিতে চান। দুদিন আগে সত্যানন্দ আসিয়াছিলেন, সত্যানন্দ তাব কত বড় শুভকাঙ্ক্ষী তাহা জানিত বলিয়া রজত ইহাও জানিত যে, খবব শুনিলেই তিনি ছুটিয়া আসিবেন। কিন্তু হঠাৎ একজন মহিলা দেখা করিতে চান শুনিয়া সে খুবই বিস্মিত বোধ কবিল।

ভিসিটস-রুমে যাইয়া বজ্রত দেখে, একটা চেয়ারবেব হাতলে ভব কবিয়া উদ্ভিগ্ন-চোখে দবজাব দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শ্রমিত্রা। বজ্রত নিজেব দৃষ্টিকেই প্রায় বিশ্বাস কবিতে পারিল না। একপ ঘটনা সম্ভব মনে করিতেও সঙ্কোচ হইল।

একটা পাণ্ডুব-মধু হাসি ফুটিয়া উঠিল শ্রমিত্রাব মুখে—অদ্ভুত একটা অশ্রুজলে-মেশান হাসি। মৃদুকণ্ঠে কহিল—‘রজতবাবু, এ দায়িত্ব আমার, এ গর্বও আমার।—দাঁড়ান, আগে একটা প্রণাম করি—’

‘এ কী!’ স্তম্ভিত হতভম্ব রজত বিশ্বযোক্তি করিল।

প্রণতা শ্রমিত্রা একটি স্পন্দিত ভীক লতার মত উঠিয়া সমুখে দাঁড়াই-

যাচ্ছে। চোখের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে চোখ, 'একটা অকথিত বেদনায় স্মিত্রাব ঠোট বাবস্বার কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নিজেকে কিছুটা সংযত কবিয়া স্মিত্রা কহিল—'সেদিন আঘাত কবে' ফিবিয়া দিয়াছিলাম। ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। সেই সাড়া দিতে আজ এইখানেই আসতে হলো। . 'সামান্য ক'দিনে একটা যুগ পাব হইয়া আসার ইতিহাস উহু রাখিবাব চেষ্টায় স্মিত্রা তাড়াতাড়ি ওদিকে মুখ ফিরাইল।

'পদ্মাব ডাকে সাড়া না দিবে উপায় নেই, স্মিত্রা।' বজ্রত উদ্ভাসিত মুখে কহিল।

সাত দিন গবে এক নবাগতের মুখে খবর পাওয়া গেল—স্মিত্রার ছয়মাস জেল হইয়াছে। স্মিত্রা জেলে আসিবে, বজ্রতকে বলিয়াই গিয়াছিল। সহাস্তে বলিয়াছিল, 'অন্তেব ছেলেদের জেলে ঠেলে পাঠাব, আব নিজে আসব না, এও কখনও হতে পাবে।'

বজ্রতের সকল বন্ধন-বেদনা দূর হইয়া গেল। যাহা মাহুষকে সঞ্জীবিত কবে, জীবনকে লোভনীয় কবে, সেই প্রেম, সেই আশা, নদীব স্রোতের মত অমিত দাক্ষিণ্যের সঙ্গে জীবনের বন্ধে বন্ধে প্রবেশ কবিয়াছে। অন্তবেব এই অনন্ত উচ্ছ্বাসে কাবাগাবের লৌহদণ্ডগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। খোলা মাঠ এবং রাখালের বাঁশি, পাল-তোলা নৌকায় স্বচ্ছন্দ জলযাত্রা, চন্দ্রালোকিত তালগাছেব ছায়াছবি এবং শস্ত্র-ক্ষেত্রের স্নগন্ধ বাতাস অবলীলাক্রমে কাবা প্রাচীর ডিঙাইয়া বজ্রতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

## বারো

অবিচ্ছিন্ন এক স্তম্ভুর স্বপ্নের মধ্যে রজতের দিন কাটিতে লাগিল। খালের জলে ডিডি ভাসাইয়া ছায়াগাছেব তলায় তলায় স্মিত্রাকে লইয়া সে বেড়াইল। জানালাব ধারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বৈশাখী ঝড়ের ক্ষুদ্র দাপটে বনভূমির করুণ নিগ্রহেব দিকে চাহিয়া বহিল। সোনাব শরতে পূজাব শানাইয়েব শব্দ শুনিয়া একসঙ্গে দুজনেই পুলকিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কত নতুন বাড়ি যে রজত তৈরি কবিল, তার সীমা সংখ্যা নাই। কত বিচিত্র তাদের স্থাপত্যভঙ্গি, কত বিভিন্ন তাদের পবিবেশ। স্মিত্রাকে পাশে লইয়া গেল সে সমুদ্রতটে—বালুব উপর দিয়া সহাস্তে ছুটাছুটি কবিল। শৈল-নগবীব পাইন-সঙ্কুল অসমতল সর্পিণ-পথ দিয়া স্তম্ভুর কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইয়া ফিবিল।

একটা অভূতপূর্ব গর্ক, একটা অসম্ভব গৌববে বজ্রত স্পন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে পবাস্কিত হয় নাই, সে জয় কবিয়াছে। এত বড় জয়লাভ জগতেব সর্বশ্রেষ্ঠ বর্কব সম্রাটেব পক্ষেও কোনও কালে সম্ভবপব হয় নাই। কিন্তু মনের এই অপূর্ব উল্লাসেব কথা সে বাবও কাছে প্রকাশ কবিল না—এমন কি সমবেব কাছেও নয়। এ আনন্দ অতি পবিত্র, অতি স্পর্শভীক। অগ্ন কাহাবও দৃষ্টি ইহাব সহ্য হইবে না। ইহা থাকুক তাহাব গোপন অন্তরে—এক স্তগোপন পুলকে সে একা একাই ঝঙ্কত হইয়া উঠিবে, এ পুলকের ভাগ দেওয়া তাহাব পক্ষে সম্ভব নয়।

ন'টা মাস যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, রজত প্রায় টেবই পাইল না। যেদিন তাব কারাবাসেব মেয়াদ ফুবাইল, সেদিন সে সত্যসত্যই চম্কাইয়া উঠিল—মুক্তির আদেশটা যথাসময়েব অনেক পূর্কেই হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।



সন্ধ্যার মুখে রজত ছাড়া পাইল। জেলের ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখে, বৃদ্ধ সত্যানন্দ উৎসুক চোখে দাঁড়াইয়া আছেন। পিতৃবন্ধুর জ্ঞাননিবিড় শ্রদ্ধায় রজতের মন পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া রজত তাঁহাব পায়ের ধুলা লইল।

সত্যানন্দ তাহাকে বৃকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, ‘পদ্মার ঋণ তোমার শোধ হয়েছে। এইবাব বাড়ি চল—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।’

গাড়ি ভিতবে মন্দালিকা বসিয়াছিল। বজ্রতকে দেখা মাত্র তাব চোখ দুইটা কান্নায় ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু বজ্রতের বুকিতে বাকি রহিল না। মোটরভে ভিতবে প্রবেশ করিতে করিতে সে পবিত্রাস-তরল’ কর্তে কহিল, ‘এই যে ঠাকরুণ, জেলের দবজা পর্যন্ত আসা হয়েছে—আবও একটু ঠেলে দিয়ে যাব নাকি? অনেক সীট খালি আছে।’

মন্দালিকা ম্লান হাসিয়া কহিল, ‘গায়ে কি তোমাব ততটা জোর এখনও আছে, বজ্রতদা? কী যে বোঁগা হয়ে গেচ, একবাব আয়নায় দেখবে চল।’

‘দুব, তাও কখনও হতে পারি। ঘ্যাট খেতাম না? ঘ্যাট আগা-গোড়া ভাইটামিনে ভবা—কিন্তু শোন, এখন আমি তোমাদেব বাড়ি যেতে পারব না। পথে আমাদের নামিয়ে দিতে হবে—’

মন্দা কহিল—‘ঈস্। তাই না আবও কিছু। তা হবে না।’

সত্যানন্দও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, ‘না, রজত, কাজ এখন থাক। এখন বাড়ি চল।’

বজ্রত সামান্য দ্বিধা’ কবিয়া কহিল, একবাব না নেমে গেলে আমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। যদি অসুখমতি দেন, একটু নেমে যাব ..’

সত্যানন্দ একবাব বিস্মিত দৃষ্টিতে বজ্রতের মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, ‘বেশ, কোথায় তোমাকে পৌছে দিতে হবে বলো?’

মন্দালিকা 'অসম্ভব' করে কহিল, 'এই ময়লা কাশড়-জামাও বদলাবেন না ?'

'তাও কখনও বদলাই।' বজ্রত তবলকঠে কহিল। 'জ্বলে গিয়েছিলাম তবে কেউ বিশ্বাস করবে ?'

পদ্মপুকুবেব কাছাকাছি এই একান্ত অকৃত্রিম স্তম্ভদের ক্ষুণ্ণ কবিয়া বজ্রত মোটর হইতে নামিয়া পড়িল।

জেল হইতে ছাড়া পাইয়া সর্বপ্রথম স্তমিত্রাব কাছে যাইবে, এই প্রতিশ্রুতি স্তমিত্রা যেদিন বজ্রতের সঙ্গে জেলে দেখা কবিতে আসিয়াছিল, সেদিনই বজ্রত দিয়াছিল। স্তমিত্রা নিশ্চয় বসিয়া আছে তাহাব প্রত্যাশায়। জানালা দিয়া উৎসুক-চোখে সে বাববাব পথেব দিকে চাহিয়া দেখিতেছে নিশ্চয়। আব কি, বিলম্ব কবা চলে ? প্রতিশ্রুতি বজ্রতকে রক্ষা কবিতেই হইবে। যে-মিলনেব স্বপ্নে সুদীর্ঘ নয় মাস কাবা-জীবন বজ্রতের কাছে একটা বড্ডিন আনন্দেব মতো কাটিয়া গিয়াছে, যে-মিলন তাব কামনায়, প্রেমে, হৃদয়েব সমস্ত অকথিত বাণী এবং অগীত সঙ্গীতে স্পন্দিত হইতেছে, তাহা সার্থক হইতে আব দেবি নাই—মনের এ-চাঞ্চল্য আর দমন করা যায় না। বাস্তাটা ক্রমেই যেন অধিকতর বিলম্বিত দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

স্তমিত্রা, কোন্ পূর্বজন্ম হইতে তুমি আমাকে অন্তসরণ কবিয়া ধবণীতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছ ? জন্মজন্মান্তরেব কোন্ অদ্ভুত আকর্ষণে তোমাব কাছে আমি ছুটিয়া আসিলাম ? কোন্ সজ্জদয় দেবতা আমাদের জন্ত এত আনন্দ-আবেগের ব্যবস্থা কবিলেন ?

গ্যাসালোকিত ফুটপাথ, মর্ম্মবিত পথতরু-শাখা, আলোবিচ্ছুবিত বাতায়নগুলি বজ্রতের নিকট বড্ডিন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঐ তো ল্যান্ডাউন বাজার, গাড়িব স্ট্যাণ্ড, তারপর ঐ দিকে ম্যাডক্স স্কোয়ারেব বাস্তা, তাবপর—সর্বনাশ ! আব একটু হইলেই মোটর-চাপা

পড়িত। স্মিত্রা। স্মিত্রা! তোমার হুঁচোখ হইতে তুমি আমায় প্রথম কি অভ্যর্থনা বর্ষণ করিবে, তাহা আমি কল্পনা করিয়া চলিয়াছি। বাবান্দাব বেলিঙের উপর কেমন করিয়া ঝুঁকিয়া থাকিবে, তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাউতেছি। স্মিত্রাস্ত্রে তোমাব মুখমণ্ডল সহসা কেমন বাড়িয়া উঠিবে, তাহা পূর্বাঙ্কেই আমি দেখিতে পাউতেছি।

বজ্রত দ্রুত হাঁটিয়া চলিল। বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে, এইবাব আশ্রয় পাউবে।

দূর হইতেই বহুপ্রাণিত বাড়িটা দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিল, অন্ধকার। নিকটবর্তী হইল, দেখিল—অন্ধকার। আলোব সামান্যতম আভাস পর্যন্ত নাই। কাছে আসিল, দেখিল—অন্ধকার। উদ্বেজনায বজ্রত হাঁপাউতে লাগিল। বাড়ি ভুল কবে নাই তো? না, না,—ঠিক এই বাড়ি। বাড়ি ভুল কবা তাব পক্ষে অসম্ভব—

স্থলিতপদ বজ্রত দৌড়িয়া গেল। সদব-দবজায় দুর্বল কম্পিত হস্তে আঘাত করিতে লাগিল—কোনও সাড়া আসিল না।

‘সন্তোষ বাবু—সন্তোষ বাবু—সন্ত-দা—স্মিত্রা—স্মিত্রা—’

প্রতিধ্বনি ছাড়া কোনই জবাব আসিল না। চেতনাব যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সংহত করিয়া বজ্রত আবাব প্রাণপণে দবজায় আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে অস্থির হাতে একবাব একটা আঘাত পাইয়া চাহিয়া দেখিল, ড়্যাবে তাল। বন্ধ।

কাল-বৈশাখীষ ঝড়ে বনবনাস্ত্রবের বক্ষ ভেদ করিয়া যেমন করুণ দীর্ঘশ্বাস বাহিব হইয়া আসে, তেমনি একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস বজ্রতেব বৃকেব মধ্য হইতে যেন পাজবাগুলি ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া বাহিব হইয়া আসিল। মাতালেব মত টলিতে টলিতে সে অদূরবর্তী মুদিব দোকানেব দিকে আগাইয়া গেল।

‘আচ্ছা, ঐ বাড়িতে ষাঁরা ছিলেন, তারা কোথায় গেছেন, বলতে পার ?’

মুদি নিকেলের চশমা নাকের অগ্রভাগে বসাইয়া হিসাব দেখিতেছিল।  
প্রশ্ন শুনিয়া চোখ উঠাইয়া কহিল—‘কি চাই, বলেন ?’

‘ঐ কোণাব বাড়িতে ষাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোথায় গেছেন, বলতে পার ?’ বজ্রত কম্পিত গলায় প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি কবিল।

‘তাঁরা উঠে গেছেন।’

উঠে গেছেন। ‘কোথায় ? কবে ?’

‘তা প্রায় মাস দেড়েক হবে বৈ কি—সেই যে মেয়েটি মাঝা গেল, তারপরই উঠে গেছেন—’

‘মাঝা গেল।’ বজ্রত আশ্চর্যজনক কবিল। ‘কে মাঝা গেল ?—’

‘ঐ যে, মোশায়, স্বন্দর দেখতে মেয়েটি ছিল—যিনি স্বদেশী কবতেন। বড় দুঃখের কথা—তবে বুঝলেন না, মোশায়, সবই ভগবানের হাত। জেল থেকে বেবিয়ে এল। দিব্যি চলাফেরা কবচে। তাবপব দেখি, দবজায় কেবলই মোটর আব মোটর। শুনলুম, নিমুনিয়া হয়েছে। তিকিচ্ছেব তোডজোড খুবই চল্লো, তা হলেই আব হবে কি—একদিন সব ফর্শা হয়ে গেল। ষাকে কর্তা নিজে টানেন—ও কি, ও রকম কবচেন কেন।—  
আ্যা—কি—হলো কি—’

বজ্রত উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতেছে। অসম্ভব এক তড়িৎ-শক্তি যেন তাহাকে অধিকার করিয়াছে। ছুটিতে ছুটিতে সে ম্যাডক্স স্কোয়াবে ঘাইয়া প্রবেশ করিল, এবং বিলীযমান দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সমুখের শূন্য বেঞ্চটা আবিষ্কার করিয়া তাহার উপর হুডমুড করিয়া পড়িল। পবক্ষণে তাহাব সংজ্ঞা রহিল না।

অদৃশ পদ্মা অদৃশ পথে আসিয়া আবাব বজ্রতের বাড়ি ভাঙিয়া দিল।

## ভেরো

মঞ্জরী বাঘের বিবাহ হইয়াছিল এক ঘোবতব সাহেবের সঙ্গে। রঙটা কালো হওয়া ছাড়া তাব সাহেবিয়ানায় বড় রকম আব কোঁনও ক্রটি ছিল না। ভাবে ভঙ্কিতে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে মিষ্টাব সুবিমল পালচৌধুরি তাব তিন বছরের বিলাত প্রবাসটাকে এমন তীব্র মুষ্টিতে আঁকুড়াইয়া ধৰিয়াছিলেন যে, বিলাতেব খানিকটা তাব সঙ্গে এদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মঞ্জরী অবশ্য অত্যন্ত গৰ্ভসহকাবেই ব্যাপাবটাকে গ্রহণ কৰিয়াছিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে দেখিতে পাইল যে, তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও উগ্র বিলাতিয়ানাতে সে কিছুতেই বশ হইতে পারিতেছে না।

সুবিমল পালচৌধুরি স্বদেশ হইতে সিভিলিয়ান হইবাব সং সঙ্কল্প লইয়া বিলাত যায়, কিন্তু সঙ্কল্প সাধু হইলেও তাহা সঙ্কল্পই বহিয়া গেল। অবশেষে অগতিব গতি বিলাতেব ওকালতি পাশ কৰিয়া সে দেশে ফিবিয়া আসিল এবং জীবনের এই বার্থ আশাব প্রতিশোধ তুলিল দুৰ্ভাগ্য ভাবতবধেব উপব। কিন্তু এ-চটক যে-সব ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় এবাবেও সেখানে কাজে লাগিল, মঞ্জরী পিতৃগৃহ হইতে পালচৌধুরি ফ্যাটে স্থানান্তৰিত হইল।

বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল হনিমুন্ ও উইক্-এণ্ড শৈল-বিহাব দিয়া। সাহেবি হোটেলে ডিনাব ও বিলাতি সঙ্গীতেব বিসাইটেলে হাততাপি দেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক বোডে মোটব ছুটাইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা সততই চলিত। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, দেখা গেল—উইক্-এণ্ড বেডাইতে গেলে অনর্থক পয়সা খবচ হয়, বিলাতি হোটেলেব ডিনাব অযথা মহাৰ্ঘ্য, বিলাতি

সঙ্গীত অনাবশ্যক কোলাহলমুখর এবং গ্রাণ্ড-ট্যাক্ রোডেব মক্ষণ অশেষ পথে গাড়ি যতই ছুটিয়া চলে পোট্রোলেব ট্যাক্ ততই খালি হইয়া উঠে । সুতবাং জীবনযাত্রাব সংস্কার প্রয়োজন হইয়া পড়িল ।

কিন্তু স্বভাব অত সুশীল ছেলে নয় । ইচ্ছা কবিলেই মানুষ তাব হাত হইতে বেহাই পায় না—এবং স্বভাবের এই দৌবাখ্যা মিঃ পাল চৌধুরিকে এখনও প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাহেবি বেস্তুবার কক্ষে কখনও একা কখনও বা সঙ্গীক ঘুবাটয়া ফিরায । তবে আজকাল সে ডিনার খাটিতে যায় না—অব্কেস্ট্রাপনিত ‘বুফে’তে পুরুগদি-সংযুক্ত চেযাবে গর্গসহকাবে বসিয়া আইস-ক্রিমেব অর্ডার দেয় ।

আজও সে সঙ্গীক আইস-ক্রিমেব সন্ধানে আসিয়াছিল । কিন্তু আইস-ক্রিমেই তাব তর্ক সীমাবদ্ধ ছিল না—দুই বাটি ক্রিমেব সমুখে বসিয়া পালচৌধুরি স্ত্রীব নিকট নানাপ্রকার বসাল কক্টেল প্রস্তুতিব বিন্ময়কব প্রণালীগুলি গর্গসহকাবে ব্যাখ্যা কবিতে শুরু কবিয়াছিল । মঞ্জবী এতে কোনও আনন্দ পায় না, কিন্তু তবু তাকে আগ্রহ প্রকাশ কবিতে হয়—সাহেবের সহধর্মিণী হওয়াব ইহা তরুহ সৌভাগ্য ।

পালচৌধুরি কহিতেছিল, ‘ওয়াইন বল্লেই এদেশেব লোক লাক্ষিয়ে ওঠে—যেন মদ সত্যই কিছু অম্পৃশ্য পদার্থ ।—কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ভয় মদেব নয়, মদেব কোয়ালিটির ।—যে-কোনও সিভিলাইজড্ দেশেই দেখতে পাবে, ওয়াইন্ একটা অপরিহার্য্য পানীয়—পেপ্, ভিম্, ডিলাইট । ধবো না, শ্যাম্পেন—শ্যাম্পেন-পান যদি গহিত হয়, তবে চৃষন আবণ্ড গহিত, তবে লভ্ একটা ঘৃণিত—ওঃ, ডিযাব । কাণ্ড দেখচো ঐ বাঙালি ছোকরাটার ?—গ্রাসের পব গ্রাস, বোতলের পব বোতল, কেমন অবলীলা-ক্রমে গলা দিয়ে পাব কবে দিচ্ছে । মত্ত-বসিক বটে ।’

তখন কোতূহলী হইয়া মঞ্জবী ঘাড় ঝাঁকাইয়া চেযাবেব পশ্চাৎদিকে তাকাইল, এক তাকাইয়া অবাক হইয়া গেল । দেখিল, তাহাদেব টেবিলেব

অদূরে ছোট একটা টেবিলের সমুখে বসিয়া বজ্রত মদের পূর্ণ গ্লাস মুখে  
মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। টেবিলের উপর আবও দুতিনটা বোতল। বজ্রত  
কোনও দিকে চাহিতেছে না, পেগ্‌ ঢালিবাব জগ্‌ অপেক্ষমান ওষেটাবের  
সাহায্য নিতেছে না। তাব সমুখে কোনও খাণ্ড নাই—এমন কি মদের চাট্‌  
হিসাবে বাদাম-ভাজা প্রভৃতি যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সে একদিকে  
ঠেলিয়া বাখিয়াছে। শুণ্ড স্থানিত-হস্তে মগ্‌পূর্ণ গেলাস ঠোঁটের কাছে আনিয়া  
ধবিতেকে—এমন কি প্রভোক্তাব সোড়া মিশাইবাব কথাও তাব মনে  
হইতেছে না।

আলুখালু বজ্রতের দীর্ঘ চুল। বক্তলেশহীন মুখে যেন শতাব্দীর  
অবসাদ আসিয়া ভিড় করিয়াছে। 'আমীলিত চোখ দুটিতে বুঝি দৃষ্টিশক্তি  
অবশিষ্ট নাই। হতভম্ব বিষয়ে এবং বেদনায় মগ্‌বী কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাব  
দিকে নিম্পলক চোখে চাহিয়া রহিল। তাব মনে হইতে লাগিল, বজ্রত  
যেন সজ্‌ এক কবব হইতে উঠিয়া আসিয়াছে ; সে যেন মানুষ নয়—  
স্বাস্থ্যদীপ্ত, প্রাণচঞ্চল, শক্তিমান বজ্রতপ্রসন্ন যেন যবিয়া ভূত হইয়া সহসা  
এই দীপালোকিত উৎসব-মুখরিত ভোজনাগাবে জীবিত মানুষদের চম্‌কাইয়া  
দিবাব জগ্‌ উপস্থিত হইয়াছে।

পালচৌধুরি কহিলেন, 'ও বকম ভাবে তাকিও না। ও বকম করে  
মাতালদের দিকে তাকাতে নেই—বলা যায় না, ওদের কোন্‌ খেয়াল গজিয়ে  
ওঠে—আই মিন্—ওদের প্রোভোক্তা কবাই নিরাপদ, কেননা, ওদের  
উইট্‌স্‌ ওদের কট্টোলে থাকে না— ও কি—কোথায় যাচ্ছো ?—'

মগ্‌বী চেয়াব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল—'তুমি একটু  
বস। আমি ওব সঙ্গ কথা কয়ে আসচি—'

সবিস্ময়ে পালচৌধুরি কহিলেন—'তুমি। ওব সঙ্গে। বলো কি।—'

মগ্‌বী কহিল, 'উনি বজ্রতবাবু। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। মদ  
খাবাব চেলে উনি নন্—কিন্তু এ কী ব্যাপাব। আমি তো কিছুই

বুঝতে পারচি না।’ বলিয়া মঞ্জরী ক্ষত হাঁটিয়া রজতের কাছে উপস্থিত হইল।

রজত একবার চোখ মেলিয়া চাহিল এবং বোতল হইতে গ্লাসটা পূর্ণ করিতে কবিতে নির্লিপ্ত নিমগ্নবে কহিল—‘বলুন।’

মঞ্জরী সমুখের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। কহিল, ‘এসব কি কাণ্ড, রজতবাবু? কবে আপনি মাতাল হয়ে উঠলেন?’

রজত গ্লাসটা মুখেব সমুখে উঠাইয়া একটু ইতস্তত কবিয়া নামাইয়া রাখিল। মৃদুস্বরে কহিল, ‘যা ভুলতে চান, তা যদি বাবে বাবে মনে পড়ে, মনে পড়ে’ তা যদি আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়—তবে আপনি কি করেন?—আপনি ভুলতে চান, কেমন? কি কবে’ ভুলবেন? বলুন, কি কবে ভুলবেন?’

‘না, না, রজতবাবু’, মঞ্জরী প্রায় মিনতিব কণ্ঠে কহিল, ‘এ ঠিক হচ্ছে না। কি হয়েছে বলুন? কেন নিজের আপনি সর্কনাশ কবচেন?’

‘নিজের কবি নি’, রজত স্থলিত কণ্ঠে সপ্রতিবাদে কহিল। ‘সত্যি, মাইরি বলচি, এ আমাব স্বকৃত স্বেচ্ছাকৃত নয়।—শত খুঁজেও যার আঙুলটা ছুঁতে পাবা যায় না, শত আক্ৰোশেও যাব চুলের ডগাটুকু ধবতে পাবব না, সর্কনাশ সেই স্বেচ্ছাচাবীব কীর্তি। ইনি আব কেউ নন, ইনিই আপনাদেব বিধাতা। তাঁব সঙ্গে কি কুণ্ডি কবা চলে—হি হি—চলে না। কিন্তু নিজেকে ইচ্ছেমত শায়েস্তা কবা চলে—খুব—’

‘রজতবাবু?’

‘বলুন।’

‘খুব বড় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেচে, আমি বুঝতে পারচি—নইলে এ আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। কিন্তু পুৰাতন সহপাঠিনীব এষ্ট অন্তরোধটুকু বাখুন, নিজেকে এমন করে নষ্ট করবেন না।—আপনি মন্ত



বড়, উজ্জল ভবিষ্যৎ আপনার সমুখে। দুঃখের আঘাতে এমন কবে লুটিয়ে পড়া কি আপনার শোভা পায়। ছি, বজ্রতবাবু!—’

বজ্রত প্রায় হাস্য কবিয়া উঠিল। কহিল—‘ভবিষ্যৎ! তাবই অল্প নাম মৃত্যু! অন্ধকার, বিলুপ্তি—হ্যা, বিলুপ্তি। কী হবে ভবিষ্যতেব পিছনে ছুটে? কোথায় পৌছিব? তাব চেয়ে এই তো বেশ!—’ একটা বোতল শূণ্যে তুলিয়া ধবিয়া বজ্রত সশব্দে তাহা টেবিলে সংস্থাপন কবিল। কহিল—‘এও বিলুপ্তি আনে, গভীর অবলুপ্তি। কোথায় যেন হাবিয়ে যাই। নিজেকে আব বয়ে বেড়াতে হয় না। চমৎকার! এরই নাম স্বধা। নাঃ, আপনাব অন্তবোধ বক্ষা করতে পাবব না—বড় নিশ্চয় আপনাব অন্তবোধ—বড় কঠিন—’

‘মঞ্জবী।’

মঞ্জবী পিছনে ফিবিয়া দেখিল স্বামীকে। পালচৌধুরিব চোখে-মুখে আশঙ্কা এবং উদ্বেগ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। মঞ্জবীব পাশে আসিয়া সে ব্যস্ততাব স্ববে কহিল—‘মঞ্জবী, বাড়ি চল।—’

‘বজ্রতবাবু—’

‘বাড়ি যান্।’ বড় নিশ্চয় আপনাব অন্তবোধ, বড় কঠিন—’

‘মঞ্জবী।’ পাল চৌধুরি ডাকিল।

‘এ উচিত হচ্ছে না, কিছুতেই উচিত হচ্ছে না, বজ্রতবাবু—’

‘উচিত-অনুচিত তফাৎ কোথায়, মিস্ বায়—তফাৎ কোথায়?’ বজ্রত প্রতিবাদেব স্ববে কহিল। ‘কে তফাৎ কবে, কে বিচার কবে? একটা তর্ক স্বন্দব জীবন চূর্ণ কবে’ দেওয়াব কি অধিকাব ছিল বিধাতাব? তবু তো হলো। এক মুহূর্তে সব চূর্ণাব হয়ে গেল।—উচিত বলে কিছু নেই—কিছু নেই। যদি উচিত বলে কিছু থাকবেই—মিস্ বায়—তবে কি এমন অবিচার, এমন কঠিন নির্দয় অবিচার ঈশ্বরের বাজত্বে—না, না, ঈশ্বর বলে কেউ নেই—বয়, বয়, ইধবু—’

‘মজরী !’

‘বাড়ি ধান, নমস্কার !’

‘রক্তবাবু !’

টলিতে টলিতে রক্তত যখন হোটেলের বাহিবে আসিল, তখন রাত প্রায় এগাবোটা। তাহাব অবস্থা তখন আব দাঁড়াইবাব মতো নয়। তাহার অবস্থা দেখিয়া পথিকেবা পর্যাস্ত একটু দূর দূর সবিয়া চলিল, এবং অনতিবিলম্বেই একটা লোক আসিয়া গেলাম কবিয়া মুহূষবে কহিল—  
‘গাড়ি হজুর ?’

বজ্রত চেষ্টা করিয়া চোপেব পাতা মেলিয়া লুঙ্গি-পবা সেই লোকটাব দিকে সক্রতজ্ঞভাবে দৃষ্টিক্ষেপ কবিল। কহিল, ‘গাড়ি ? গাড়ি কই ?’

একটা ফিটন-গাড়িতে অর্ধ-সংজ্ঞাহীন বজ্রতকে তুলিয়া কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া দিল, একবাব গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসামাত্র কবিল না। রক্ততও সে সম্বন্ধে কিছুই বলিল না, মাথাটা এক কোণায় এলাইয়া দিয়া সে নিশ্চিত হইল।

অনেকক্ষণ ধবিয়া চলিয়া, অনেক বাস্তা ঘূবিয়া অবশেষে গাড়ি পুৰাতন একটা দোতলা বাড়িব সমূখে দাঁড়াইল। গাড়োয়ান বোচবাস্ত হইতে নামিয়া আসিয়া সমূখেব সিঁড়ি দিয়া উপবে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন নামিয়া আসিল, তখন তার পিছনে পিছনে আসিল একটি সুখা-আঁকা-চোখ, ঘাগ্‌বা-পবা, ওড়না-ওড়ানো মেয়ে।

কোচম্যান চাপাস্বরে কহিল, ‘মালুম হোতা কি ইয়হ্ বহোত্ খানদানি বাবু হুয়, হুঁসিয়ারি সে চলনা, বাইজী।’

বাইজি কানের ঢুল নাড়িয়া কাঁধের ভঙ্গি কয়িয়া, ‘আচ্ছা বাত্’ বলিয়া গাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

‘আইয়ে, বাবুজী !’

গাড়ি থামিলে রজৎ ক্রমৎ জাগরিত হইয়াছিল। বাইজিকে দেখিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

বাইজি মুখে হাসি আনিয়া, আপ্যায়নের ভক্তি করিয়া পুনবাৎ মৃদু মিষ্ট স্ববে কহিল, ‘ভিতর চলিয়ে, বাবুজী ?’

বজ্রতেব বিশেষ কোনও ভাবোদয়ই হইল না। দৃষ্টিহীন চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া বহিল। তখন কোচমান আগাইয়া আসিয়া তাহার কানেব কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—‘হীবা বাইজী, হুজুব। অ্যায়সী খুবসুবত্ বাই ইয়েহ্ মহল্লেমে নহী হুয়—আইয়ে হুজুব।’ বলিয়া বজ্রতেব হাত ধরিয়া নামাইল।

‘বাইজী !’ বজ্রত স্থলিত-কণ্ঠে কহিল, ‘গান ? নাচ ? বাঃ । বাঃ । বাঃ ।’

বাইজীব উত্তত স্ফুটে হস্ত স্থাপন কবিয়া বজ্রত টলিতে টলিতে উপবেব ঘবে আসিয়া প্রবেশ কবিল।

‘তোমার নাম কি, শুনি ?’

‘হীবা বাইজী—পান কবমাইয়ে, বাবুজী।’

পকেটে হাত ঢুকাইয়া বজ্রত আন্দাজে একটা দশ টাকার নোট বাহিব করিয়া দিল।

‘তুমি গান গাও ?’

‘হী।’

‘নাচ ?’

‘হী।’

‘তবে নাচ, তবে গাও। ছোবুসে লাগাও। বাঃ, বেশ, বাঃ—বাইজি। চমৎকাব তোমাব নাম। হীবামন—হি হি—হীবামন। ঘুবে ঘুবে ঘুডুব বাজিয়ে নাচ।—সমস্ত পৃথিবীটা ঘুবে ঘুরে নাচছে—তুমিও নাচ, হীবামন—’

‘সাজ্জ্জ্ মাঙ্গায়ু’ ?—সংরেক্ষীওয়াল বোলাব ?’

‘বোলাও । যে যেখানে আছে সব ডাকো । দেখচো না, পৃথিবীটাই নেচে বেড়াচ্ছে, আমবাই কি শুধু বসে থাকবো ? নাঃ—কিছুতেই নয়—’

বাইজি এই অদ্ভুত মাতালের বাক্যজালের কোনও মাথামুণ্ড করিতে না পারিয়া সঙ্গ কবিবাব লোক ডাকিতে বাহিব হইয়া গেল । পানের জন্ত দশ টাকার নোট পাইয়া রজতের উপর তাব সস্ত্রম বাড়িয়া গিয়াছিল ।

এই মধ্যরাত্রে অত্যন্ত কালের মধ্যে তবল্চি, মৃদঙ্গী, সাবেক্ষীবাদক জোগাড় হইয়া গেল, এবং নেশায় আমুদ্রিত-আঁগি বজ্রতের সমুখে সেই মধ্য-ঘোবনা নটী আড়ষ্ট বাহু বিক্ষিপ্ত এবং অসহজ কটি আন্দোলিত কবিয়া নুপুর-গুঞ্জাবত নৃত্যবস পবিবেশন কবিতে আবস্ত কবিল । বহু-পবিবেশিত কটাক্ষ এবং বহুপ্রযুক্ত নিল্লঙ্ঘ্য লাস্ত্র গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে তাব এই নতুন অতিথিটির উপর প্রয়োগ কবিতে লাগিল । নাচিতে নাচিতে আডচোখে দেখিতে চেষ্টা কবিল, নেশাত্ত্ব বাবুজিব উপর এগুলি কেমন কাঙ্ক্ষকবী হইতেছে, এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্য-পথে অত্যন্ত বেমানান জায়গায় বজ্রত যখন হাততালি দিয়া কহিয়া উঠিল—‘বাঃ বাঃ, চমৎকাব—’ তখন বিজয় সম্বন্ধে বাইজিব আব কোনও সন্দেহ বহিল না । বজ্রত টাকা বিলাইল, মত্ত আসিল, সঙ্গীত জমিয়া উঠিল, নৃত্য ও মদির কটাক্ষ ঘবেব মধ্যে ছুটাছুটি কবিতে লাগিল—এবং একটা তৃপ্তিকর নিদ্রাব পব বজ্রত যখন জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিতে পাইল, সঙ্গতীরা সব বিদায় লইতেছে এবং হীবা বাইজি তাব বিস্তৃত বেশনি ঘাগ্রার আবর্ত দীর্ঘ করিয়া ছুড়াইয়া দিয়া বজ্রতের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া মুহু মুহু হাস্য কবিতেছে ।

‘বাবুজী !’

‘তোমার ভুরুটা গলে’ আসচে ।’ বজ্রত কহিল ।

বাইজি ক্রমাল দিয়া তাড়াতাড়ি ভুরুর গলনোমুখ কাজল ঈষৎ মুছিয়া

লইল। কহিল, ‘ও কুচ নেই। বাতাইয়েঁ নাচ কায়সা হুয়া—  
খুস হুয়ে ?’

‘কি বিস্তী। ছি, গালেতে এতও রং মাখতে হয়—ঘামের সঙ্গে উঠে  
আসছে যে।’

‘রাতকো হিয়াই ঠায়বেঙ্গে তো ?’ বাইজি ঈষৎ আহত-কণ্ঠে  
জিজ্ঞাসা কবিল।

কিছুটা উত্তেজনার প্রাবল্যে, কিছু বা নিদ্রায়, রক্ততরঙ্গ প্রবল নেশা  
ইতিমধ্যে পাংলা হইয়া আসিয়াছিল। বাইজির কৃত্রিম ভুরু এবং কৃত্রিম  
মুখবর্ণের কুশ্রীতাব উপর দৃষ্টি পড়া ইহাব জগ্গই সম্ভব হইয়াছিল। বাইজির  
শেষ প্রশ্নটাতে সহসা যেন তীব্র মার খাইয়া সে চম্কাইয়া জাগিয়া উঠিল।  
চকিতে সে খাড়া হইয়া বসিল। বিকৃত কণ্ঠে প্রায় ধমকেব স্বরে সে  
কহিল—‘ক্যাধা ?’

বাইজি সামান্য বিস্মিত হইয়া নিজ প্রশ্নেব পুনরাবৃত্তি কবিল।

মূহুর্তে বজত সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চকিতে সমস্ত অবস্থা তার  
হৃদযন্ত্রম হইল। মুচ্ছা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মানুষ যেমন করিয়া  
অসহায়ভাবে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সে চাবিদিকে  
তাকাইয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শবীব স্পন্দিত হইতে  
লাগিল—তার পা দুটা এমন অসম্ভব রকম কাঁপিতে লাগিল যে মনে হইল  
এখনই সে পড়িয়া যাইবে।

সে কহিল, ‘আমি কোথায় ? এ কোন্ জায়গা !—না, না—এই,  
তোমাব নাম কি ? তুমি কে ? ওঃ—কত টাকা তোমার চাই ?’ বলিয়া  
পকেটে হাত গুঁজিয়া রক্ত এক তাড়া নোট উঠাইয়া আনিল এবং হীরা  
বাইজির দিকে তাহা ছুঁড়িয়া দিয়া বিভ্রান্তেব মত সিঁড়ির দিকে ছুটিল।

উৎফুল্ল হইয়া টাকা গণিতে গণিতে হীরা বাইজি মন্তব্য কবিল—‘এ  
কায়সা পাংলা রে ! সায়দ্ কোই বড়ে আদমী হোঙ্গে—’

## চৌদ্দ

প্রশস্ত্যবের মধ্যে কোনও আসবাব নাই। এক দিকে গোটা দুই খোলা স্টকেস, এবং অন্য প্রান্তে একটা দামি কসলের উপর বিছানার চাদর পাতিয়া রজত এখনও ঘুমাইতেছে।

এক পক্ষকাল মাত্র বজ্রতের এ-বাড়ি হইয়াছে। বজ্রতেব মনেব অবস্থা বাসা-বাধাব অশুকুল নহে, কিন্তু কোনও জনাকীর্ণ হোটেলে যাইয়া বাস করার কথা কল্পনা করা মাত্র তাব শোকবিদগ্ধ মন গভীর প্রতিবাদ কবিয়া বসিয়াছিল। নির্জনতার তাব বড় প্রয়োজন। সত্যানন্দবাবু পর্য্যন্ত তাকে নিজ বাড়িতে বেশি দিন বাথিতে পারেন নাই।

তারপর এই সুদীর্ঘ পক্ষকাল ধবিয়া বজ্রত পিঞ্জবাবদ্ব সিংহেব মতো এই পৃথিবীর প্রতি লৌহ-গরাদে মাথা আছড়াইয়া ফিবিতেছে। গভীর নিঃশ্বাস আক্রোশে নিঃস্বেকে আঘাত করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাগ্যোপব প্রতিশোধ তুলিতে চাহিয়াছে—বাতবিস্কন্ধ পদ্মাব মতো নিঃস্বেকে লইয়া ক্ষুরধার আবর্জনা রচনা কবিয়া ফিরিয়াছে। জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নাই, শুধু একটা বিরাট ব্যর্থতা সৃষ্টি জুড়িয়া আক্ষালন কবিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। রজত এই ব্যর্থতার প্রতীক।

রজ্রতেব যখন নিদ্রা ভাঙিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। বৌদ্ধ-প্রদীপ্ত আহিরের দিকে একবার তাকাইয়া রজ্রত পাশ ফিবিয়া শুইল। গত রজ্রনীর প্রমত্ততার অবসাদ তাব সর্ব অঙ্গে এবং মনে এখনও ভারি হইয়া আছে। নিঃস্বেকে সে আরও দুর্বল, আরও অসহায়, এবং আবণ্ড ব্যর্থ মনে করিল। কিন্তু অমৃতপ্ত বোধ কবিল না। বরঞ্চ এক প্রকার অন্তত আত্মতৃপ্তিতে সে হিংস্র আনন্দ বোধ করিল। যে ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যহিত, পূর্ণতাহীন জীবনলীলার মধ্যে জুর ভাগ্য তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে,

এ যেন তাহারই স্বাভাবিক পবিণতি। জীবনটাকে নষ্ট করিয়া নিষ্পেষিত ইক্ষুর ছিব্‌ড়ার মতো সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে, ছিঁড়িয়া ছুঁড়াইয়া, ভাঙিয়া মোচড়াইয়া মৃৎকলসীর মতো অত্যন্ত হেলাভরে ইহাকে শত টুকরা করিয়া আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়িয়া ফেলিবে।

হীবা বাইজি। সেই ঘণিত মেয়েটা। নাঃ, পাপ বলিয়া কিছু নাই—যেমন পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। যদি পাপ বলিয়া সত্যি কিছু থাকে, রক্ত অত্যন্ত অনায়াসে বিবেকদংশরহিত তৎপরতার সঙ্গে তাহার পুনরভিনয় করিবে। তথাকথিত পাপের উর্দ্ধে থাকিয়া রক্ত বিখ-বিধাতাব কাছ হইতে কোন্ পুরস্কার লাভ করিয়াছে? কোন্ অমুগ্রহ তার উপব বর্ষিত হইয়াছে?

বেচারি হীরা বাইজি। নিশ্চয়ই হীবা বাইজিব অপরাধ অতি সামান্য; তবু নির্দম ভাগ্য ওকে এই বিভ্রান্ত জীবনের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। তোমাদেব ঈশ্বর উহাকে একটু সাহায্য কবিতোও অগ্রসর হন নাই। ‘হীবা বাইজিকে আমি ঘৃণা করি না’—রক্ত মনে মনে বলিতে লাগিল—‘ওব কাছে আমি আবারও যেতাম। কিন্তু ঘে-রস আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে, হীরা বাইজির সাধ্য নাই সে-রস পরিবেশন করে—ও বেচাৰি বড় দুৰ্ভাগা।’

নিজেকে বিনষ্ট কবিবাব এই দুর্ভাব প্রবৃত্তি ক্রমে ঈশ্বরের উপর এক গভীর আক্রোশে পরিবর্তিত হইয়া দাঁড়াইল। বিচাংহীন এক শিশুর অকৃত্রিম ক্রোধে সে ঈশ্বরকে তিরস্কার করিতে লাগিল, অভিশাপ দিল। স্বেচ্ছাচারি, তুমি বোঝ না, তোমার অসম্ভব ক্ষমতার অপপ্রয়োগে, তোমার স্বেচ্ছাচারলীলাব উন্নত আনন্দে সৃষ্টি জুড়িয়া তুমি কি নির্দম নিষ্ঠুরতাব তাণ্ডব করিয়া বেড়াও। জীবের দেহে বেদনা-বোধ দিয়া তুমি তাহাকে আঘাত কর, তাহাব উদরে ক্ষুধার জ্বালা সৃষ্টি করিয়া তুমি তাহাকে অন্ন

হইতে বঞ্চিত কর, নিষ্পাপ শিশুর উপর তুমি পিতার অপরাধের হিংস্র প্রতিশোধ লও—বৃকের মধ্যে প্রেম দিয়া প্রেমাম্পদকে তুমি ছিনাইয়া লইয়া যাও ! বর্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় তুমি জগতের নিষ্ঠুরতম সম্রাটকে লক্ষবার পরাজিত করিতে পাব । মানুষ তোমার তুলনায় কতটুকু অত্যাচার করিতে পারে !

রক্তত সহসা সিদ্ধান্ত করিল, চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার জন্ত সে তার সমস্ত সম্পত্তি দান কবিবে । পরীক্ষাগাবে লোকচক্ষুর অস্ত্রবালে শত শত বীর ঘোঁড়া যারা মৃত্যুর মাৰ্গ-অস্ত্র প্রস্তুত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের রক্তত সর্বস্ব দান কবিয়া সাহায্য কবিবে । ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যাহাদের অভিযান—মা'র কোল হইতে যে-ঈশ্বর সন্তান কাড়িয়া লয়, তাহাকে যারা বাধা দিতে দাঁড়ায়, জীব বুক হইতে যে জন স্বামীকে হরণ করিয়া লয়, তাহাকে যারা শাসন করিতে অগ্রসর হয়, রক্তত তাহাব সমস্ত ঐশ্বর্য তাহাদের সাহায্যে মিলোজিত করিবে !

যুগে যুগে মানুষ রাজাব স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে । ডেমো-ক্রেসিব জন্ত মানুষ কত রক্ত উৎসর্গ করিয়াছে । ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্ত মানুষের কত বিক্ষুব্ধ অভিযানেব পুণ্যস্থতি অক্ষয় হইয়া আছে , স্বাধীনতার জন্ত মানুষেব মহত্তম প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাব চেয়ে বহুগুণ নির্ধম যে স্বেচ্ছাচার প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে সংঘটিত দেখিতে পাই—রক্তত ভাবিতে লাগিল—মানুষ কেন তার প্রতিবাদ কবে নাই ? কেন এই স্পর্ধিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে একবারও বিদ্রোহের ধ্বনি উঠায় নাই, কেন অসহায় বেদনা প্রতিবাদহীন অপমানের সঙ্গে সহ্য কবিয়াছে ? এই অসীম শক্তির তুলনায় মানুষ একান্ত দুর্বল, তাই কি এই সহনশীলতা, তাই কি এই নির্ভরতার ভান ? ভক্তি কি দুর্বলতারই নামান্তর নয় ?



বজ্রত মনে মনে সিদ্ধান্ত কবিল—ভবিষ্যতেব জগতে যে নতুন বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা হইবে ঈশ্বরলোহিতা। তাহা হইবে স্বেচ্ছা-পবত্ত্ব, শাসিতামুমোদনহীন, ক্ষমতাগর্ভদৃষ্ট এক তেজোজ্বল শক্তির বিরুদ্ধে মানব-মনেব এক গভীর প্রতিবাদ। বৈজ্ঞানিকদেব প্রাণপাত মহৎ প্রচেষ্টাব মধ্যে বজ্রত সেই যুগেব আভাস পাইতেছে।

ক্রমে বজ্রতের এই অতি-আক্ৰোশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ক্রমে সে প্রার্থনা শুরু কবিল। কহিল—প্রভু, সত্যিই কি তুমি আছ? সত্যিই কি তুমি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ কব? তোমাব প্রজ্ঞায়ই কি সমস্ত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে? জীব-ভাগ্যেব তুমিই, কি কর্ণধাব? মানুষ্যেব আত্মা কি মৃত্যুকে অতিক্রম কবিতে পাবে? পবলোক কি সত্যিই আছে?—স্বমিত্রা কি সত্যিই আছে? কোন্ অদৃশ্য লোকে, কোন্ অজানা বহুস্তেব মধ্যে তুমি আমার স্বমিত্রাকে লইয়া গেলে? এ তোমাব কোন্ কৌতুক, প্রভু? কোন্ গভীর মঙ্গলেচ্ছায়, কোন্ চিবানন্দেব ব্যবস্থা কবিবাব জগ্ন তুমি সাময়িক ভাবে স্বমিত্রাকে অপসাবিত কবিলে?—কিন্তু সত্য সত্যিই যে তুমি আছ—বজ্রত মনে মনে প্রশ্ন কবিল—গভীর প্রজ্ঞাবান্, মহাচৈতন্যময় এক প্রভু যে সত্যিই কর্ণধাব রূপে বহিয়াছে, সত্যিই যে পবলোক আছে, স্বমিত্রাব আত্মা যে অবিনশ্বব, তাহাব প্রমাণ কোথায়? একটা স্থানিচিত প্রমাণ যে আমাব কাছে বড় প্রয়োজন! দয়া করো, দয়া কবো, একবার ভবিষ্যতেব আশায় আমাকে বুক বাধতে দাও, প্রভু!

সম্পূর্ণ একটা মাস বজ্রত প্রার্থনা কবিল। ভগবানেব করুণা ভিক্ষা করিল, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে ক্ষীণতম আভাস পাইবাব জগ্ন ঈশবেব কাছে মাথা কুটিয়া মবিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না; কোনও ছায়ামূর্ত্তি দেখিল না, কোনও দৈববাণী শুনিল না। মনেব মধ্যে সন্দেহ তেমনি প্রবল বহিল, কোনও আধ্যাত্মিক জ্ঞানোদয়ে তাহা পরাভূত হইল না।

রজত আরও প্রার্থনা করিল, আরও কাঁদিল। তীব্র অধীরতায় গভীর বিশ্বাস সংগ্রহ করিয়া সে অজানা অদৃশ্য জগতের জগৎ বাঁধাব হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনও কিছুতেই পৌছাইল না। হতাশা, বেদনা, উপায়হীন ভরসা-হীন ব্যর্থতা তাহাকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

ঈশ্বর কি সত্যই আছে? মহাচৈতন্যময়, মহাকৰুণাময় যে-শক্তিকে সকল ধর্মশাস্ত্র সঙ্গ্রহ আডম্বরের সঙ্গে পূজা করে, তাহাব অন্তত্ব কি সত্যই আছে, না তাহা মানুষের সাস্থনা পাইবার এক অভিনব পন্থা—জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান মানুষের কাল্পনিক আবিষ্কার?

মনের গভীর হতাশায় রজত জড়বাদী দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হইল। চার্লসবাদীদের গ্রন্থ হইতে আবস্ত কবিয়া অতিআধুনিক মেটি'বিয়ালিস্টদের দর্শন পর্যন্ত জড়বাদেব সকল বক্তব্য সে পড়িয়া ফেলিল। পড়িয়া জড়বাদেব সত্যতা সম্বন্ধে রজতেব গভীর প্রতীতি জন্মিল।

সমস্ত জগত পবিষাণ্ড করিয়া রহিয়াছে এক অন্ধশক্তি, তাব বিচাব নাই, তার বুদ্ধি নাই, চৈতন্য নাই। বিদ্যুৎ-শক্তির যেমন অসীম ক্ষমতা, অথচ একমাত্রা বুদ্ধি নাই, বিশ্বেব কেন্দ্রীয় মহাশক্তিও তেমনি। অসীম, অমোঘ ইহার শক্তি, অবিশ্বাস্য জগৎমণ্ডলী এই শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়—পাথরে আঘাত খাইয়া জলস্রোত যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে জলবিন্দু-ও জলবুদ্বু উৎক্ষিপ্ত করে, এই শক্তিও তেমনই নিজের অজ্ঞাতসাবে বিশ্বচবাচর সৃষ্টি করিয়াছে। এই অন্ধশক্তিব বুদ্ধিহীন আলোড়নেই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, জীবসৃষ্টি হইয়াছে, মানুষসৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রে কোনও প্রজাময় প্রেমময় ভগবান বর্তমান নাই। একটা বিবাট ব্যর্থতাব দিকে দৃশ্যমান সর্ববস্তব যাত্রা। ফুলের সঙ্গে গন্ধ যেমন ওতঃপ্রোত, মানুষেব মধ্যে চৈতন্যও তদ্রূপ; ইহার স্বতন্ত্র অন্তত্ব না থাকিবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আধুনিক জড়বাদী দার্শনিকেরা যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, রজতেব

কাছে তাগা অতিশয় যুক্তিযুক্ত মনে হইল। রজত স্থিৰ করিল, ঈশ্বৰ নাই।

তবে মদ খাও, তবে পাপ করো, ক্লেদময় সমস্ত প্রমত্ততাব অভিনয় কৰো। ভালো-মন্দে পাপে-পুণ্যে, ত্যাগে স্বার্থপরতায়, মহত্বে এবং ইতবতায় পার্থক্য করিয়া স্থবিচাব কবিবাব যদি কেহ নাই, তবে হও স্বার্থপর, আপাতমধুব শাবীর স্বথের সমস্ত সম্ভাব জোগাড় কৰো—মদ, নৃত্য, হীবা বাইজি—

দ্বিতীয়বাব, এবং এবাব সজ্ঞানে, বজ্রত হীবা বাইজিব বাড়িব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবিল।

হীবা বাইজি বিশেষ আদব-আপায়ন কবিল। পান ও আতব আনিল, এবং ঈশাব জগ্ন পূৰ্বীহে পয়সা পর্য্যন্ত চাহিল না। কিন্তু রজত যখন সে-সব কিছু স্পর্শ না কবিয়া অদ্ভুত নিম্পলক দৃষ্টিতে তাহাব দিকে শুধুই তাকাইয়া বহিল তখন হীবা নিজে কে যেন ভারি দুৰ্লল এবং অপটু বোধ কবিতো লাগিল। তাব মনে হইতে লাগিল—তাহার ছলাকলা এই অদ্ভুত লোকটিব কাছে যেন যথেষ্ট মন-ভুলানো হইতেছে না। তবু স্বক্বেব এক লাগ্নময় ভক্তি কবিয়া, বাঁকা কটাক্ষেব আবেদন হানিয়া সহাস্ত মুখে আশ্বাব-ভবা কণ্ঠে সে কহিল—‘কিত্না রোজ তো আপ্. আয়ে নহী, বাবুজী—’

• . রজত এই প্রশ্নেব কোনও জবাব না দিয়া কহিল, ‘একটু আনন্দ দিতে পাব বাইজি? আব যে সইতে পাবি নে।’

‘হাঁ, হাঁ, ওসিকা ওয়াস্তে মায় হঁ। নাচুজী? গাউজী? আপ্. জায়সা ফবুমায়েঙ্গে ঐসা কক্কজী, বাবুজী—’

বজ্রত চাহিয়া দেখিল, এই মধ্য-যৌবনা, কৃত্রিমরঞ্জিতবদনা, অবসাদাভষ্ট-দেহা মেয়েটি কী গভীর অনুনয়েব সঙ্গে তাহাব তুষ্টিসাধনেব জগ্ন আদেশেব অপেক্ষা কবিতোছে। কী করুণ, কী বীভৎস করুণ পণ্য-স্ত্রীর জীবন! ভালবাসাব যেখানে সংস্পর্শ মাত্র নাই, মুদ্রাব বিনিময়ে দেহ এবং মনকে

দেখানে গভীবভাবে নিপীড়িত করিয়া প্রতিনিয়ত ইহাদেব আত্মহত্যা করিতে হয় !

রজত উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—‘ভুল কবেচি, বাইজি। তোমাব কাছ থেকে আনন্দ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যা চাই কোথায় তা তুমি পাবে?—আশীর্বাদ কবি, এই বিডম্বিত জীবন থেকে তুমি মুক্তি পাব। এই নাও টাকা। কিন্তু আব কোনও দিন তুমি আমাকে আশা ক’বো না।’ বলিয়া বজ্রত কতগুলি নোট বাহিব করিয়া হীরা বাইজির নিকট বাখিয়া দিল এবং আব বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হীরা বাইজি টাকা ছুঁইল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ‘কুছ কস্বব ছ্যা, বাবুজী?’

বজ্রত কহিল, ‘কিছু না।’

‘তব্?’

‘তবে আব কিছু নেই। দুনিয়াটাবই কোনও মানে নেহ—’

‘আপ্কা কেয়া ছ্যা?—’

‘তা তুমি বুঝবে না।’ বজ্রত অলমস্বব মতো কহিল। ‘জগৎটাই আমার কাছ থেকে কোথায় জানি সবে’ গিয়েছে।’ বলিয়া প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে নিচে নামিয়া গেল।

সমুখ দিয়া একটা ট্যাক্সি যাইতেছিল। সেটাকে ডাকিয়া রজত চড়িয়া বসিয়া কহিল—‘ইডেন্ গার্ডেন্স্।’ বাগানেব সমুখে নামিয়া সে গঙ্গাব দিকে ইটিয়া চলিল। গঙ্গার ধাবে পৌছাইয়া সমুখেই দেখিল একটা খালি বেঞ্চ, রজত নিজ্জীবব মত তাহাতে শুইয়া পড়িল।

গঙ্গার জল পাড়ের সঙ্গে আসিয়া শব্দ করিতেছে—ছলাং, ছলাং। আকাশ তারায় তারায় ছাইয়া গেছে। কত জ্যোতির্বর্ষ, কত

অস্পষ্ট নীহারিকা, অস্বহীন গভীরতার মধ্যে নব নব জ্যোতির্ময় জগতেব আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশেব পটে অগণিত সৃষ্টিব ইঙ্গিত। বাতাস, জল, বিস্মৃতি, মুক্তি, শান্তি, প্রেম,—স্বমিত্রা—

না, না, ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন—বজ্রত সহসা উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া বসিল। বহুশ্রেব কি অস্ত আছে। অস্ত যদি নাই, তবে কি কবিতা বলা যায়, এই বহুশ্রের আড়ালে বহুশ্রময় বিবাজ করিতেছেন না? ঈশ্বর নিশ্চয়ই সত্য। নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বচাচর ব্যাপ্ত কবিতা বিরাজ করিতেছেন। নইলে—বজ্রত ভাবিঘা শিহরিয়া উঠিল—কিছুই যে নাই, পবলোক নাই, পবিনতি নাই—নইলে যে স্বমিত্রা নাই—। স্বমিত্রা নাই। না, না, তাও কি সম্ভব। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।

ভাবতবধে যুগে যুগে কত গৃহী সর্বস্ব ত্যাগ কবিতা এই অদৃশ্য ঈশ্ববেব সন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছে। তপে, ধ্যানে, কৃচ্ছ্র-সাধনায়, যোগ-সাধনায় এই চিবস্তন বহুশ্রেব জ্ঞান মানব-মনেব চিবস্তন জিজ্ঞাসাব তাহাবা জবাব খুঁজিয়া ফিবিয়াছে। মানুষ কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কোন্ অদৃশ্য শক্তিব সন্ধেতে প্রতিনিয়ত জীব-জগতেব বিশ্বয়কব প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে? সে-শক্তি তো মিথ্যা নয়,—সেই অদৃশ্য, জ্ঞানের অগোচর এবং বুদ্ধির অনবিগম্য শক্তিব অস্তিত্ব সন্দেহে সন্দেহ কবিবার কোনই হেতু নাই। সে-শক্তি কি অন্ধশক্তি? এই যে বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলা, এই যে জগৎ-জোড়া নিয়মানুবর্তিতা, ইহার পিছনে কি কোনও মহাচৈতন্যের অস্তিত্বেব স্পষ্ট আভাস পাই না?—বজ্রত ভাবিতে লাগিল।

মানুষেব দৃষ্টিশক্তিব বহির্ভূত, মানুষেব বুদ্ধি-শক্তিব অন্তর্ভুক্ত কী এই মহাশক্তি? ক্ষণে ক্ষণে তাহাব আভাস মনেব মধ্যে আসিয়া পৌছায়, জীবনে সতত তাহাব স্পর্শ পাই, সর্বক্ষণ মানুষেব আশা এবং আকাঙ্ক্ষা তাহার ধ্যান কবিতা মবে, অথচ একবারও তাহাকে স্পষ্ট প্রকাশিত হইতে দেখি না, আমাব বুদ্ধি তাহাকে শৃঙ্খলিত কবিতে পাবে

না, আমার ইঞ্জিয়বৃত্তিগুলি তাহাকে আবিষ্কার করিতে যাইয়া স্ব স্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এ কী অসীম বিষয়! এই শক্তিকে জানিতে পাবা মানুষেব জ্ঞান-সাধনাব ইতিহাসেব মহত্তম সাধনা। সুন্দর কি? সার্থক কি? কোন্ পরম সত্যেব মধ্যে আমাদের আনন্দময় সমাপ্তিহীন পরিণতি?

### পনেরো

পুত্রেব জন্ম যে-বাসা দুর্গাপ্রসন্ন এত যত্ন কবিয়া, এত আশা কবিয়া গড়িয়াছিলেন, বজ্রত তাহাতে কোনও দিন প্রবেশ করিল না।

দশ পনেরো দিন পবে সত্যানন্দ একদিন যখন আপিসে যাইবার উত্তোগ করিতেছিলেন, সেই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁব হাতে রেজিস্টারি-কবা একটা লম্বা খাম দিয়া গেল। হাতে সময় অত্যন্ত কম ছিল। সত্যানন্দ একবাব ভাবিলেন, খামটা আপিসে লইয়া যাইবেন, কিন্তু তাবপর খুলিয়াই ফেলিলেন।

ভিতর হইতে রেজিস্টারি-কৃত একটা দলিল বাহিব হইল। আপিস-সংক্রান্ত দলিল-পত্র তাঁর বাড়িতে আসে না, আপিসেব ঠিকানায়ই তাহা আসে। তিনি একটু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিষয়টা তাঁর শতশ্রুৎ বাড়িয়া গেল, যখন চকিতে রজতপ্রসন্ন চৌধুরি এই নামটা তিনি দলিলেব নিচেব দিকে আবিষ্কার করিলেন। মুহূর্ত্তেব মধ্যে তিনি সমগ্র দলিলে দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলেন। দেখিলেন, ইহা এক দানপত্র।

তখন সঙ্গেব চিঠিটাতে সত্যানন্দেব দৃষ্টি পড়িল। কম্পিত হস্তে সেটা চোখের সমুখে উঠাইয়া, চশমা-হীন চোখের জ্ব কুঁচ্কাইয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে লাইনগুলি বারম্বার এলোমেলো হইয়া উঠিল :—

‘শ্রীচরণে—

কাঁকাবাবু, এই চিঠির সঙ্গে একটা দানপত্র পাঠাইলাম। আমার সমস্ত স্বাবব এবং অস্বাবব সম্পত্তি আমি নানা জনহিতকর কার্যে ব্যয় কবিবাব জ্ঞাত আপনাকে একমাত্র অছি নিযুক্ত কবিয়া গেলাম। আপনি দেখিলেই বুঝিতে পাবিবেন, এই দলিল বিধি-অনুযায়ী বেক্সিস্টারি কবা হইয়াছে।

অর্থ আমার আর কোনও প্রয়োজন নাই। নিকৃদ্দেশ-পথে আমি যাত্রা কবিলাম। জীবনকে যাবা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত কবিয়াছে, দৃশ্যমান জগতেব বাহ্যিক এক অদৃশ্য জগতেব বহুস্তর সন্ধান যাহাবা নিজেদেব ব্যাপৃত কবিয়াছে, তাহাদেব কাছে আমি সর্বপ্রথম যাইব। জীবনেব কি কোনও ববণীয় পবণতি আছে? সত্যই কি জগতেব কর্ণধাবরূপে চৈতন্যময় মঙ্গলময় এক ভগবান আছেন? চরম সত্য কি?—এই সব প্রশ্নেব সহুত্তর পাওয়া আমার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ঋষি-প্রদর্শিত পন্থায়ই প্রথমে আমি এই অনুসন্ধান আরম্ভ করিব। খোঁজ যদি সত্যই কিছু পাই, কাহারও কাছেই তাহা গোপন রাখিব না। আর যদি ব্যর্থ হই—যদি বুঝিতে পাবি, সাধুসন্ন্যাসীরা যুগ যুগ ধরিয়া নিজেদেব আত্মসমোহিত, আত্মপ্রবঞ্চিত মাত্র করিয়াছে, তবে তাহাও জগতেব কাছে জানাইতে দ্বিধা বা লজ্জা করিব না, এবং সেই ব্যর্থতার জ্ঞাত নিজেকে আমি কোনও দিন এই বলিয়া অভিযুক্ত করিব না যে, একটা মিথ্যার পশ্চাতে ঘুরিয়া জীবনটাকে আমি নষ্ট কবিয়া ফেলিলাম। যে বৃহৎ প্রশ্নেব সহুত্তরেব জ্ঞাত আমি সংসার-ত্যাগ কবিয়া চলিলাম, একটা জীবনব্যাপী পরীক্ষা তাহার তুলনায় কিছুই নয়। একটা জীবন ইহাব জ্ঞাত অনায়াসে বিসর্জন দেওয়া যায়।

আপনি এবং কাকিমা আমার প্রণাম জানিবেন। মন্দার মত লক্ষ্মী মেয়ের চিরকল্যাণ হউক। ইতি—বজ্রত।’

চিঠি পড়িয়া সত্যানন্দ সমুখের চেয়ারটায় বজ্রাহতের মতো বসিয়া পড়িলেন। ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া সত্যবতী ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহারও মুখ শুকাইয়া গেল। স্থলিত কণ্ঠে কহিলেন—  
‘কি খবর, বল তো?—এ চিঠি কার? কি হয়েছে, বল না ছাই? এমন চুপ করে’ রইলে কেন?’

সত্যানন্দ কহিলেন, ‘বজ্রত সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে। এই তার চিঠি, এই তার দানপত্র—সমস্ত সম্পত্তি সে দান করে’ চলে গেছে। পাগল। পাগল। আস্ত একটা ক্ষ্যাপা—’

‘সন্ন্যাসী! এ কি কাণ্ড! সন্ন্যাসী হবে সে কোন্ দুঃখে?’

‘বস্কেব মধ্যে ওর এই ঘর-ভাঙবার প্রবৃত্তি। ভেঙে ফেলবার উন্মাদনাব মধ্যে ও বড় হয়ে উঠেছে। পদ্মার মতোই ওর মন—পলাতক মন। সঙ্কেব মধ্যে বাধা থাকতে চায় না; নিজেব কীত্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হয়ে যায়।—কিন্তু, না, না,—এ হ’তে পাববে না।—এমন তাকে আমি করতে দেব না। কেন সে এমন করবে? সব বিসর্জন দেবে সে কেন? আমাদের হাতে যে দুর্গাপ্রসন্ন ওব ভাব দিয়ে গেছেন। সে দায়িত্ব কি আমাদের এমনি কবেই লঙ্ঘন করতে হবে! ও কি, কাঁদচিস কেন, মন্দা? সব শুনেচিস?’

দরজার গায়ে মাথা ঠেস্ দিয়া মন্দা কখন কাঁদিতে শুরু করিয়া দিয়াছে, সত্যানন্দ তাহা এতক্ষণ টেরও পান নাই। সঙ্কেব স্নেহে কণ্ঠাব আনত অশ্রুসিক্ত মুখেব দিকে চাহিয়া কহিলেন, ‘কাঁদিস্ নে, মা, কাঁদিস্ নে। যা, যা তো মা, শোফারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বল্ গিয়ে।—দেখিস, তাকে আমি ধরে’ আনবই—যেমন কবে’ পারি তাকে ফিরিয়ে আনবই— আনবই—’

উত্তরভারতযাত্রী এক দ্রুতগামী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীব এক কামরায়



মুণ্ডিতমস্তক এক-বস্ত্র-সঞ্চল রজতপ্রসন্ন নিকৃদ্দেশ-যাত্রায় ছুটিয়াছে। শান্ত সমাহিত একটা পরিতৃপ্তিতে তাব মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, দুই চোখে গভীর বিশ্বাসের নির্ভবতা, ললাটে ঔদার্যের মহিমা। জীবনে দুঃখ বলিয়া যেন কিছু নাই; বার্থতায় কোনও দিনই যেন সে বেদনা পায় নাই—জীবন যেন তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দগতি জলশ্রোতের মতন প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

সঙ্ক্যারাগ-বস্ত্রিম আকাশেব দিকে রজত চোখ মেলিয়া চাহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া বহিল। সহসা অন্তরাগবস্ত্রিত আকাশ চঞ্চললোক-প্রতিফলিত পদ্মায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। বজ্রত দেখিল, ফেনিলোচ্ছল পদ্মা সৃষ্টির এক প্রান্ত হইতে অগ্ন প্রান্ত পর্য্যন্ত উর্মি বিক্ষিপ্ত কবিয়া খব-শ্রোতোবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর বৃকে ভীম-বিক্রমে সে আঘাত করিতেছে। বলিতেছে—ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ! যাহা ভঙ্গুর, যাহা দুদিনের, পদ্মপত্রের জলের মত যাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিস্ না। যাহা শাস্ত, যাহা চিবসত্য একবার সে দিকে চোখ ওঠা।—তোব চারিদিকে যে-শৃঙ্খল তুই নিজে রচনা কবিয়া বাথিয়াছিস, তাহা ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ। যে-মুক্তিব বাণী তোব কর্ণে আমি নিবস্তব চিৎকার কবিয়া কহিতেছি, একবার কান পাতিয়া তাহা শোন—









